দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পলো

[দ্য ভেনিসিয়ান]

ভূমিকা ও সম্পাদনা ॥ ম্যানুয়েল কোমরুফ

অনুবাদ ॥ সোহরাব সুমন
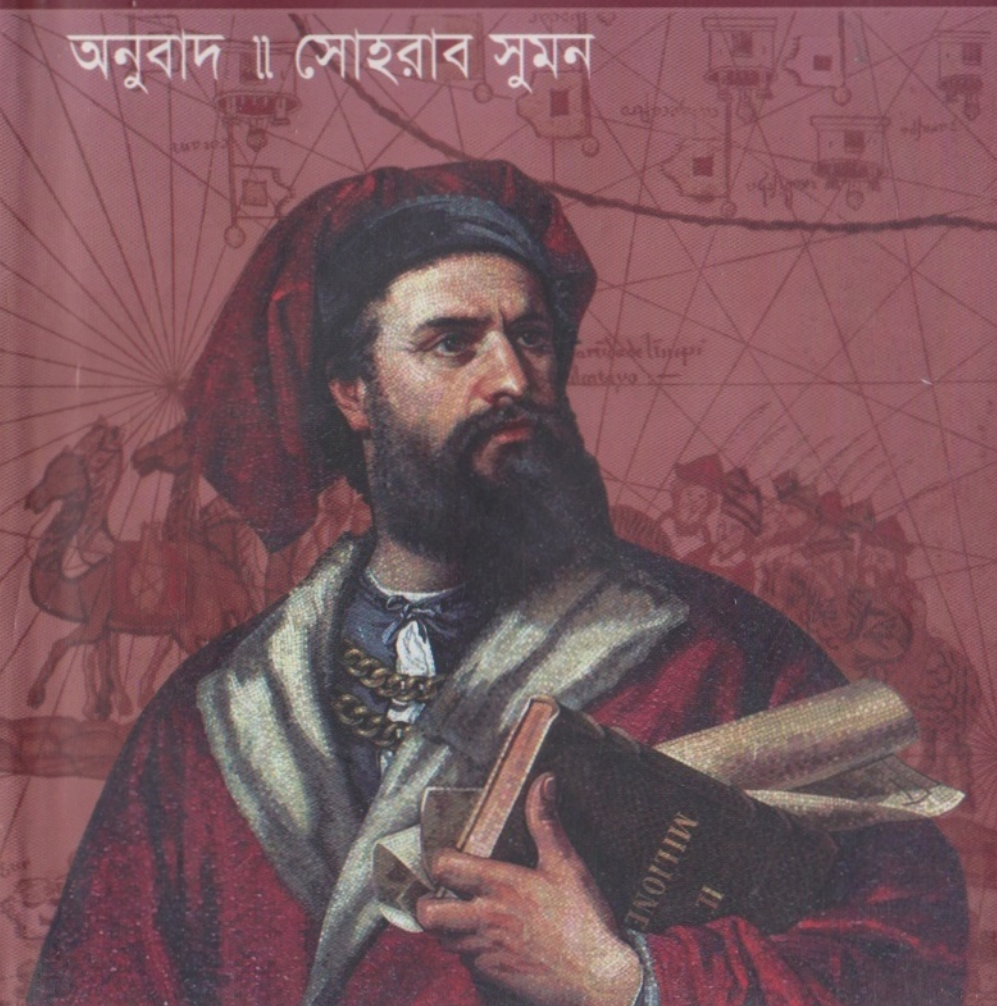
হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। রাশিয়ার বিপ্লবের সময় বেশ কিছু সময় তিনি সেখানে অবস্থান করেন।
নিজের সম্পাদিত দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পলো (*The Travels oF Marcopolo*) তার সবচাইতে সফল প্রকাশনা, এটি ১৯২৬ সালে প্রথম ছাপা হয়। এতে তিনি কেবল উইলিয়াম মার্সডেনের অনুবাদে বাদ পড়া একটি অধ্যায়ই যোগই করেননি, সেই সঙ্গে হেনরি ইয়েল-এর সংস্করণ থেকে সংশোধিত আকারে আরো অনেক বিষয় সংযুক্তও করেন।
তিনি ১৯৭৪ সালের ১০ ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সোহবার সুমন বর্তমান সময়ের একজন প্রথিতযশা ঋদ্ধ কবি। তাঁর মননশীলতা তাঁর সৃষ্টিকর্মেই ভাস্বর। কবির নিরবচ্ছিন্ন সৃজনশীলতায় আশপাশের পরিচিত জগৎ কাব্যিক রূপরসগন্ধসমেত পাঠকের চেতনায় জীবন্ত হয়ে উঠতে বাধ্য। একনিষ্ঠ এই কবি দীর্ঘদিন যাবৎ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কবিতা, ছোটগল্প, সৃষ্টিশীল ফিচার এবং অনুবাদ করে চলেছেন। 'শুধু তুমি কবিতা' এবং 'কবিতার বিস্বাদ প্রহর' তার দুটি কাব্যগ্রন্থ, 'আরববিশ্বের গল্প,' 'মিশরের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং 'ইরাকের শ্রেষ্ঠ গল্প' তার এযাবৎ প্রকাশিত অনুবাদ গল্পসংকলন। সঙ্গতকারণেই তাঁর কবিতা, অন্যান্য লেখা এবং অনুবাদকর্ম পাঠকমহলে বহুল সমাদৃত।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সেরা দশ অভিযাত্রা বিষয়ক বইয়ের তালিকায় সব সময়ের জন্য বাছাইকৃত, মার্কো পলোর ভ্রমণ কাহিনি চমৎকার আর উত্তেজনাপূর্ণ সব গল্পে ঠাসা। নিজের জন্মভূমি ভেনিস ছেড়ে কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা ঘোড়ায় চড়ে, আবার কখনো জাহাজে করে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এশিয়া পৌঁছাবার সময় পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যাদের কথা জেনেছেন, শুনেছেন, সেই সঙ্গে বিস্ময়কর সব জিনিসপত্রের কথা মার্কো পলো সমকালীন ১৩ শতকের কালপঞ্জি আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি একসময় এক এক করে ঘুরে আসেন পারস্য, তাতার ভূমি আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিস্তৃত চৈনিক ভূখণ্ড। চীনে তিনি সম্রাট কুবলাই খানের জমকালো আর বিখ্যাত প্রাসাদে অবস্থান করেন, রাজধানী বেইজিং থেকে শাংটুসহ দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অনেক এলাকায় নির্ভয়ে গমনাগমন করেন।

ভেনিসে ফিরে আসার কয়েক বছর পর পলো জেনোসের যুদ্ধে কারাবন্দী হন এবং সঙ্গী কয়েদির সাহায্যে তার সেইসব অভিজ্ঞতাকে জীবন্ত করে রাখতে একটি বই লিখেন। আজকে সাত শত বছর পরও, তখনকার সেইসব ঘটনাপঞ্জি আমাদের সবার অন্যতম আগ্রহের বিষয়।

মানসম্পন্ন এই সংস্করণটি মার্সডেন-এর অনুবাদ অনুসরণে লিখা। সম্পাদক মেনুয়েল কোমরুফ একে আরো নির্ভুল করতে, মার্কো পলোর ওপর লেখা হেনরি ইয়েল-এর দুই খণ্ডের বইও ব্যবহার করেছেন এবং মার্সডেন-এর বইতে নেই এমন সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি অধ্যায়ও যোগ করেছেন।

মেনুয়েল কোমরুফ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০-১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪) নাট্যকার, স্ক্রিন রাইটার, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক এবং অনুবাদক মেনুয়েল কোমরুফ আমেরিকার নিউইয়র্কে ১৮৯০ সালে ৭ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই সাংবাদিক

দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পলো

[দ্য ভেনিসিয়ান]

দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পলো

[দ্য ভেনিসিয়ান]

ভূমিকা ও সম্পাদনা

ম্যানুয়েল কোমরুফ

মার্ডেন-এর অনুবাদ অবলম্বনে

অনুবাদ

সোহরাব সুমন

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

দ্য ট্রাভেলস অব মার্কো পলো
[দ্য ভেনিসিয়ান]
ভূমিকা ও সম্পাদনা : ম্যানুয়েল কোমরুফ
মার্ডেন-এর অনুবাদ অবলম্বনে

অনুবাদ : সোহরাব সুমন

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪

ই-মেইল
dibyaprakashbooks@gmail.com

কম্পোজ
জে আর গ্রাফিক্স
৩৩/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন
ঢাকা ১১০০

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com/dibyaprakash

মূল্য : ৪০০ টাকা US $ 15

ISBN 978 984 90545 4 2

আম্মাকে

আম্মার কাছেই প্রথম শুনি
অতীতে পায়ে হেঁটে মানুষ কতদূর যেত

ভূমিকা

টানা ছাব্বিশ বছর অনুপস্থিত থাকার পর, মার্কো পলো, তার বাবা নিকোলো এবং তার কাকা মাফিও কুবলাই খানের জমকালো রাজপ্রাসাদ থেকে তাদের ভেনিসের বাড়িতে ফিরে আসেন। তত দিনে তাদের পরনের কাপড় ছিঁড়ে একাকার; সঙ্গে বয়ে আনা গাঁট্টি-বোঁচকা প্রাচ্যদেশীয় পোশাকে ঠাসা এবং তাদের তামাটে মুখগুলো তখন বিগত দিনের সুদীর্ঘ সহিষ্ণুতা আর প্রচণ্ড দুর্ভোগের প্রমাণ বয়ে বেড়াচ্ছে। এরই মধ্য দেশের সবাই তাদের প্রায় ভুলতে বসেছে। ভাবসাব দেখে তাদের পুরোপুরি বিদেশি বলেই মনে হচ্ছিল এবং তাদের কথা বলার ধরন আর উচ্চারণ এবং আচার-আচরণ ছিল একেবারেই অস্বাভাবিক। এই ছাব্বিশ বছরে ভেনিসও অনেক বদলে গিয়েছে, তাই এই ভ্রমণকারীদেরও নিজেদের পুরাতন বাড়িখানা খুঁজে পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কিন্তু অবশেষে তারা নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়িঘর দেখে তাদের ঘরে ফেরার বিষয়টা আঁচ করতে পারে। তাদের এই ফিরে আসা ছিল পারস্যের মরুভূমি থেকে ফিরে আসা, পামিরের সুউচ্চ ঢাল থেকে ফিরে আসা, রহস্যময় তিব্বত থেকে ফিরে আসা, কুবলাই খানের হতবুদ্ধি করা প্রাসাদ তথা চীন থেকে ফিরে আসা, মোঙ্গলিয়া বার্মা, সিয়াম, সুমাত্রা, জাভা; যেখানে আদম প্রথম পা ফেলেছিল সেই শ্রীলঙ্কা এবং পুরাকথাময় এবং বিস্ময়কর ভারত ভূমি থেকে ফিরে আসা। কিন্তু ভ্রমণকারীরা তাদের বসতবাড়ির সদর দরজার কড়া নাড়তেই ভেনিসের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ স্বরে চিৎকার করে ওঠে।

অনেক দিন ধরেই সবাই ভাবছে পলোরা সব বুঝি এত দিনে মরে একেবারে ভূত হয়ে গেছে, আর তাই সদর দরজার কাছে জীর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা কাপড় পরা তিন তিনটে লোকের সন্দেহজনক ঘোরাফেরা দেখে তাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েরা যারা তত দিনে ওদের বাড়িঘর দখল করে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে তাদের ভেতরে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর, অবশেষে, বজ্র ঝড়ের সুযোগে পরিব্রাজকেরা তাদের গাঁট্টি-বোঁচকা টানতে টানতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়। এ খবর শুনে ভেনিসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের অন্যান্য আত্মীয়েরা ছুটে আসে এবং অনেক বাদবিসম্বাদের পর, বহুদিন ধরে মৃত গণ্য হওয়া এই তিনজন পলো, তাদের আত্মীয়স্বজনদের বোঝাতে পারে তারা মোটেই ভণ্ড কেউ নন। খবরটা দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে করে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়।

দু-একদিন পর বিশাল এক ভোজের আয়োজন করা হয়, যেখানে তাদের পুরাতন সব বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত করা হয়। তিন পর্যটক লাল রঙের লম্বা ঢিলে জামা পরে সবার সামনে হাজির হন, কিন্তু খেতে বসার আগে সেসব খুলে রাখেন এবং অন্য একধরনের টকটকে লালচে ঢিলেঢালা পশমি জামা পরেন, এ সময় আগেরগুলো কেটে সেই টুকরো কাপড় চাকর-চাকরানিদের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। খাবার ফাঁকে পরিব্রাজকেরা ভোজের কক্ষ ছেড়ে বাইরে যান এবং পরক্ষণেই আবারও ফিরে আসেন। এ সময় কোনো কোনো অতিথিকে দামেস্কের কাপড় আর গাঢ় লাল রঙের মখমলের গাউন উপহার দেয়া হয়। রাতের খাবার শেষ হবার পর মখমলের গাউন খুলে পর্যটকেরা সে সময়কার সাধারণ ফ্যাশনের জামা-কাপড় পরে সবার সামনে আসে; এবং মখমলের আলখাল্লাগুলো মোঙ্গল প্রথা অনুসারে আগের মতোই অতিথিদের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়।

তাদের এ ধরনের কৃতিত্বে বড় ধরনের বিস্ময় সৃষ্টি হয়। কিন্তু টেবিল পরিষ্কার করার পর সব চাকরবাকরদের হল ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়, এবার মার্কো পলো সেই জীর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়গুলো পরে সবার সামনে আসে, যেগুলো এই তিন পর্যটক তাদের ভ্রমণের সময় পরে ছিল। তারপর ধারালো ছুরির তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে সেগুলোর সেলাইয়ের ভাঁজ বরাবর একটানে ছিঁড়ে ফেলে টেবিলের ওপরে অসংখ্য রুবি, সর্পমণি, নীলা, হীরকখণ্ড, পান্না, মুক্তা এবং অন্যান্য আরো সব মহামূল্যবান রত্নখণ্ড ছড়িয়ে দেয়। সেসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক অতিথিদের সবাই একেবারে বোবা বনে যান; কিন্তু পর্যটকদের পরিচয় আগে থেকেই জানা থাকায় তাদের কারো কারো মনে যে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটেছিল, এবার সেটা পুরোপুরি মিইয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবার সবাই এই তিন ভদ্রলোকের প্রতি এই বলে সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করে যে তারা বণিক পরিবারের সদস্য বই অন্য আর কেউ তো নয়। এ সবই ১২৯৫ সালের কথা।

জন ব্যাপটিস্ট রামুসিওর লেখা ভ্রমণ কাহিনির প্রথম এডিশন থেকে, সুদীর্ঘ পর্যটন শেষে বাবা আর কাকার সঙ্গে মার্কো পলোর বাড়ি ফিরে আসার এই ঘটনাটি নেয়া হয়েছে, যিনি তার লেখা সেই ভ্রমণ কাহিনি কালেকশন অব ভয়েজেস এন্ড ট্রাভেলস-এ বলেছেন : "আমার যখন যুবক বয়স সেই সময় আমি এই কাহিনিটি তখনকার প্রথিতযশা মেসার হাসপারো মালপিয়েরোর কাছে বহুবার শুনেছি, ভদ্রলোক ছিলেন সেই সময়কার কীর্তিমান একজন সিনেটর, সদগুণ আর সততার জন্য তিনি ছিলেন সমধিক পরিচিত, তার বাড়ি ছিল সান্তা মারিয়া খালের প্রান্তে... এবং তিনি বলেছেন তার নিজের বাবা, দাদা আর প্রতিবেশী আরো অনেক প্রবীণ লোকেদের মুখে তিনি এই গল্পটি বহুবার শুনেছেন।"

কেমন করে মার্কো পলো চীন দেশে গেলেন

মার্কো পলোর জন্ম ১২৫৪ সালে, ভেনিসে। তার বাবা নিকোলো এবং তার কাকা মাফিও ছিলেন ব্যবসায়ী, গ্রেট কাউন্সিলে তাদের আসন ছিল এবং ভেনিসের অভিজাতদের সঙ্গে ছিল তাদের ওঠাবসা। মার্কোর আরো একজন চাচা ছিলেন, তিনি কনস্টান্টিনোপল এবং ক্রিমিয়াতে বসবাস করতেন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

১২৬০ সালের দিকে পলোরা তাদের দীর্ঘকালীন প্রথম পর্যটন শুরু করে। নিকলো পলো এবং তার ভাই, মাফিও, প্রথমে কনস্টান্টিনোপল এবং সেখান থেকে এক ব্যবসায়ীক ভ্রমণে ক্রিমিয়ায় যান। পরে আরো বেশি লাভের আশায় তারা ভোলগা থেকে সুদূর উত্তরের দিকে চলে আসেন এবং পরে পূর্ব দিকে এগিয়ে বোখারায় পৌঁছান। জায়গাটা তাতার সম্রাট কুবলাই খানের এলাকা, এখানে এসে এই বণিকেরা একজন রাজদূতের সাক্ষাৎ পান, যিনি কুবলাই খানের দরবারে এক ভোজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানান। মার্কো পলোর ভ্রমণ কাহিনির সেই বইতে শুরুতেই তার বাবা আর চাচার কুবলাই খানের দরবারে হাজির হবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, ইউরোপ থেকে আসা এই ভদ্রলোকেদের দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং তাদের প্রতি অভাবনীয় সম্মান প্রদর্শন করেন।

বণিকদের কাছ থেকে তিনি তাদের দেশ সম্পর্কে জানেন, তাদের খ্রিস্টীয় ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা নেন এবং এর পরপরই তিনি, এক শত শিক্ষিত মিশনারি পাঠিয়ে চীনবাসীকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার আহ্বান ও শান্তির বার্তাসহ তাদের পোপের কাছে দূত হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে দূত প্রেরণের এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মোটেই ধর্মীয় ছিল না; এর পেছনে কাজ করছিল শিল্প-দক্ষ জনবল বাড়াবার ইচ্ছা, কিছুক্ষণ বাদে কুবলাই খানের কাহিনি থেকে আমরা এ সম্বন্ধে ধারণা পাবো। যে করেই হোক না কেন, সেই ভাইয়েরা যখন ১২৬৯ সালে পোপের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তার বছরখানেক আগেই জনহিতৈষী, চতুর্থ ক্লেইমেন্ট, ইংরেজ দর্শনের ধারক-বাহক, রজার বেকন মারা যান এবং তার উত্তরসূরি তখনো নির্বাচিত হয়নি। সেখান থেকে ভেনিসে ফিরে এসে নিকলো জানতে পারেন তার অনুপস্থিতিকালীন তার স্ত্রীও মারা গেছে। তার ছেলে মার্কো পলো তত দিনে বড় হয়ে গেছে, সে তখন পনের বছরের সুদর্শন বালক।

বণিকেরা ভেনিসে টানা দু'বছর অবস্থান করে, কিন্তু এত দিনেও নতুন পোপ নির্বাচিত হয় না, প্রতিশ্রুতি রক্ষার খাতিরে তারা তাদের এই ব্যর্থতার কথা কুবলাই খানের কাছে ফিরে গিয়ে জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো সন্দেহ নেই, দূরদেশে বাণিজ্য করে অনেক অর্থকড়ি বানাবার সুযোগও ভাইদের দ্রুত প্রবাসে ফিরে যাবার অন্য একটি কারণ; আর এবারের ভ্রমণে মার্কোকেও তারা সঙ্গে নেবার সিদ্ধান্ত নেন।

একরি গিয়ে তারা লিজির আর্চডিকানের কাছ থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে নেন, আর্চডিকন তখন ক্রুসেডে ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ডের সঙ্গ দিচ্ছিলেন; চিঠিতে তিনি তাদের মিশন ব্যর্থ হবার কারণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। সেই দলিল হাতে নিয়ে, পলোরা পূর্ব দিকে তাদের দীর্ঘ যাত্রা শুরু করেন। যদিও খুব বেশি দূর যাবার আগেই বার্তাবাহক মারফত তারা জানতে পারেন তাদের সেই বন্ধু লিজির আর্চডিকন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাদের অতিসত্বর তার কাছে ফিরে যাবার অনুরোধ জানিয়েছেন। কুবলাই খানের মিশন সম্পন্ন করতে আবারও তারা একরি ফিরে আসেন। কিন্তু নতুন পোপ, দশম গ্রেগরি, তাতার সম্রাটকে কেবল দুজন ডোমেনিকান সন্ত পাঠাতে সক্ষম হন। আধ্যাত্মিক পরিণতিতে বিশ্বাসী এই অর্ধশিক্ষিত ভিক্ষুগণ মনে করেন পোল্যান্ডের সীমান্ত হয়ে পীত সাগর পেরিয়ে, সাইবেরিয়ার ঢাল ধরে এগিয়ে গেলেই তারা ভারতে পা রাখতে পারবেন। এই দুই ভিক্ষুর কাছে সেটাই পুরো মোঙ্গলিয়া, চীন, তিব্বত, সাইবেরিয়া, তুর্কিস্তান আর পারস্য! তারা নিজেরাও মন থেকে এত কষ্টকর মিশন আর দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য তৈরি ছিলেন না। খুব শীঘ্রই এরা তাদের সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ শুরুর আগেই, ভেনিসিয়ানদের কাছে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে, ফিরে আসার প্রথম সুযোগেই বাড়ির পথে রওনা হন।

তিন পলো একাই পথ চলতে শুরু করে, ভয়ঙ্কর দুর্ভেদ্য মরুভূমির ওপর দিয়ে তারা পারস্যের দিকে যাত্রা করে। এ সময় মার্কো পলো ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হন। বালখের শীতল পরিবেশে আসার পর তারা ভ্রমণকালীন জলবায়ুর সবচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে; জায়গাটা এখনকার উত্তর আফগানিস্তানে অবস্থিত। এই স্থানে তারা পারস্যে আক্রান্ত অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে, স্থানীয় ভাষা শিখতে ও রওনা হবার উপযুক্ত সময়ের সন্ধানে পুরো একটি বছর কাটিয়ে দেন।

এখান থেকে তারা পৃথিবীর ছাদ হিসেবে খ্যাত পামির উপত্যকায় ওঠেন। জায়গাটা ছিল ইউরোপের কাছে একেবারেই অপরিচিত আর মার্কো পলোর বর্ণনার আগপর্যন্ত তারা এর নামটি পর্যন্ত শুনেনি; এবং আরো কয়েক শত বছর এই জায়গাসহ কাশগার এবং ইয়ারকান্দের মতো পুবের দূরবর্তী এলাকা সম্বন্ধে জানা একেবারেই সম্ভব ছিল না। এমনকি এসব জায়গার অনেক অংশ আজ পর্যন্ত অচিহ্নিতই রয়ে গেছে।

এখন ভেনিসিয়ানদের এবং কুবলাই খানের মাঝে গোবি মরুভূমি। এখানে জেনে রাখা ভালো, মার্কো পলো পথে যে ধরনের দুর্ভোগ আর ভীতির শিকার হয়েছে সেসবসহ সেখানকার সীমান্তে বসবাসরত উপজাতীয় লোকেদের কুসংস্কারের কথা ছ'শ বছর আগেকার এক চৈনিক তীর্থযাত্রীদের বর্ণনার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজধানীর কাছাকাছি পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সুসমন্বিত ডাক-ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্রাট কুবলাই তাদের আগমনের কথা জানতে পারে, মার্কো পলোর বর্ণনা থেকে সেই ডাক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও জানা যায় এবং তারা যখন চল্লিশ দিনের দূরত্বে ঠিক তখন দরবার হতে তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করার আদেশ আসে। অবশেষে, সাড়ে তিন বছর ভ্রমণের পর, দূতেরা দরবারে ফিরে এসে সম্রাটকে কুর্ণিশ করে। এক শত সুশিক্ষিত জ্ঞানীর বদলে তাদের সঙ্গে তখন কেবল নতুন পোপের কাছে থেকে পাওয়া গোটা কতক চিঠি, পবিত্র ভূমির সামান্য পরিমাণ পূত-পবিত্র তেল এবং মার্কো। ১২৭৫ সালের ঘটনা এটা, মার্কোর তখন সবে একুশ চলছে।

এশিয়ার সম্রাট

কুবলাই খানের জন্ম ১২১৬ সালে, তাই এর থেকে বলা যায় যুবক মার্কো তার দরবারে পৌঁছার সময় তার বয়স ছিল উনষাট বছর। তার যৌবন কেটেছে যুদ্ধে, মাঝ বয়সটা পার করেছেন দেশ জয়ের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে, আর চীন অবরোধের সময়, ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন তার বয়স ছিল চুয়াল্লিশ বছর, এ সময় তিনি সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করে পুনরায় চীন আক্রমণ করেন। একই সময়ে তিনি নিজের অবস্থানও পাকাপোক্ত করেন এবং রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজধানী হিসেবে একটা শহর নির্বাচন করেন। জায়গাটা বর্তমানে পিকিং নামে পরিচিত। মার্কো পলো আসার মাত্র দশ বা এগারো বছর আগের ঘটনা এটা। তত দিনে সেই রাজপ্রাসাদ আপন মহিমা, গৌরবে এবং জৌলুসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে।

অধঃপতনের মধ্যদিয়ে সাং রাজবংশের পতনের পর টানা পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে মোঙ্গলরা প্রাচ্যের নৃপতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। মার্কো পলো চীনে পৌঁছার বছরখানেক পর সেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু "চীন এমন এক সাগর যেখানে সব নদীর জল এসে মিশে।" সম্পূর্ণ বিজয় সূচিত হবার আগে, কুবলাই খান তার মোঙ্গল রাজবংশের পত্তন ঘটাবার পূর্বে, সর্বত্র অবক্ষয়ের চিহ্ন ছিল খুবই সুস্পষ্ট। চারিদিকে তখন অসন্তোষ আর বিদ্রোহের হাতছানি; সারা

দেশে বিরাজ করছে নিশ্চিত এক সামাজিক আক্ষেপ আর অস্বস্তি। সমুদ্র থেকে উঠে আসা বিশাল সেই ভূখণ্ড পশ্চিমে ইউরোপ আর মেরু অঞ্চল থেকে দক্ষিণে ভারতভূমি, থাইল্যান্ড ও সিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত। একটু একটু করে এসব অঞ্চল গৌরব আর জৌলুসে পরিপূর্ণ বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাধর সম্রাট কুবলাই খানের রাজদণ্ডের অধিভুক্ত হচ্ছে, এরপরও তার দেশ জয়ের স্বপ্ন অব্যাহত থাকে।

কিন্তু কেমন করে কুবলাই খান বিশাল সেই ভূখণ্ডের নৃপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন? কিছুক্ষণের জন্য চলুন একটু পিছু ফিরে তাকানো যাক এবং দেখা যাক কী করে মোঙ্গল রাজবংশের উত্থান সূচিত হলো, যে রাজবংশ চূড়ান্ত একপর্যায়ে এসে সারা বিশ্বকে বিধ্বস্ত আর পদানত করার হুমকি নিয়ে আবির্ভূত হয়। কুবলাইয়ের দাদার মাধ্যমে এই রাজবংশের পত্তন ঘটে, যার জন্ম ১১৬ সালে, তিনি ছিলেন মোঙ্গলিয়ান এক প্রভাবশালী গোত্রের প্রধানের ছেলে, বিভিন্ন অঞ্চল দখলের মাধ্যমে সেখানকার জনগণকে বশে আনার কর্তাব্যক্তিটি ছিলেন তিনি নিজে, কুবলাই খান নয়। তার সময়কাল ফুরবার আগেই চেঙ্গিস খান তার সৈন্যবাহিনীকে নাইপারের উপকূল পর্যন্ত বিজয়ের পতাকা ওড়াতে দেখেছেন। কিন্তু তার ইউরোপ আক্রমণের সিদ্ধান্ত ছিল অনেকটাই অপূর্বপরিকল্পিত এবং প্রতারণার কারণে শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

তেরো বছর বয়েসে চেঙ্গিস খান যুদ্ধ শুরু করেন, বাবার মৃত্যুর পর নিজেকে মোঙ্গল গোত্রের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরপরই বেশ কিছু তাতার গোত্র মোঙ্গলদের উত্তরাধিকার দাবি করে বসে। তাদের বক্তব্য ছিল, "গভীরতম কূপও কখনো কখনো শুকিয়ে যায় এবং কঠিনতম পাথর পর্যন্ত কখনো কখনো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়; আমরা কেন ওর প্রতি অনুরক্ত থাকব?" কিন্তু বালক প্রধান তার মায়ের সহায়তায় তাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী সব গোত্রের টুটি চেপে ধরেন। নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী বোধ কারার মতো অবস্থানে পৌঁছুতে তার বয়স চুয়াল্লিশের কোটায় এসে ঠেকে, অথবা তত দিনে তার শত্রুরা সবাই যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিশুষ্ক তৃণপ্রধান মোঙ্গল স্টেপ প্রান্তরের সর্বশেষ শত্রুকে পরাভূত করতে, তিনি দক্ষিণ চীনের তাতারদের ওপর আক্রমণ পরিচালনার কথা ভাবতে শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে বেশ কয়েকটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চেঙ্গিস খান চীনের মহাপ্রাচীর অতিক্রম করে সৈন্যবাহিনীকে তিনটি বিশাল সেনাদলে বিভক্ত করে সেখানে নিজের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সেনাবাহিনীর সেই প্রথম অংশটি, তার তিন ছেলের নেতৃত্বে, দক্ষিণে অগ্রসর হয়; দ্বিতীয় অংশটি, তার চতুর্থ ভাইয়ের নেতৃত্বে পূর্ব দিকে রওনা করে, অন্যদিকে তিনি নিজে ছোট ছেলে, টুলিকে সঙ্গে নিয়ে, সৈন্যসমেত দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে যান। এই অভিযানে পুরোমাত্রায় সাফল্য অর্জিত হয় এবং বিশাল এলাকা তাদের

নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে চেঙ্গিস খানের সন্তুষ্টি বিধান হয়, তিনি এর বেশি আর চান না; এ প্রসঙ্গে শাহ্ মুহাম্মাদকে তিনি লিখেন : "আপনার প্রতি আমি আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি; আমি আপনার ক্ষমতা এবং আপনার সাম্রাজ্যের বিশালতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল; আপনাকে আমি আমার সবচাইতে আদরের সন্তান হিসেবে গণ্য করি। আমার পক্ষ থেকে একথা অবশ্যই জেনে রাখবেন যে আমি চীন জয় করেছি এবং এর উত্তরের তুর্কির সব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে পদানত করেছি; একথাও আপনার জানা যে আমার এই দেশ যোদ্ধার একটা গুদাম, একটা রুপার খনি, তাই আমার আর অন্যে ভূমির দরকার নাই। আমি মনে করি নিজেদের সমস্বার্থে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যৌথ বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে।" প্রস্তাবটা খুব ভালোভাবেই গৃহীত হয়, কিন্তু এর পরপরই এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় সেটা বাধাগ্রস্ত হয়। প্রথম বাণিজ্য মিশনটি জব্দ হয় এবং অদক্ষ সরকারের হাতে তাদের সবাই নিহত হয়। চেঙ্গিস খান দূত প্রেরণ করে অপরাধী সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, কিন্তু এর জবাবে প্রধান বার্তাবাহকের গর্দান নেয়া হয় এবং বাকিদের দাড়ি কামানো অবস্থায় চেঙ্গিস খানের কাছে ফেরত পাঠান মুহাম্মদ। এ ধরনের অপমানের সমুচিত জবাব দিতে গিয়ে নতুন করে যুদ্ধ বেধে যায়।

আবারও খানের সেনাদল তিনটি বিশাল ভাগে বিভক্ত হয়; এবং চেঙ্গিস তার ছোট ছেলে কুবলাই খানের বাবা টুলিকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে রওনা হন। মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করতে করতে অগ্রসর হতে থাকে এবং তিব্বতের পাহাড়-পর্বতের সকল বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে তারা সামনে এগিয়ে যায়।... তাসখন্দ আত্মসমর্পণ করে, বুখারার পতন ঘটে এবং এখানে এসে তিনি মুহাম্মদের জন্য স্বাধীন দু'টি সেনাদল গঠন করে চারদিকে তার পাত্তা লাগান। নরহন্তারকেরা তার পিছু ধাওয়া করে; শহরগুলো নির্মমভাবে লুণ্ঠিত হয়, বাকি সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানকার নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। চেঙ্গিস খান বিশ্বইতিহাসের জঘন্যতম এক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সব ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মুখে শহরের কেন্দ্রস্থল টানা ছয় মাস এই আশি হাজার পদাতিক সৈন্যের সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবশেষে বল প্রয়োগে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয় এবং শহরে অবস্থানকৃত দেড় লাখের ওপর জনতার সবাইকে চেঙ্গিস খানে সৈন্যরা নির্বিচারে হত্যা করে। প্রতিশোধ গ্রহণ সম্পন্ন হবার পর আত্মতুষ্ট চেঙ্গিস খান মোঙ্গলিয়া ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

একই সময়ে, দুটি চলমান সেনাদল অটোম্যান তুর্কি যাযাবরদের পিছু ধাওয়া করে তাদের ইউরোপের দিকে নিয়ে যায় এবং প্রচণ্ড উন্মত্ততার কাছে অসহায় হয়ে সেই যাযাবরদের সবাই একসময় পরাজয় বরণ করে। বলা হয়ে থাকে ইউরোপে 'ভয়ঙ্কর তুর্কি'দের উপস্থিতি সেই অবিবেচক প্রতারক তাতার আক্রমণেরই ফসল।

১২২২ সালের বসন্তের দিকে মোঙ্গলরা জর্জিয়ার দিকে অগ্রসর হয়; এবার রাশিয়ানরাও সেই একই ভুল করে এবং মোঙ্গল ছাউনি থেকে প্রেরিত কয়েকজন দূতকে হত্যা করে। জবাবে মোঙ্গলরা তাদের জানায়: "আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি, কিন্তু যেহেতু আপনারা যুদ্ধ চাইছেন সেহেতু আপনাদের সেটা লড়তে হবে।" আবারও দেশজুড়ে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, এবার বৃহত্তর বুলগেরিয়াতেও প্রবেশ করে, লুণ্ঠন সম্পাদন করে দেশটিকে পুরোমাত্রায় বিধ্বস্ত করে জনগণকে এদিক-সেদিক পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এবার চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য পোল্যান্ড সীমান্ত বরাবর বিস্তৃত হয়।

এরও দশ বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপে হানা দেয়া হয়, চেঙ্গিস খান তখন মৃত, তার ছেলে তখন সম্রাট। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট আক্রমণাত্মক এই সব যাযাবরদের হুমকিতে চিন্তিত হয়ে, খ্রিস্টান শব্দটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সমগ্র ইউরোপবাসীকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার এবং ক্যারিন্থিয়ার ডিউক, বোহেমিয়ার রাজার নেতৃত্বে যৌথ বাহিনী আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। মোঙ্গল বাহিনী পিছিয়ে আসে, চেঙ্গিস খানের ছেলে, সম্রাটের মৃত্যুই এর একমাত্র কারণ নয়; মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের জাল বিস্তারই এর অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। মোঙ্গল বাহিনী হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড এবং কিয়েভ থেকে সরে এসে, নাইপারের পূর্ব তীরে তাঁবু ফেলে এবং এখান থেকে পূর্বের দিকে মুখ করে অপেক্ষা করতে থাকে। ইউরোপ রক্ষা পায়।

পোপ একে পুরোপুরি নিজের বিজয় বলে মনে করে এবং মোঙ্গলদের কাছে কয়েক দফা দূত পাঠিয়ে তাদের খ্রিস্টান ধর্মীয় বিশ্বাসে বাপ্তাইজ হবার আহ্বান জানান। এমনই এক প্রস্তাবের জবাবে চেঙ্গিস খানের এক নাতি জানান: "আপনার প্রেরিত চিঠিমালাতে আমাদের অনতিবিলম্বে বাপ্তাইজের মাধ্যমে খ্রিস্টান হওয়া উচিত বলে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে; আমরা এখন সংক্ষেপে তার জবাব দিচ্ছি, যে আমরা মোটেই বুঝতে পারছি না কেন আমাদের এমনটা করতে হবে... আপনারা পশ্চিমের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে আপনারাই একমাত্র খ্রিস্টান এবং অন্যদের অবজ্ঞা করেন; কিন্তু একথা আপনারা কেমন করে নিশ্চিত হতে পারলেন স্রষ্টা কাকে তার অনুগ্রহ প্রদান করবেন। আমরাও স্রষ্টার উপাসনা করি এবং তার প্রদত্ত শক্তি বলেই, তারই ইচ্ছাতেই পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করেছি। কিন্তু আমরা যদি স্রষ্টার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক না হতাম তাহলে আমাদের পক্ষে কি সেটা আদৌ সম্ভব হতো?"

কয়েক বছর পর, আবারও, ডোমেনিকান তিনজন দূত, তাদের পোপকর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূত হিসেবে দাবি করে মোঙ্গল রাজ্যে প্রবেশ করে এবং একজন রাজপুত্রের সামনে সজোরে বক্তৃতা করতে শুরু করে। মোঙ্গলদের অতীত কৃতকর্মের জন্য বিশেষ করে খ্রিস্টানদের হত্যা করা এবং ঈশ্বর নির্বাচিত

লোকেদের বিরক্ত করে তারা যে ধরনের গর্হিত পাপ করেছে, এর জন্য তাদের অনুতপ্ত হবার আহ্বান জানিয়ে যথেষ্ট অবিচক্ষণ কাজ করে।

এরপর আবারও ১২৫৩ সালে, দূত উইলিয়াম ডি রাবরোকুইস পোপ কর্তৃক রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং সম্রাট এবং তার অনুগতদের ধর্মান্তরিত করতে পূর্ব দিকে রওনা হন। তাকে পরপর এক অঙ্গরাজ্য থেকে আরেক অঙ্গরাজ্যের রাজকুমারের কাছে পাঠানো হয়, অবশেষে তাকে জানানো হয়: "বোকারা বলে বেড়ায় স্রষ্টা একজন, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা অনেক ঈশ্বরের কথা বলে।" সে সময় চেঙ্গিস খানের নাতি, কুবলাইয়ের বড় ভাই দেশ শাসন করছে। আসলে রাবরোকুইস এসেছিলেন ফ্রান্স থেকে, তার উদ্দেশ্য ছিল দেশটির অর্থবিত্তের খোঁজখবর নেয়া এবং এতে করে এই দূতের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে এঁদের দ্বারা পুরো ইউরোপ আক্রমণ করা সম্ভব। ১২৫৯ সালে মাঙ্গু মারা যান এবং তার ভাই কুবলাই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাকেই মোঙ্গল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়, কেননা তিনিই সাং রাজবংশের কপালে পরাজয়ের শেষ কালিমা লেপন করেন। কিন্তু তার নিজের পতনও ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। উত্তরের বর্বর উপজাতি ও দক্ষিণে সেনাবাহিনীর ভেতরকার বিদ্রোহ, পদানত জাতী-গোষ্ঠীর মাঝে বিরাজমান অব্যাহত ক্ষোভ এবং সর্বশেষ সমুদ্রপথে জাপান অভিযানের ব্যর্থতা, সবকিছু মিলে ভয়াবহ এক অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। তবে তিনি খুব ভালোভাবেই এসব বুঝতে পেরেছিলেন, ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানের বিস্তারের মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

যখন এই দুজন বণিক ভদ্রলোক ভেনিস থেকে তার দেশে এসে উপস্থিত হন, কুবলাই খান তখন তাদের দেখে অভিভূত হন। আর খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি পোপের কাছে এক শত সুশিক্ষিত লোক চেয়ে পাঠান। কোনো সন্দেহ নেই, এ ক্ষেত্রে তার মনে অন্য কোনো পরিকল্পনাও কাজ করছিল। কিন্তু ক্ষমা না করলেও, কুবলাই খানের সেসব অশুভ ইচ্ছা আমলে না নিয়ে, পোপ বিচক্ষণতার সঙ্গে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারতেন। তিনি যদি শ'খানেকের বদলে হাজারখানেক লোক সেখানে পাঠাতেন তাহলে সুবিশাল সেই ভূখণ্ডের ওপর অতিসামান্য হলেও তার প্রভাব পড়ত। ফলশ্রুতিতে সেখানে নতুন ধর্ম বিস্তারের পথ সুগম হতো; সেটা না হয়ে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটেছে, এতে সম্ভবত খ্রিস্টান ধর্মেরও বিকৃতি ঘটেছে।

শুরুতে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্বন্ধে পোপের কোনো ধরনের ধারণা ছিল না। এমনকি এর ফলে চীনে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অধঃপতন ঘটে, ফলে সেখানকার মানুষের মধ্যে এই ধর্মটি সম্পর্কে বিশ্বাসের মাত্রা নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের পর্যায়েও পৌঁছাতে পারে না। উল্লেখ্য, সিরিয়া হতে পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ এই

ধর্মীয় গোষ্ঠীটি হারিয়ে যায়। চীনের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় মার্কো পলো প্রায়ই এ ধরনের বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। এর থেকে অনেক বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব ছিল। হাজারখানেক না হলেও অন্তত শ'খানেক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি যদি তখন চীনে বসবাস করত এবং বিভিন্ন সময় তারা নিজ দেশে ফিরত তাহলে আজকে এই মানবসভ্যতার ইতিহাস অন্য রকম হতে পারত। ইউরোপ তখন সবেমাত্র বর্বর অবস্থা থেকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করেছে, একই সময়ে আরো অনেক দিক দিয়ে চীন তখন যথেষ্ট সংস্কৃতিবান। মার্কো পলো কেবল বাণিজ্যের খাতিরে পণ্য লেনদেন করে, অন্যদিকে সে জায়গায় এক শত সংস্কৃতিবান লোক হলে তারা অবশ্যই চিন্তা-চেতনার লেনদেন করতে পারতেন। চিন্তা-চেতনার লেনদেনের সঙ্গে মানবসভ্যতার বৃহত্তর লাভালাভের বিষয়টি জড়িত।

তোপধ্বনি বাজালেন কুবলাই খান

মার্কো পলো চীনে পৌঁছাবার সময় কী ছিল চৈনিক সভ্যতার স্বরূপ? কোন দিক দিয়ে তা ইউরোপ থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল? পোপের বার্তাবাহক হয়ে মার্কো পলোর আগেই সেখানে গিয়েছিলেন রাবরোকুইস। সেই ভ্রমণ সম্পর্কে এক জায়গাতে তিনি নিজ অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন : "ভিন্ন পরিস্থিতি, ধারণার অগ্রকল্পনার একেবারে বিপরীত, খুবই পরিমার্জিত, ভদ্রোচিত, শ্রদ্ধাভাজন ও সুবিদিত, এতসব গুণ তাদের সামাজিক মেলামেশাকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। ইউরোপের মতো এখানে সবসময় ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি, অকারণ যুদ্ধ, আর রক্তপাতের মতো ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় না, এমনকি মদের আসরেও তাদের মাঝে গর্হিত কোনো আচরণ চোখে পড়ে না। সর্বত্রই তাদের সততা চোখে পড়ার মতো; তাদের গাড়িসহ অন্যান্য সম্পত্তি কোনো ধরনের পাহারা বা তালা দেয়া ছাড়াই একেবারে নিরাপদ; এবং কারো হারানো গরু-বাছুর পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থায় সেটা প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবার আয়োজন করা হয়। এতসবের পরও, প্রায়ই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের আকাল দেখা দিত, এ ধরনের পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের চাইতে অভাবীদের অধিক গুরুত্ব দিত।" আর তাদের ধৈর্য সম্পর্কে মার্কো পলোর বিবরণের প্রত্যেক পাতায় পাতায় উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানকার ইহুদি এবং খ্রিস্টানেরা পুরোপুরি ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত, তাদের মন্দিরসমূহও ছিল করের আওতার বাইরে।

মার্কো পলোর ভ্রমণের আগেই সেখানে দু'টি বিশিষ্ট প্রকৌশলগত বিস্ময় সম্পূর্ণ হয়। এর একটি হলো চীনের মহাপ্রাচীর আর অন্যটা হলো গ্র্যান্ড ক্যানেল, ৬০০ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ এই খাল খনন শেষ হয় কুবলাই খানের আমলে। এই খাল রাজধানী পিকিং থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এখনো পর্যন্ত এটা মানুষের তৈরি দীর্ঘতম জলপথ। অশ্বারোহী ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে স্থলপথের যোগাযোগও খুবই উন্নতি লাভ করে এবং মার্কো পলো এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে।

শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও চীন ছিল খুবই পরিণত। চিত্রকর্ম, খোদাই-কর্ম, ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র তৈরিতে, ভাস্কর্য নির্মাণে, পোর্সিলিনের তৈজস পত্র বানাতে এবং স্থাপত্যশিল্পে এরই মধ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সাহিত্যকর্মকেও প্রচণ্ড সম্মানের চোখে দেখা হতো। তারও অনেক আগে, সেই খ্রিস্টপূর্ব ১০৫ সালে সেখানে কাগজের আবিষ্কার হয় এবং কাঠের ব্লক ব্যবহার করে বই ছাপানো শুরু

হয় ৯৩২ সাল থেকে। এরও প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, সম্রাটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিষয়ে এক হাজার অধ্যায় সমন্বিত বিশাল এক বিশ্বকোষ ছাপানোর আদেশ জারি করা হয়। রাজনৈতিক, অর্থনীতি, দর্শন, ধর্মতদত্ত্ব, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, চিত্রকর্ম, সঙ্গীত এবং শিল্পবিষয়ক বিভিন্ন বই অনেকের কাছেই দেখতে পায় মার্কো পলো। ১০৪৩ সালের শুরুর দিকে চীনে পোড়ামাটির ব্লক দিয়ে তৈরি বহনযোগ্য মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ঘটে এবং বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে যেই কাগজের টাকার কথা মার্কো পলো বলেছিল, সেই কাগজের টাকা তখনই সাম্রাজ্যের অনেক জায়গাতে মুদ্রা হিসেবে ছিল প্রচলিত।

কারিগরি যন্ত্রপাতিরও কোনো কমতি ছিল না। সেতুর ওপর দেখা মিলত পানি ঘড়ি। জ্যোতিঃশাস্ত্রের যন্ত্রপাতিও অহরহ ব্যবহার হতো, কয়লা এবং বিভিন্ন ধরনের ধাতব পদার্থ আহরিত হতো খনি থেকে এবং সাগরের লোনা জল থেকে লবণ সংগ্রহ করা হতো।

একুশ বছরের আকর্ষণীয় যুবক, মার্কো পলোর কাছে সেটা ছিল এক অভাবনীয় বিস্ময়কর জগৎ। দেশটির প্রচলিত ভাষা খুব দ্রুত লিখতে আর পড়তে শিখে যাওয়াতে, কুবলাই খান নিজেও এই যুবকের প্রতি খুবই সদয় হন; তার বুদ্ধিমত্তা আর সততা দেখে অতিশীঘ্র তাকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়। চীনের নথিপত্র থেকে জানা যায়, ১২৭৭ সালে পলো নামের একজন রাজকীয় পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হন।

সরকারি কাজে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগে মার্কো পলো দেখতে পান সম্রাটের কাছে তার নিয়োগকৃত লোকেরা অন্তঃসারশূন্য তথ্য প্রেরণ করে। কিন্তু সেই বিস্ময়কর স্থানের লোকেদের আচরণ আর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে সে খুবই আনন্দ পেত। একসময় সেইসব অবাক করা তথ্য তার নিজের ছোট্ট খাতায় নিয়মিত টুকে রাখা একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়। কুবলাই খানও তার সেই সব তথ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, সেসব কথা জানতে পেরে তিনি যথেষ্ট মজাও পেতেন। দরবারে ফিরে এসে এতসব বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরে সে সম্রাটের আরো বেশি আস্থাভাজন হন।

সম্রাটকে তুষ্ট করার জন্য, তার আনুকূল্য আর সুনজরে পড়ার জন্য মার্কো সম্ভব সব কিছুই করতেন। একবার তাকে বিখ্যাত শহর ইয়ংচাও-এর গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে তাকে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। একবার এক যুদ্ধে সেনাবাহিনীর জন্য পাথর ছোড়ার যন্ত্র বানিয়ে সম্রাটের কাছ থেকে আনুকূল্য পান, মার্কোর সেই বিশাল কামান যন্ত্রটি তিন শত পাউন্ড ওজনের পাথরের গোলা শত্রু শিবিরে ছুড়ে মারতে সক্ষম ছিল। আরেকবার সম্রাটের আস্থাভাজন এক মন্ত্রীর ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে মার্কো সম্রাট কর্তৃক সম্মানিত হন।

সম্রাটের শিকার বাহিনীর অভিযানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করে সেসবের বর্ণনা তুলে ধরা এর আগে কারো পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কুবলাই খানের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়েছিল বলে এবং তার কাছের লোক হওয়াতেই তথ্যবহুল এত দীর্ঘ বর্ণনা লিখে রাখা সম্ভব হয়েছিল। বর্ণনার সেই সব পাতা থেকে শিকারের পেছনে ধেয়ে যাওয়া নিয়োজিত অফিসারদের দেশজ পদ্ধতির কথা এবং পতিত ভূমিতে তাদের দর্শনীয় ঘাঁটি স্থাপনের কৌশল সম্বন্ধে জানতে পারি। "অন্যদিকে", শেষে মার্কো পলো এই বলে তার বর্ণনার ইতি টানেন, "কেউ হারানো কোনো জিনিস খুঁজে পাওয়ার পর সেটা প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে না পারলে, চুরির দায়ে তাকে শাস্তি পেতে হতো... এমন কঠিন বিধানের কারণে সেখানে পারতপক্ষে কোনো কিছু হারাবারই সুযোগ ছিল না।"

কুবলাই খান কেমন করে যুদ্ধযাত্রা করতেন সে সম্পর্কে কেবলমাত্র একজন অংশগ্রহণকারীই বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে মধ্যযুগের একজন এশীয় সম্রাটের যুদ্ধে ব্যবহৃত সামরিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জানা যায়। সম্রাটের সুবিশাল তুড়ি বাদ্য সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য লিখে গেছেন পড়ে সেটাও জানা যায়: "নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন সম্পন্ন হতো, চারদিকে তখন বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য তুড়ি বাদ্য বেজে উঠত, আর এর সঙ্গে শুরু হতো গান, যেকোনো লড়াই শুরুর আগে এটাই ছিল তাতারদের রীতি, করতাল আর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে সেই সঙ্গে সুরেলা সঙ্গীত গেয়ে সবার কাছে যুদ্ধযাত্রার কথা জানান দেয়া হতো। কুবলাই খানের নির্দেশ অনুসারে প্রথমে ডানে তারপর বাম দিক থেকে সেই সব বাজনা বাজতে শুরু করত, সেই সঙ্গে বেজে উঠত কুবলাই খানের বিখ্যাত ঢোল। তারপর শুরু হতো এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।"

পলোরা সম্রাটের দরবারের শ্রীবৃদ্ধি করে। মার্কোর বর্ণনা থেকে তার ভ্রমণ করা আর সম্রাটের দখলকৃত অনেক জায়গা সম্পর্কে জানা যায়। তারা টানা বিশটি বছর চীনে অবস্থান করে। তারা যখন দেশটিতে পৌঁছায় সম্রাটের তখন মাঝ বয়স, আর এখন তিনি পুরোপুরি বৃদ্ধ। তার মৃত্যুর পর কুবলাইয়ের কোনো জঘন্য শত্রুর হাতে পাকড়াও হবার ভয়ে ভীত হয়ে পলোরা তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাবার অনুমতি পাবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কুবলাই এরই মধ্যে এই ভেনিসিয়ানদের ওপর যথেষ্ট নির্ভর হয়ে পড়ায় তাদের বিদায় দিতে রাজি হন না।

মার্কো পলোর নথির শুরুতেই তাদের দেশ-ত্যাগের সেই সুযোগ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়, পারস্যের খান, কুবলাইয়ের ভাইয়ের নাতির প্রিয় স্ত্রী মারা গেলে সেই একই মোঙ্গল গোত্র থেকে বাছাই করা একই ধরনের আরো একজন পাত্রী চেয়ে পাঠানো হয়। স্থলপথের ভ্রমণ খুবই বিপদসঙ্কুল হওয়ায়, পথ দেখাতে দক্ষ পলোরা কুবলাই খানের কাছে বিয়ের কনে এবং পারস্য ফেরত অতিথিদের নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য জাহাজ চালনায় নাবিক হিসেবে নিজেদের নাম

প্রস্তাব করে। ইচ্ছা না থাকার পরও শেষ পর্যন্ত সম্রাট এতে সায় দেন। প্রথা অনুসারে ভোজের আয়োজন করে সম্রাট ভেনিসিয়ানদের বিদায় জানান। একই সঙ্গে, তাদের মারফত, পোপসহ ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ডের খ্রিস্টান রাজাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠান।

পলোরা তাদের সহায়-সম্পদের বিনিময়ে মণি-মাণিক্যসহ এমন সব জিনিসপত্র সংগ্রহ করে যা তারা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার সময় পরনের কাপড়ের ভাঁজে সহজে বহন করতে পারবে, দক্ষিণ দিকে বিপদসঙ্কুল সেই সমুদ্রযাত্রার সময় তারা সুমাত্রা, জাভা, সিলন দ্বীপসহ ভারতীয় উপকূলবর্তী অনেক জায়গায় নোঙর করে। পারস্য পৌঁছাতে তাদের দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় লাগে, এরই মধ্যে সেই খান মারা যান, ফলে তার বদলে কনেকে তার পুত্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এর বছর খানেকের মধ্যে তারা বাড়ি পৌঁছে; কিন্তু ভেনিস পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না পাশ্চাত্যের প্রতি ঘোষিত কুবলাই খানের যুদ্ধের তত দিনে ইতি ঘটেছে।

কেমন করে ভ্রমণ কাহিনি লেখা হলো

ভ্রমণকারীরা ভেনিসে তাদের নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পর মার্কো পলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যিকারের কোনো নথি বলতে খুব কমই ছিল, তবুও লিখিত সেই সব তথ্য-প্রমাণ ছিল খুবই সুস্পষ্ট আর যথার্থ।

পলোরা যেহেতু পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার সঙ্গে যুক্ত ছিল, খুব শীঘ্রই আবারও তারা ব্যবসা শুরু করে এবং কোনো সন্দেহ নেই দূরপ্রাচ্য থেকে আগত বণিকদের সঙ্গেই সেই ব্যবসা শুরু করে। ভেনিসের বণিকদের সঙ্গে জেনোয়া আর পিসার বণিকদের সম্পর্কের ধরনটা ছিল খুবই প্রতিযোগিতার। এই তিন ইতালিয়ান বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর মাঝে ব্যবসায়ীক ঈর্ষা খুব দ্রুত তিক্ততায় রূপান্তরিত হয়। বহু বছর আগে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে ভেনিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং তারপর থেকে সম্ভাব্য অনেক ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তাদের এই উন্নতি জেনোয়ার ব্যবসায়ীক গোষ্ঠী মোটেই ভালোভাবে নেয় না, অপরদিকে তারা একরি এবং সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে এবং পালতোলা জাহাজের বহর গড়ে তুলে বেশ কিছু দিকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের বাণিজ্যের পথ অবরুদ্ধ করে রাখে। ১২৯৮ সালের শুরুর দিকে, জেনোয়ার তিনটি জাহাজ গ্রিসের জল সীমায় প্রবেশ করে, ফলে জেনোয়া এবং ভেনিসের মধ্যকার যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় না। সেই যুদ্ধের তথ্যাদি ঘেঁটে মার্কো পলোর নাম জাহাজের 'জেন্টেল ম্যান কমান্ডার' হিসেবে লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়।

নিজেদের পোতাশ্রয় এবং বাণিজ্য জাহাজগুলোকে নিরাপদ রাখতে এবং নিজেদের যুদ্ধাভিলাষী জিঘাংসা চরিতার্থ করতে তৎকালীন বাণিজ্যিক গোষ্ঠী জলপথের সেই যুদ্ধ আয়োজন এবং পরিচালনা করে। নথিপত্র থেকে জানা যায়, পলো পরিবারও একসময় ভেনিসের সেই নৌবহরের জন্য জাহাজ তৈরি ও এর রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সরু কড়িকাঠ দিয়ে সেই সব জাহাজ প্রস্তুত করা হতো এবং এর প্রতিটার দু'পাশে একশ'টা করে দাঁড় থাকত। এর প্রতিটা জাহাজে ২৫০ জনের অধিক নাবিক এবং চল্লিশ, পঞ্চাশ জনের মতো যান্ত্রিক ধনুকসমেত যোদ্ধাসহ দু'জন করে কাঠমিস্ত্রি, পাটাতনের ফাঁক বন্ধ করার জন্য দু'জন, দু'জন সহচর, একজন পাচক এবং কোয়ার্টার মাস্টার কর্মচারী বেষ্টিত একজন ক্যাপ্টেন বা অধিনায়ক থাকতেন। এর প্রতিটা জাহাজেই আবার একজন করে 'জেনটেলমেন-কমান্ডার' থাকতেন, যিনি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে

জাহাজকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত রাখতেন। পরামর্শকের কাজের পাশাপাশি তিনি জাহাজের মাস্টারের দায়িত্ব পালন করতেন।

এ ধরনের একটি নৌবহরে ষাটের অধিক জাহাজ থাকত, যা একজন এডমিরাল এবং দু'জন সহকারী এডমিরালের অধীনে পরিচালিত হতো। পূর্বে উল্লেখ করা নাবিক এবং অন্যান্য জনবল ছাড়াও এ ধরনের প্রতিটি রণতরীতে শল্য চিকিৎসক, ডাক্তার, বর্মকার, ফ্লিচার, আড়া প্রস্তুতকারক, একদল ভদ্রলোক, অস্ত্রসহ অন্যান্য সরবরাহ অফিসার থাকতেন। এবং যুদ্ধের দামামার মাঝে বৈচিত্র্যময় শব্দ সৃষ্টি করে সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য আরো থাকত বিশের অধিক জনের একটি বাদক দল।

১২৯৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, প্রাচ্য থেকে মার্কো পলোর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন বছরের মাথায়, বর্ণিল পতাকা বাতাসে উড়িয়ে বাঁশি আর ড্রামের ছন্দে তাল মিলিয়ে শত দাঁড়ের জাহাজ নিয়ে, ভেনিসিয়ানরা জেনোসের মুখোমুখি হয়। সেই যুদ্ধে ভেনিসিয়ানদের পুরো নৌবহর অবরুদ্ধ হয়। মার্কো পলোসহ তার স্বদেশের আরো ৭০০০ লোক কারারুদ্ধ হয়। সেই সময়কার রীতি অনুসারে বহরের আনন্দ ঝাণ্ডাসমূহ ছিঁড়ে জলপথে টেনে জাহাজগুলোকে পেছনের বন্দরে ফিরে যেতে দেয়া হয়। ভেনিসিয়ান নৌবহরের কমান্ডারগণ পরাজয়ের সেই অপমান মোটেই মেনে নিতে না পেরে একযোগে বেঞ্চিতে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করে। কোনো সন্দেহ নেই, মার্কো পলোর বাবা এবং চাচা অর্থকড়ি বা কোনো কিছুর বিনিময়ে কয়েদিদের ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই পদ্ধতিতে বেশ কিছু কয়েদিকে মুক্ত করা সম্ভব হলেও, যেকোনো কারণেই হোক জেনোসরা মার্কো পলোকে মুক্তি দেয় না।

ভেনিসে তিন বছর নিজ বাড়িতে অবস্থানের সময় তাদের ভ্রমণের সেই বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার গল্প বহুবার বহু জনের কাছে বলতে হয়। সেই সব গল্প শুনে তার শ্রোতারা সবাই একে একে মুগ্ধ হয়। মার্কো পলো ভ্রমণ কাহিনি শুনতে আসা সেই সব অসংখ্য লোকদের ছদ্মনাম দেন 'কোর্ট অব মিলিয়ন'। সেই সময় তার লেখা নথির এক জায়গায় নিজেকে সে 'মার্কো পলো অব দ্য মিলিয়নস' নামে অভিহিত করে।

তবে, সত্যি বলতে কি, তার বলা সেই সব গল্পের সম্পূর্ণ সত্যাসত্য বিশ্বাস করার মতো সমকালীন প্রামাণ্য কোনো নথি তখনো একত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু কারাগারে অবস্থান করার সময় তার সামনে সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। কুবলাই খানকে আনন্দ দেবার জন্য যে নোটবুকটি সব সময় সে সঙ্গে রাখত সে সময় সেটা চেয়ে পাঠায় এবং রাস্টিসিয়ান নামের অনুলেখকের সাহায্যে পার্চমেন্ট কাগজে তার সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনি লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য, রাস্টিসিয়ান ছিল পিসার কয়েদিদের একজন। কাজটা খুব দ্রুতই শেষ হয়, সম্ভবত এতে মাস

খানেকের মতো সময় লাগে, এর আগেই এক বছর পেরিয়ে যায়, এই সময়ে ভেনিস আর জেনোয়ার মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং মার্কো পলো কারামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

এ সময় মার্কো পলো ডোনাটা নামের এক মহিলাকে বিয়ে করে এবং তাদের তিনটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম ফেন্টিনা, বেল্লালা এবং মোরিটা। কিন্তু তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারা যায়। এ সময় তিনি ব্যবসায় সম্পৃক্ত থাকলেও পর্যটক হিসেবেই তার নামডাক অব্যাহত থাকে। জানা যায়, চীন থেকে ফিরে আসার বারো বছর পর, ১৩০৭ সালের দিকে ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে তিনি তার সেই ভ্রমণ কাহিনির একটি অনুলিপি উপহার দেন। মার্কো পলোর ভ্রমণ তথ্য সংবলিত সেই পাণ্ডুলিপিটি আজ প্যারিস লাইব্রেরিতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

মার্কো পলোর অনুলিপি চেয়ে এক বিবরণীতে বলা হয়, "বিশ্ব ভ্রমণকারী এই ব্যক্তি খুবই সম্মানিত, উচ্চগুণে গুণান্বিত এবং বহু দেশে সম্মানিত, ..." মার্কো পলো তার এই ভলিউমখানা আনন্দের সঙ্গে উপহার দেয়ায় সেটি ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাচ্য থেকে মার্কো পলো যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যবান ধনসম্পদ সঙ্গে এনেছিলেন, আর তাই সেখান থেকে ফিরে আসার ষোল বছর পরও সেসবের অনেক কিছুই অবশিষ্ট রয়ে যায়। তিব্বত থেকে আনা সুগন্ধি কস্তুরি বিক্রির জন্য একজন কমিশনভোগী ব্যবসায়ীর নিকট দেয়া হয় এবং এক পর্যায়ে লালচে সেই এক আউন্স পাউডারের ছয় ভাগের এক ভাগ নিয়ে মামলা হয়, বিক্রীত বাকি আধ-পাউন্ডের দামও তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। বিচারক মার্কো পলোর পক্ষে রায় দেন এবং অনতিবিলম্বে কমিশন ব্যবসায়ীকে মূল্য পরিশোধ করেতে বলেন, অন্যথায় তাকে কারাবরণ করতে হবে বলে জানান।

শেষের দলিলটি অনেকটা উইলের মতন, সেটা এখন সেন্ট মার্কস লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। এটা ১৩২৪ সালের, মার্কো পলোর তখন সত্তর বছর বয়স। তত দিনে শরীরে তার রোগ-শোক জেঁকে বসেছে এবং সে তখন বুঝতে পারে প্রতিদিনই একটু একটু করে বুড়িয়ে যাচ্ছে, তাই সে একজন যাজক এবং নোটারি ডেকে পাঠান। তিনি তাদের কাছে তার সম্পত্তি বিলিবণ্টনের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। সেই উইলে তার স্ত্রী এবং তিন কন্যাকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তার মেয়েদের দু'জনের তত দিনে বিয়ে হয়ে যায়।

মৃত্যুশয্যায় বন্ধুরা তার আত্মার শান্তি কামনার সঙ্গে কাকুতি-মিনতি করে বইতে উল্লেখ আছে এমন অনেক বক্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়; কিন্তু এর জবাবে সে কেবল বলে, "আমি যা নিজের চোখে দেখে এসেছি তার অর্ধেকও বলিনি।" মৃত্যুর পর তাকে চার্চ সেন লরেঞ্জতে চিরনিদ্রায় সমাহিত করা হয়।

"ও একটা মার্কো পলো"

মৃত্যুর পরপরই ভেনিসের প্রত্যেক কার্নিভাল উৎসবের দিনে মার্কো পলো একজন হাস্যকর নাটকীয় চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। ষণ্ডা-পাণ্ডারা সেদিন ক্লাউনের পোশাক পরে মার্কো পলোর বেশ ধরে। সে নানা ধরনের সকৌতুক অঙ্গভঙ্গি করত, লোকদের মজা দেয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এদিক দিয়ে তিনি পুরোপুরি সফল। একই সঙ্গে মার্কো পলো বইটির অনুলিপি তৈরি করেছেন এমন কয়েকজন অনুলেখক তাতে তাদের এমন মতামত যুক্ত করতেও ভুলেননি যে এর তথ্যসমূহ খুব মজার হলেও তারা এর সততা ও আস্থা সম্পর্কে একেবারেই সন্দেহমুক্ত নন। এমন শক্ত লৌকিক বিশ্বাস ভাঙতে আরো কয়েক শত বছরেও বেশি সময় লাগে। এরও দু'শ বছর পর কলম্বাসের বিস্ময়কর নতুন পৃথিবী আবিষ্কার সেই প্রতিষ্ঠিত মতামতের ওপর খুব কমই প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এমনকি এই বর্তমান শতকেও, খোদ ইংল্যান্ডে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কারো মিছে কথা ধরিয়ে দিতে কথায় কথায় বলে, "ও একটা মার্কো পলো।"

এতে করে মনে হতে পারে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্বাসকে বর্জনের চাইতে তা বজায় রাখাই বরং ভালো। এমনকি বিভিন্ন সময়ে মার্কো পলোর কিছু কিছু বিবরণে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়। দু'শ বছর আগে প্রাচ্য ফেরত মেগিলানস নামের এক মিশনারি, চীনের কিছু অংশের ওপর তিনি বিশেষজ্ঞও, তিনি চীনে কাগজের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের বিষয়টি বাতিল করে দেন। সৌভাগ্যক্রমে মিং রাজবংশের কিছু কিছু ব্যাংক নোটের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সেগুলো এখন সংরক্ষিত আছে। ইউরোপিয়ানদের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করাও কঠিন ছিল যে চীনে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট ধরনের কালো পাথর গুঁড়ো করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সেটাই এখন আমাদের কাছে কয়লা নামে পরিচিত। দেখতে ঠিক মানুষের মাথার মতো বড়, ভারতীয় নাট সম্পর্কে মার্কো পলোর এমন বর্ণনার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। এখন সেটা কোকোনাট নামে পরিচিত। এবং এই তো সবে কিছুদিন আগে পামিরের বিশালাকার ভেড়ার কথা জানা যায়, এখনকার পর্যটকেরাও এর বর্ণনা দেন, এর নামকরণ করা হয় ওভিস পলি, যার অস্তিত্ব নিয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এই বইতে তার বর্ণনার আরো অনেক কিছুই একসময় কাল্পনিক বলে মনে করা হতো, সেসব এখন বাস্তব হিসেবে প্রমাণিত, সেসবের দীর্ঘ একটা তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব। এককথায় বলতে গেলে, আজ থেকে বহু বছর আগে এই ভ্রমণ মধ্যযুগের এশিয়াকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম।

মার্কো পলোই ছিলেন পুরো এশিয়া অতিক্রম করা প্রথম পর্যটক, তিনিই প্রথম ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দেশ এবং প্রদেশের নামকরণ করেন। তারপরও, শুরুতেই তার ভ্রমণ কাহিনির বইটি পরিত্যক্ত হওয়ায়, এই কাজ বিশ্বের ভৌগোলিক ধারণায় খুব কমই বা আদৌ কোনো প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

মার্কো পলোর বইয়ের সতর্ক বর্ণনা অনুসারে তখনকার কোনো মানচিত্রকারই তাদের তালিকাতে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করেনি। এমনকি আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পরও বিশ্বের অন্যান্য ভূখণ্ডের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক চিত্রায়ণের চেষ্টাও ছিল সবচাইতে দুর্বল ধরনের। অন্যদিকে গত শতাব্দীর ভ্রমণকারীরা মহাদেশের বিস্তৃত প্রান্তরজুড়ে মার্কো পলোর পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়ায় এবং তার বইয়ের বর্ণনা অনুসরণ করে পথ চলে। এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানচিত্র তৈরি করতে যাওয়া বর্তমানের অভিযাত্রীরা মার্কো পলোর ভাসা ভাসা বিবরণে বিভিন্ন পথের দূরত্ব পুরোপুরি সঠিক ছিল না বলেই দেখতে পায়।

আজ থেকে ছ'শ বছর আগে মার্কো পলোর অতিক্রম করে যাওয়া অনেক জায়গা সম্প্রতি ইউরোপিয়ান অভিযাত্রীরা পুনরায় ভ্রমণ করছে। আজকের দিনে সেভেন হেডিন, স্যার অরেল স্টেইন, কর্নেল হেনরি উলে, ড. পল পেলিওট, কর্নেল কসলভ এবং মেজর সায়েকস—এদের সবাই প্রথম সেই ভেনিসিয়ান পর্যটকদের দেখানো বিস্তৃত পথ ধরে বারবার ঘুরে এসেছে।

এটাই তার জনপ্রিয়তা প্রমাণে পুরোপুরি যথেষ্ট, কিন্তু এর পরও আরো অনেক কিছুই বলার থেকে যায়। পারস্যের বিপজ্জনক মরুভূমির ওপর দিয়ে ভ্রমণ করা পর্যটকদের মাঝে তিনিই প্রথম, খোতানের খরস্রোতা নদী তিনিই প্রথম ঘুরে আসেন। চীন, তিব্বত, বার্মা, সিয়াম, সিলন, ভারতসহ আরো শত শত জায়গা ঘুরে এসে বা লোকমুখে শুনে সেখানকার লোকেদের জীবনযাত্রা তিনিই প্রথম সঠিকভাবে তুলে ধরেন। অন্ধকার মহাদেশ সাইবেরিয়া, জানজিবারের সাদা হাতির দাঁত আর কালো মানুষ, এবিসিনিয়ার খ্রিস্টান এবং সুমাত্রার মানুষখেকোদের সম্পর্কে তিনিই প্রথম ধারণা প্রদান করেন। উত্তরের আর্কটিক মহাসাগর আর সেখানকার শ্বেত ভাল্লুক, কুকুরের স্লেজ, বলগা হরিণের কথা জানান এবং দক্ষিণের কথাও। ভারতের প্রচণ্ড দাবদাহের কথা, এর হীরার খনি, মুক্তার প্রাচুর্য এবং জমকালো সব পৌরাণিক কাহিনির কথা তার লেখা থেকেই জানা যায়। তিনিই প্রথম কুবলাই খানের জমকালো প্রাসাদ এবং সারা বিশ্বকে পদানত করার ঝুঁকিতে ফেলতে যাওয়া মোঙ্গল বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামের বর্ণনা দেন; এবং নিজের দেশবাসীর কাছে অপরিচিত বিস্ময়কর ছোট পাখি এবং পশু আর সোনালি ছাদওয়ালা মন্দির এবং ভিনদেশি অজানা অদ্ভুত সব রীতিনীতি, বিস্ময়কর দর্শনীয় জায়গা, ঐতিহাসিক এবং রূপকথার লৌকিক উপাখ্যানসহ আরো অনেক জিনিসের কথা তিনি তার বইতে উল্লেখ করেছেন। এর আগে কোনো বইতেই একাধারে এত বেশি বিস্ময়কর বিষয় স্থান পায়নি।

বর্তমান সংস্করণের পরিকল্পনা

ছাপাখানা আবিষ্কারের বহু বছর আগে মার্কো পলো জেনোয়ার সঙ্গী কয়েদিদের দিয়ে তার ভ্রমণ কাহিনি লেখান। সেই খণ্ড থেকে হাতে হাতে অনুকরণ করে পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করা হয়। এতে করে শব্দ চয়নে বৈচিত্র্য ঘটে, এমনকি মূল কাজেও অনেক বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরি আর জাদুঘরে আজও বইটির পঁচাশিটির মতো পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এর দু'টির মধ্যে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর কোনোটা ইতালি, কোনোটা ল্যাটিনে আবার কোনোটা ফরাসি ভাষায় লিখা।

জানা মতে এর প্রথম ছাপা সংস্করণের সম্পাদকের নাম রামুসিও। এটা ছাপা হয় ১৫৫৯ সালের দিকে। মারডেনের চিরায়ত ইংরেজি সংস্করণটি ইতালিয়ান এই বইটি থেকেই অনুবাদ করে ১৮১৮ সালে ছাপানো হয়। ১৮৫৪ সালে টমসন রাইট আরেকটি সংস্করণ প্রস্তুত করেন বোহন লিবেরির জন্য। এই সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় লিখতে সেই সঙ্গে মূল সংস্করণের টীকা সংক্ষেপ যোগ করতে মারডেনের অনুবাদকর্মটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই সংস্করণটি পরে এভরিমেনস লাইব্রেরি থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে সেটিই ইংরেজিতে সর্বাপেক্ষা পঠিত একটি সংস্করণ।

১৮২৪ সালে ফরাসি জিওগ্রাফিক্যল সোসাইটি মার্কো পলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ ছাপে। পুরাতন ফরাসিতে লিখা একটি পাণ্ডুলিপি থেকে সেটা তৈরি করা হয় এবং সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর নামকরা পণ্ডিতদের আলোচনা হতে একটি বিষয় আজকে সবার কাছে খুবই পরিষ্কার যে গ্রন্থটি অনেকটা খাঁটি। সম্ভবত এমনও হতে পারে সেই সময়কার ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত কথ্য ফরাসি ভাষায় মার্কো পলো তার পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করান। এই সংস্করণটি পরবর্তীতে বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত এম. পাউথিয়ার সম্পাদনা করেন এবং ১৮৬৫ সালে এটি ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত হয়।

এই ফরাসি সংস্করণটিই বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত হেনরি ইয়েল কাজে লাগান। ইংরেজিতে অনুবাদের আগে তিনি মার্কো পলোর আরো অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন এবং অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফরাসি সংস্করণটিই অধিক নির্ভুল বলে মত দেন।

হেনরি ইয়েল বহু বছর ভারতে অবস্থান করেন, এ সময় তিনি মূল্যবান অনেক গ্রন্থ রচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৩ সাল হতে মধ্যযুগীয় পর্যটকদের

ওপর গবেষণা শুরু করেন। ১৮৬৬ সালে তার বই 'ক্যাথি অ্যান্ড দ্য ওয়ে থিদার' ছাপা হয়, একই বছর তিনি লন্ডন ফিরে এসে মার্কো পলোর ভ্রমণের ওপর নিয়মতান্ত্রিক কাজ শুরু করেন। এই কাজে খুব ধৈর্যের সঙ্গে তিনি বাদবাকি জীবনের বড় একটা অংশ ব্যয় করেন। গবেষণার মাধ্যম হিসেবে তিনি অপরিবর্তিত এবং আনাড়ি হাতে লেখা ফরাসি গ্রন্থ ব্যবহার করেন এবং এগুলোতে জানা-অজানা বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা নানা ধরনের জ্ঞানগর্ভ টীকা-টিপ্পনি যোগ করেন। ১৮৭১ সালে তার এই কাজটি প্রকাশের উপযোগী হয় এবং দু'টি খণ্ডে ছাপা হয়। পরবর্তীতে ১৮৭৫ সালে সংশোধিত আকারে বৃহত্তর কলেবরে এর নতুন সংস্করণ ছাপা হয়। এরপরও তিনি থেমে থাকেননি, ১৮৮৯ সালে মৃত্যুর আগে আরো একটি বিস্তৃত সংস্করণের কাজ অসমাপ্ত রেখে যান। তার সেই অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত হেনরি করডিয়ার। বর্তমান সংস্করণটিতে তিনি অনেক মূল্যবান উপাদান যোগ করেন, যা ১৯০২ সালে ছাপা হয়। হেনরি ইয়েলের একাগ্রতা এবং তার বহুদিনের কষ্টার্জিত গবেষণা উপাদান সংযোজিত না হলে বর্তমানের যেকোনো সংস্করণ অসম্পূর্ণই থেকে যেত।

হেনরি করডিয়ার তার গবেষণা অব্যাহত রাখেন এবং ১৯২০ সালে হেনরি ইয়েলের অসমাপ্ত সংস্করণটির বাদ পড়া অংশসহ তৃতীয় একটি খণ্ড তৈরি করেন, এতে সাম্প্রতিককালের অভিযান, গবেষণা এবং আবিষ্কারসমূহ সংযোজন করা হয়।

১৮১৮ সালে মাসডেনের বিখ্যাত মার্কো পলো হতে অন্যান্য সব সংস্করণেই গবেষক, অভিযাত্রী, মধ্যযুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন, ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের পর্যবেক্ষণসহ টীকা যোগ করা হয়। এর কোনো খণ্ডকেই এককভাবে যুগান্তকারী সেই পর্যটনের সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমৃদ্ধ মার্কো পলো গ্রন্থ হিসেবে দাবি করা চলে না।

একথা মাথায় রেখেই বর্তমান সংস্করণটি রচনা করা হয়েছে। যতটা সম্ভব মার্কো পলোর চমৎকার ভ্রমণ কাহিনির সম্পূর্ণ বর্ণনা যথার্থভাবে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত সব কথাবার্তা আর টীকা সম্পাদক কর্তৃক বাদ দেয়ে হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো একটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে আর তা হলো অনুবাদকর্ম বাছাই। ইয়েলের বর্ণনা নির্ভুল হলেও এর ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই বেমানান। অন্যদিকে মারসডেনের ইংরেজি অনুবাদ মানসম্পন্ন হলেও অনেকাংশেই সেটা ভুলে ভরা, সেই ভুলচুক সংশোধন করার চাইতে ফরাসি অনুবাদ গ্রন্থ অনুসরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল ইয়েলের সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করে সংশোধন করাই হয়নি, অনেক অবান্তর দীর্ঘ বর্ণনা ও কঠিন অনেক শব্দ বাদ দিয়ে, বাক্যের দৈর্ঘ্যে সাম্যতা আনা হয়েছে। এর একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আর তা হলো মার্কো পলোকে আরো অধিক পঠনযোগ্য করে তোলা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত অনেক টীকা-টিপ্পনিও

যোগ করা হয়েছে। উপযুক্ত অনেক ক্ষেত্রে মার্কো পলোর সময়কার ব্যবহৃত অনেক পুরাতন নাম বজায় রাখা হয়েছে এবং যেখানে যেখানে সম্ভব হয়েছে আগেকার নামের বদলে সমকালীন আধুনিক নাম সংযোজন করা হয়েছে, যেমন : কানবালু (পিকিং)। এর পাশাপাশি, বর্তমান সংস্করণটিকে যতটা সম্ভব সম্পূর্ণতা দান করতে ফরাসি সংস্করণ হতে প্রাপ্ত বাদ যাওয়া অনেক অনুচ্ছেদ এবং সম্পূর্ণ অধ্যায় যোগ করা হয়েছে।

ভালো করে নজর বুলালে বোঝা যাবে এর বেশ কিছু অধ্যায় যারা মারসডেন অনুসরণ করে লিখেছেন তাদের থেকে একেবারে আলাদা। অনেক দীর্ঘ অধ্যায়কে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। ইয়েলের অনুসৃত ফরাসি সংস্করণের অনুক্রম অনুসরণ করতে গিয়েই এমনটা করতে হয়েছে। ইয়েলের বিস্তৃত তিন খণ্ড থেকে বিখ্যাত টীকাসমূহ উদ্ধৃত করতে ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা অনুসারে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের নির্দিষ্ট স্থানে সেসব যোগ করা হয়েছে।

মানুষ হিসেবে মার্কো পলো

মর্কো পলো আমাদের সবার কাছে একজন পর্যটক হিসেবেই পরিচিত এবং আমরা তাকে এ ধরনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু তার সম্পূর্ণ বিবরণে ব্যক্তি হিসেবে তার উপস্থিতি বলতে গেলে একেবারেই নেই। কেমন ছিল তার আচরণ? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বা কেমন ছিল?

প্রথমেই আমরা জেনেছি মার্কো পলো ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, এক বণিক পরিবারে তার জন্ম এবং বাবা আর চাচার সঙ্গে তিনি চীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাই সব সময় তিনি ব্যবসাপাতি, টাকা-পয়সা, লাভ-লোকসান এসব নিয়ে কথা বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। তার চোখও সেসবই দেখবে আর এ ধরনের পর্যবেক্ষণই তার পুরো বর্ণনাজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। কিন্তু মার্কো পলোর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই স্বাভাবিক ধরনের।

ভ্রমণের প্রথম দিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিশটি পাখির বর্ণনা দিয়েছেন। পুরো খণ্ডজুড়ে তিনি পশু, গাছপালা এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি, বাদাম আর বীজের কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। তার এমন সূক্ষ্ম বর্ণনা থেকে আমাদের পক্ষে এটা ধরে নেয়া মোটেই ভুল হবে না যে তিনি সত্যিকারের একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। বাড়িতে বয়ে আনা ধন-সম্পদ থেকে আবারও সেই একই কথা প্রমাণ হয়। এক জায়গাতে তিনি বুনো ষাঁড়ের লোম সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে আসার কথা বলেন; অন্য আরেক জায়গাতে আমরা কস্তুরি উৎপাদনকারী গজলা-হরিণের মাথা আর পা নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা শুনতে পাই; এরপর ব্রাজিল গাছের বীজের কথা জানতে পারি

এবং সবশেষে সাগু গাছের শাঁস থেকে নানা ধরনের পিঠা বানাবার কথা জানতে পারি। অন্য যেকোনো কিছুর বদলে প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত তার মতো আর সবাইকে সেসব আকৃষ্ট করবে। তখনকার দিনে চীনে প্রচলিত বিস্ময়কর কাগজের টাকা সঙ্গে আনার কথা তিনি কখনো বলেননি, এমনকি কোনো শিল্পকর্ম সঙ্গে আনার কথা তার মুখে কখনো শোনা যায়নি।

এই বইতে তিনি নির্দিষ্ট করে চীনের মহাপ্রাচীরের কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথবা চায়ের কথা বা মহিলাদের আবদ্ধ পায়ের কথা, কিন্তু কোন পাখির পালকের লেজ কতটা লম্বা অথবা খানের বাজপাখিগুলোর পায়ে রুপোর আংটি পরিয়ে কেমন করে সেগুলোকে চিহ্নিত করা হতো সেসবের বর্ণনা দেবার সুযোগ একটুও হারাতে চাননি।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা তাকে মন-খোলা, সাহসী, কৌশলী দেখলেও কখনো কখনো তৎকালীন জীবনযাত্রা নিয়ে চিন্তিত দেখতে পাই। তার ভাষা মোটেই কাব্যিক ছিল না, বরং ব্যবসায়িক জীবনযাত্রা ঘনিষ্ঠ বিষয়াদিতেই তা ছিল অধিক কেন্দ্রীভূত। তিনি ছিলেন কাব্যিক কল্পনা বা কাব্যনন্দন দৃষ্টিভঙ্গিহীন একজন লোক, আর এই দিকটি আমলে নিলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে চিরকালীন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার অধিক মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

এতসবের পরও, তিনি কুবলাই খানের প্রতি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত। তার প্রাসাদে দেখা বিস্ময়কর যাবতীয় বস্তু এবং তার সম্পর্কে তিনি সবসময় প্রচণ্ড আবেগে উদ্বেলিত হয়ে কথা বলতেন। কুবলাই খানের হেরেমের জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে যুবতী বাছাইয়ের বর্ণনা দেবার সময় তিনি প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করতেন না। অন্যদিকে তাতারদের বিস্ময়কর জীবন প্রণালির বর্ণনা দেবার সময় তার দেখা সেখানকার স্বামীদের তাদের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততাকে খুবই সম্মানজনক বলে উল্লেখ করেছেন।

আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা এবং লোক ঠকানো জুয়াড়িদের প্রতি মার্কো পলো খুব বিনয়ের সঙ্গে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সব সময়ই তিনি ছিলেন রাশভারী এবং সস্তা চটুলতামুক্ত। তার এই ভারসাম্যকে কোনো কিছু দ্বারা বিঘ্নিত হতে দেখা যায়নি; চূড়ান্ত অস্বাভাবিকতা অথবা সবচাইতে আশ্চর্যজনক প্রথাসমূহ আর সব কাজের মতোই খুব সহজ সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে সেই পর্যটকেরা অবশ্যই চলনসই যান্ত্রিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মার্কো পলো, তার বাবা এবং চাচা মিলে খানের জন্য একটা আর্টিলারি ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছুই তাদের নির্মাণ করতে হয়েছে, সেসব কথা খুব সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার সর্বত্রই ব্যবসায়ী মার্কো পলোর প্রবল উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়; প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা সেখানে দ্বিতীয় এবং খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ তৃতীয় স্থানে।

অবশ্য, মার্কো পলো আমাদের যতটা বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন, কুবলাই খান আসলে ততটা চমৎকার, বলিষ্ঠ সম্রাট ছিলেন না। এটা সত্য যে তিনি উদারভাবে দরিদ্র-সেবা করতেন কিন্তু চৈনিক বর্ণনা মতে জানা যায় বিভিন্ন বিতর্কিত কাজের জন্য তাকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো এবং অনেকটা নিছক জোর খাটিয়েই তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই ধূর্ত প্রকৃতির একজন কুচক্রী, যেকোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করতেন না। তার মতের বিরুদ্ধে গেলে তার প্রতি যেকোনো ব্যবস্থা নেয়াকেই সে বৈধ বলে মনে করত।

সাং রাজবংশের একজন জেনারেল কুবলাই খান কর্তৃক ধৃত হবার পর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছিলেন : "আমার ভূগর্ভস্থ কারা কূপে কেবল চাবুকের আঘাতেই আলো জ্বলত; সেখানকার একাকিত্বের মাঝে বসন্তের বাতাসের দেখা কখনো মিলত না। কুয়াশা আর শিশিরের প্রকোপে, বহুবার আমি আত্মহত্যার কথা ভেবেছি; এবং তারপরও, দুই বছরে ঘুরেফিরে আসা ঋতুর প্রকোপে, আমার শিরার ভেতরে রোগ বাসা বাঁধে। অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর সেই মাটি আমার কাছে ছিল সাক্ষাৎ স্বর্গের মতো। আর সে কারণেই সেখানকার দুর্ভোগ আমাকে মোটেই কাবু করতে পারেনি; এবং তাই আমার মাথার ওপর ভাসমান সাদা মেঘের পানে তাকিয়ে আমি অটল থাকতে পারি, যদিও মনের ভেতরে তখন আমি আকাশের মতোই সীমাহীন এক দুঃখ বয়ে বেড়াচ্ছি।"

মার্কো পলো যখন কুবলাই খানের সঙ্গে ছিলেন তখনই এসব কথা লেখা হয়। কিন্তু চলুন এখন আমরা সেই ভেনিস এবং জেনোয়ার মধ্যকার যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফিরে যাই এবং সেই জেনোয়া যেখানে মার্কো পলো নিজেই ভেনিসীয় রণতরীতে অবস্থানের কারণে একজন কয়েদি হিসেবে দীর্ঘদিন বন্দি ছিলেন। সেই বন্দিত্বের ফলে তাকেও ক্লান্ত-অবসন্ন হতে হয় এবং আবারও কোনো দিন ভ্রমণে বের হতে পারবেন কি না সে কথা ভেবে সে সময় তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাকেও কারাগারের ঘোর অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। আচরণে তার কোনো কাব্যিকতা ছিল না এবং সেসব কথা লিখে রাখার মতো অনুভূতিও তার মাঝে কাজ করেনি। কিন্তু বলার মতো অনেক সত্যে তার পেট ছিল ঠাসা। অনেক দূর দেশের সেই বিস্ময়কর অজানা কাহিনির ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জি তখনো তার স্মৃতির অনেক খানি জায়গা দখল করে রয়েছে। সেই সব কথা টুকে রাখার খাতাও তখন হাতের কাছে এবং সঙ্গীরা সেসব দিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে কাজে নেমে পড়ে। আরো একবার তাকে নিজের সেই গল্পগুলো সবিস্তারে খুলে বলতে হয়। পাণ্ডুলিপিকারেরা সেসব লিখে রাখে; এবং এর ফলে অনন্য এক ভ্রমণের অভাবনীয় একটি তথ্যকোষ প্রস্তুত হয়ে যায়, এখান থেকেই পর্যটন সাহিত্যের শুরু।

–মেনুয়েল কোমরুফ

সূচিপত্র

শুরুর কথা

সম্রাটেরা, রাজারা, ডিউকগণ, মার্ক্যুইসেরা এবং নাইটসহ অন্যান্য সব ধরনের লোকেরাই মানুষের জাতিগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানতে এবং একই সঙ্গে তারা প্রাচ্যের সব রাজ্য, রাজত্ব, প্রদেশ এবং সমগ্র এলাকা সম্পর্কে জানতেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এই বই পড়ে সেসব দেশের, বিশেষ করে আর্মেনিয়া, পার্সিয়া, ভারত এবং তাতারদের সবচাইতে বিস্ময়কর আচরণ সম্পর্কে জানা যায়, ভেনিসের বিদগ্ধ শিক্ষিত জ্ঞানী নাগরিক মার্কো পলোর এই বইটির সঙ্গে তা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। দীর্ঘদিন ভ্রমণের পর তিনি নিজ চোখে যা যা দেখেছেন এবং অন্যদের কাছে যা যা শুনেছেন তার সবই তিনি এই বইটিতে বিস্তারিত লিখে গেছেন। আর তাই এই বইটি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

জেনে রাখা ভালো, আদম সৃষ্টির পর হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত কোনো লোকই, হোক সে মূর্তিপূজারি বা খ্রিস্টান ক্রুসেডের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলিম, অথবা খ্রিস্টান, অথবা অন্য কেউ, তার বংশ পরিচয় যাই হোক না কেন, তাদের মাঝ থেকে কোনো লোকই উপরে বর্ণিত এই মার্কো পলোর মতো একাধারে বিস্তৃত পরিসরে এত জিনিস দেখেননি আর এত বিষয়াদির পর্যবেক্ষণও করেননি। এই বইটির মাধ্যমে তিনি যা যা দেখেছেন এবং যা যা শুনেছেন তা সবার কাছে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন, যাতে করে অন্য যাদের সেসব নিজ চোখে দেখার সুযোগ হবে না তারা এর থেকে উপকৃত হতে পারেন। ১২৯৮ সালে জেনোয়ার* কারাগারে বন্দি থাকাকালীন তিনি এতসব একই কারাগারে কয়েদ হওয়া পিসার বাসিন্দা মাস্টার রাস্টিজিলোকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

---

* ১২৯৯ সালে স্বাক্ষরিত জেনোয়া এবং ভেনিসের মধ্যকার একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। এই চুক্তির ফলে মার্কো পলো এবং তার অনুলেখক রাস্টিজিলো জেনোয়ার কারাগার থেকে মুক্তি পান।

* দ্বিতীয় টি বাল্ডউইন ১২৩৭ থেকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

১
পলোদের দুই ভাই কেমন করে কনস্টান্টিনোপল অতিক্রম করে বিশ্ব ভ্রমণে বের হয়

পাঠকদের নিশ্চয় এ কথা জানা রয়েছে যে, দ্বিতীয় বাল্ডউইন কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট থাকা অবস্থায় ভেনিসে অবস্থান করা একজন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিনিধিত্ব করতেন। এবং ১২৬০ সালের দিকে, কথিত মার্কোর বাবা নিকলো পলো, তার ভাই মাফিও ছিলেন তখনকার দিনের খুব সম্মানিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি, নিজেদের বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজে করে তারা ধন-সম্পদসহ নিরাপদে কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছে। নিজেদের ব্যবসা প্রসারের উদ্দেশ্যে তারা ইউক্সিন বা কৃষ্ণ সাগর অভিমুখে অভিযান পরিচালনায় ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইদৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা অনেক মনোহারি আর মূল্যবান রত্নাদি ক্রয় করেন এবং কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করার অনুমতি গ্রহণ করে, সাগর পাড়ি দিয়ে সলডাইয়া বন্দরে পৌঁছেন, এখান থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা দীর্ঘ-পথ অতিক্রম করে বার্কা নামক ক্ষমতাধর তাতার প্রধানের প্রাসাদে গমন করেন। এই তাতার প্রধান বলগারা এবং সারা নামের দুই শহরে বসবাস করতেন। জানা যায়, তাতার গোত্রের মাঝে তিনিই ছিলেন সবচাইতে সভ্য এবং উদার প্রকৃতির রাজা। এই পরিব্রাজকদের আগমনে তিনি খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সম্মানের সঙ্গে তাদের স্বাগত জানান। এ ধরনের ভদ্রতাসূচক ব্যবহার আর সাদর অভ্যর্থনার বিনিময়ে তারা উপঢৌকন হিসেবে সঙ্গে থাকা রত্ন উপহার দেন এবং সেইসব মণিরত্নের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাদের আরো অধিক মূল্যের কিছু উপহার প্রদান করেন।

ভ্রাতৃদ্বয় বছর খানেক রাজকুমারের এলাকায় অবস্থান করার পর, তাদের মনে আবারও বাড়ি ফেরার ইচ্ছে জাগে, কিন্তু পূর্ব তাতার শাসন করছেন আলাউ নামের আরেকজন গোত্র প্রধানের সঙ্গে তার হঠাৎ যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাদের সেই ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়। ভয়াবহ আর রক্তক্ষয়ী সেই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ আলাউয়ের বিজয়ের ফলে পথঘাট পর্যটকদের ভ্রমণের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এ কারণে ভ্রাতৃদ্বয় যে পথে এসেছিল সেই একই পথ ধরে বাড়ি ফিরতে ব্যর্থ হয়। এবং পুবের অচেনা পথ ধরে বারাকা অঞ্চল দিয়ে বহু কষ্টে তারা কনস্টান্টিনোপল ফিরে আসে। পথে পশ্চিম তাতার রাজ্যে অবস্থিত শহর ওউকাকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হন। সেখান থেকে তারা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে স্বর্গের চার নদীর অন্যতম

টাইগ্রিস (ভোলগা) নদী অতিক্রম করে, এক বিরান মরুভূমিতে এসে উপস্থিত হন, যার উপর দিয়ে টানা সতের দিনের যাত্রার পরও কোনো শহর, প্রাসাদ, এমনকি কোনো দালানও তাদের নজরে আসেনি। সে সময় সমতলের চারদিকজুড়ে কেবল তাতারদের তাঁবুর মাথা তাদের নজরে এসেছে। জায়গাটা পেরিয়ে আসার পর অবশেষে তারা বোখারা নামক শহরে এসে পৌঁছান। শহরটি তখনকার পারস্যের এক অঙ্গরাজ্য আর একই সাম্রাজ্যের অন্যতম শহর, আর সেটা শাসিত হচ্ছিল বারাক নামের এক রাজন্যের দ্বারা। এখানে এসে পৌঁছার পর আরো সামনে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে এখানেই টানা তিন বছর কাটিয়ে দেন।

বোখারায় অবস্থানকালে, প্রখ্যাত এক প্রতিভাধর ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনাক্রমে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। আলাউ থেকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি তাতারদের সর্বময় নেতা গ্রেট খান* কুবলাইয়ের কাছে যাচ্ছিলেন। মহাদেশের উত্তর-পূর্বে দূরবর্তী অঞ্চলে তার বাস। ইতালির স্থানীয় লোক হওয়ায় আর এরই মধ্যে তাতারদের ভাষা খুব ভালোভাবে শিখে ফেলায় এবং তাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটাবার পর তাদের আচরণ ভালো মনে হওয়াতে তিনি এই দুই ভাইকে আগ্রহ নিয়ে গ্রেট কুবলাই খানের সাক্ষাতের সময় তাকে সঙ্গ দেবার অনুরোধ জানান। খান তার দরবারে এমন কাউকে দেখতে পেলে বরং খুশিই হবেন। যদিও আগে থেকেই তিনি এমন কাউকে খুঁজছিলেন, আর এর আগে এমন লোকের সন্ধান তিনি পাননি। তখনো পর্যন্ত তাদের দেশের কোনো লোক সেখানে পরিদর্শন করেনি। সেই সঙ্গে এই নিশ্চয়তাও দেয়া হয় যে তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানানোসহ প্রচুর উপঢৌকনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হবে। এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরার আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পেরে তারা সেই প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সর্বময়ের কাছে প্রার্থনা ভিক্ষা করতে থাকে। ভেনিস থেকে আনা বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান চাকরবাকরসহ রাষ্ট্রদূতের আর্জি সঙ্গে নিয়ে তারা ভ্রমণে বের হন।

টানা এক বছর ধরে উত্তর-পূর্ব আর উত্তরের দিকে যাত্রা করে তারা সেই রাজকীয় প্রাসাদে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তুষারপাত, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর ফুঁসে ওঠা, সেই বরফ গলার আগপর্যন্ত এবং বন্যার পানি নেমে যাবার অপেক্ষায় তারা যাত্রা বিরতিতে বাধ্য হয়, এ কারণে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়। সেই ভ্রমণে তারা অনেক মহামূল্যবান বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু সেসব এখানে আর উল্লেখ করা হচ্ছে না, কেননা মার্কো পলো নিজেই পাঠকদের সামনে এই বইতে সেসবের বর্ণনা তুলে ধরেছেন।*

---

* খান = নৃপতি। কুবলাই খানকে গ্রেট কুবলাই খান নামেও ডাকা হয়। খান সার্বভৌম স্বাধীন (রাজার রাজা)। লেখার মাঝে পলো সব সময়ই কুবলাইকে গ্রেট খান হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তার অধীনস্ত রাজন্যদের খান নামে অভিহিত করেছেন।

২
কেমন করে গ্রেট খান দু'ভাইকে তার বার্তাবহ হিসেবে পোপের কাছে পাঠান

গ্রেট খান, কুবলাই নিজের চারিত্রিক গুণাবলি অনুসারে স্বেচ্ছায় সিংহাসন থেকে নেমে এসে অমায়িকভাবে এই পর্যটকদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান, কেননা তারাই ছিলেন সেই দেশে আগত প্রথম ল্যাটিন। তাদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করা হয়। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি অত্যন্ত উৎসুকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জানতে চান, জানতে চান রোমান সম্রাটের কথা, অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা-রাজন্যদের কথা, একইভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কথা, তাদের বিত্ত-বৈভব আর সহায়-সম্পত্তির কথা, তাদের বিচার-ব্যবস্থা আর যে শাসন প্রক্রিয়া এবং নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে তারা তাদের রাজ্যসমূহ শাসন করে আসছেন, সেই সঙ্গে জানতে চান কেমন করে তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছেন এবং বিশেষ করে তাদের কাছ থেকে তিনি সম্মানিত পোপ আর চার্চের কার্যাবলি সম্পর্কে জানতে চান। আগে থেকেই নির্দেশিত থাকায় তারা অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার সেই সব প্রশ্নের যথোচিত জবাব দেন এবং যেহেতু খুব ভালোভাবেই তাদের তাতার ভাষা জানা ছিল, তাই সর্বদাই তারা আলোচিত বিষয়াদিসমূহ গ্রেট খানের ভাষায় প্রকাশ করে নিজেদের জন্য যথাযথভাবে উচ্চতর মূল্যায়ন কাড়তে সক্ষম হন, এবং খানকে এসব বিষয় অবহিত করতে তাদের অন্য কারো সহায়তার প্রয়োজন হয়নি।

দু'ভাই খুব বিস্তারিতভাবে তাকে সব তথ্য সরবরাহ করার পর তিনি তাদের ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মনে মনে তিনি তার রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাদের পোপের কাছে প্রেরণের কথা ভাবতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি তার মন্ত্রীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার পর, তাদের প্রস্তাব করেন, সেই সঙ্গে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, যাতে রোমের সেই সমুদ্র অভিযানে খাগাতাল নামের তার নির্বাচিত একজন অভিজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে, তিনি তাদের বলেন, সপ্ত কলা* এবং খ্রিস্টান ধর্মের ওপর বিশদ জ্ঞান রয়েছে এমন শ'খানেক বিদ্বান ব্যক্তিকে তার কাছে প্রেরণের জন্য তার পক্ষ থেকে তারা যেন পোপকে অনুরোধ জানান এবং তারা যেন এমন সব লোকেদের প্রেরণ করতে বলেন যারা তার অঞ্চলের লোকেদের চাইতে শিক্ষা-দীক্ষায়-যোগ্যতার মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ আর তারা যেন খ্রিস্টান ধর্মকে প্রামাণ্য যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে অন্যসব ধর্ম বিশ্বাসের চাইতে এর সত্যকে সবার সামনে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপনে সক্ষম হন; কেননা তাতারগণ তাদের বাসাবাড়িতে যেসব ঈশ্বরের ভজনা করে আর যেসব দেব-দেবীর মূর্তিসমূহের পূজা করে তা কেবল

অশুভ আত্মার, তাই তারাসহ পুবের আর সবাই যেন স্বর্গীয় বিষয়াদিতে তথা ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের পূর্বমূল্যায়নে সক্ষম হন। তিনি আরো বলেন, ফেরার সময় তারা যেন জেরুজালেম হতে সঙ্গে করে প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুণ্যসমাধির প্রদীপ থেকে সামান্য পবিত্র তেল সংগ্রহ করে তার জন্য নিয়ে আসেন, কেননা তাকে তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন এবং সত্যিকার ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করেন। কুবলাই খানের মুখ থেকে এ ধরনের আদেশ শ্রবণ করার পর তারা বিনয়ী ভঙ্গিতে তার সামনে প্রণত হয়ে, তাদের মনের বাসনার কথা প্রকাশ করেন এবং এমন আদেশ পালনে তারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত এবং সর্বতোভাবে এই আদেশ পালনে চেষ্টা করে যাবেন বলে জানান। এ বিষয়ে তিনি রোমের পোপ বরাবর তাতার ভাষায় একটি চিঠি লিখে তাদের হাতে দেন।

সেই সঙ্গে তিনি তাদের তার রাজকীয় ক্ষমতা প্রদর্শক সোনালি ফলকের ওপর খোদাই করা রাজকীয় প্রতীক বহনের আদেশ প্রদান করেন; যে লোক এই প্রতীক বহন করবেন, তিনিসহ তার দলের সবাইকে, প্রতিরক্ষা সহচরসহ নিরাপদে বহন করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের সমস্ত এলাকায় ঘাঁটি থেকে ঘাঁটিতে পৌঁছে দিতে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যেকোনো রাজধানী, প্রাসাদ, শহর বা গ্রামে অবস্থানকালে তাদের থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের রসদ সরবরাহ করবে।

এ ধরনের সম্মানজনক ক্ষমতাসহকারে তারা গ্রেট কুবলাই খানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ভ্রমণে বের হন, কিন্তু বিশ দিনের অধিক অতিবাহিত না হতেই তাদের সঙ্গী সেই অফিসার খাগাতাল ভয়াবহ অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তারা আর সামনে অগ্রসর হতে পারেন না। সেখানকার একটা শহরে এসে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরামর্শ করে এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারে সেই অফিসারই তাকে রেখে তাদের সামনে অগ্রসর হতে বলেন। এই ভ্রমণের সময় তারা রাজকীয় প্রতীকের কারণে যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করেন এবং যাবার পথে সর্বত্র নজর কাড়তে সক্ষম হন। তাদের ব্যয় বহন করা হয়, রাজকীয় সাজের রক্ষীরা তাদের এগিয়ে দিতে আসে। এতসবের পরও তাদের প্রচণ্ড শীত, তুষারপাত, বরফ, বন্যার মতো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়, এতে করে তাদের চলার গতি অনিবার্যভাবে খুব ক্লান্তিকর আর ধীর হয়ে পড়ে এবং আর্মেনিয়া সমুদ্রবন্দর লেইয়াসাস-এ পৌঁছাবার আগেই পুরো তিনটি বছর কেটে যায়।

সেখান থেকে সমুদ্রপথে, তারা ১২৬৯-এর এপ্রিলে এক্রিতে এসে পৌঁছে এবং সেখানে এসে জানতে পারে পোপ চতুর্থ ক্লেমেন্ট সম্প্রতি দেহ ত্যাগ করেছেন। পোপ যে প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি তখন এক্রিতেই থাকতেন এবং তারা সেই প্রতিনিধিকে তাতার সম্রাট গ্রেট কুবলাই খান কর্তৃক

তাদেরকে দেয়া আদেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাদের পরবর্তী পোপ নির্বাচিত হবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন, এবং পরবর্তী পোপ নির্বাচিত হয়ে আসার পর বিষয়টি নিয়ে তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে অগ্রসর হতে বলেন। এই পরামর্শকে যথোপযুক্ত বিবেচনা করে, এরই ফাঁকে তারা ভেনিসে তাদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্রি থেকে জাহাজে করে নেগ্রপন্ট হয়ে তারা ভেনিসে গমন করেন। বাড়ি পৌঁছে নিকলো পলো জানতে পারেন, তার রেখে যাওয়া সন্তান সম্ভবা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তার অনুপস্থিতিতেই মারা যান, সেই পুত্রের নাম রাখা হয়েছে মার্কো এবং এখন তার পনের বছর চলছে। এই মার্কোর হাতেই বর্তমান বইটি রচিত হয় এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে এই বইতে তার দেখা বিভিন্ন বিষয় আর ঘটনাসমূহ সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

৩

নিকলোর ছেলে মার্কোকে সঙ্গে নিয়ে দু'ভাই আবারও গ্রেট খানের উদ্দেশে ভেনিস ছাড়লেন

ঠিক সেই সময় প্রচুর বাধা-বিপত্তির কারণে পোপ নির্বাচন বন্ধ থাকায়, সেটি সম্পন্ন হবার অপেক্ষায়, টানা দু'বছর ভেনিসে অবস্থান করেন; অবশেষে তারা বুঝতে সক্ষম হন এই কালক্ষেপণে গ্রেট খান তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, অথবা এসও ধারণা করতে থাকতে পারেন তাদের মনে হয়তো তার দেশে পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছে নেই, এই ভেবে তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে উপযুক্ত সময়ে এক্রিতে ফিরে যান; এবং এবার তারা তরুণ মার্কো পলোকে সঙ্গে নেন। পোপের প্রতিনিধির অনুমতিসাপেক্ষে তারা জেরুজালেম গমন করেন এবং সেখান থেকে তারা পুণ্যসমাধির বাতি হতে সামান্য পরিমাণে তেল সংগ্রহ করে, গ্রেট খানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তার আনুগত্য অনুসারে অর্পিত কর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা এবং খ্রিস্টান চার্চের পোপ মনোনীত হননি, রাজন্য কর্তৃক এমন বিবৃতিমূলক চিঠি জোগাড় করার পর, তারা লেইয়াসাস বন্দরের দিকে অগ্রসর হন।

যাই হোক তারা চলে যাবার পর, পোপের সেই দূতের কাছে ইতালি থেকে বার্তাবহেরা এসে পৌঁছে, কলেজ অব কার্ডিনাল কর্তৃক তিনি পোপ ঘোষিত হয়েছেন সে খবর দেবার জন্য তারা দ্রুত প্রেরিত হয়েছেন বলে জানান। এবং এর পরপরই তিনি দশম গ্রেগরি নাম পরিগ্রহ করেন। তিনি এখন সার্বভৌম তাতার সম্রাটের ইচ্ছে পুরো করতে পারেন, এটা বুঝতে পেরে খুব দ্রুত তিনি আর্মেনিয়ার রাজার কাছে চিঠি লিখে, তার নির্বাচিত হবার ঘটনা সম্পর্কে জানান এবং এই

বলে অনুরোধ করেন, যে দু'জন দূত গ্রেট কুবলাই খানের কাছে যাচ্ছেন তারা তখনো তার রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে না থাকেন তাহলে তিনি যেন তাদের সত্বর ফিরে আসতে বলেন। এই চিঠি এসে পৌঁছার সময় তারা আর্মেনিয়াতেই অবস্থান করছিলেন এবং নতুন উদ্দামের সঙ্গে তারা আবারও এক্রিতে ফিরে যাবার আদেশ পালন করে; সেই উদ্দেশ্যে রাজা তাদের জন্য একটি রণতরী সজ্জিত করেন; একই সঙ্গে সার্বভৌম পুরোহিতকে অভিনন্দন জানাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একজন দূতও প্রেরণ করেন।

পৌঁছাবার পর, পোপ তাদের অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান এবং অতিশীঘ্র তিনি ধর্মপ্রচারক দু'জন খ্রিস্টান ভিক্ষুসমেত পোপের পত্রসহ তাদের দ্রুত প্রেরণ করার আদেশ জারি করেন, সেই দুজন ভিক্ষু তখন সেখানেই ছিলেন; তারা দুজনেই ছিলেন খুবই জ্ঞানী এবং বিজ্ঞানেও পারদর্শী, একই সঙ্গে ধর্মতত্ত্বেও ছিল তাদের অগাধ জ্ঞান। তাদের একজনের নাম ঋষি নিকোলাস অব ভিসেনজা এবং অপরজনের নাম ঋষি উইলিয়াম অব ত্রিপলি। তাদেরকে তিনি অনুমতিপত্রসহ বিশপ পদমর্যাদার ধর্মাধিকারী পুরোহিতের কর্তৃত্ব প্রদান করেন, যেন তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন। তার পক্ষ থেকে কুবলাই বরাবর প্রেরিত অনেক মূল্যবান উপহার সামগ্রীর জিম্মাদারের দায়িত্বও তিনি তাদের প্রদান করেন, যার মাঝে রয়েছে বেশ কিছু সুদৃশ্য ক্রিস্টালের ফুলদানি এবং তার আশীর্বাদ পত্র। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবারও তারা লেইয়াসাস বন্দরের দিকে যাত্রা করে, এরপর জাহাজ থেকে নেমে আর্মেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন।

এই অবস্থায় তারা গুপ্তচর মারফত জানতে পারেন যে ব্যাবিলনিয়ার সুলতান বুন্দকধারী, অসংখ্য সৈন্যসমেত আর্মেনিয়া সীমান্তে অনুপ্রবেশ করেছেন এবং সিংহাসন দখল করে তিনি দেশটির পশ্চিমের বেশিরভাগ এলাকা পদানত করেছেন। এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে সেই দু'জন ভিক্ষু আর সামনে অগ্রসর না হবার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন এবং পোপের চিঠি আর উপহার সামগ্রী ভেনিসিয়ানদের হাতে দিয়ে তারা নিজেদেরকে গির্জার নিরাপত্তা ব্যূহে সোপর্দ করতে উপকূলে ফিরে যান।*

নিকলো, মাফিও এবং মার্কো এতসব ধ্বংসযজ্ঞ আর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চলেন। আর্মেনিয়ার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভ্রমণ অব্যাহত রাখার জন্য অনেক আগে থেকেই তারা এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কয়েক দিন টানা পায়ে হেঁটে মরুভূমিসহ আরো অনেক বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে, উত্তর-পূর্ব আর

---

* কিন্তু এই ব্যর্থ অভিযান যোগাযোগের আরো অসংখ্য চেষ্টার মাঝে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র এবং প্রতিবারই দুর্বলতর চেষ্টা আর দুর্বলচিত্তদের কারণে এইসব অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, কেননা প্রথম দিককার খ্রিস্টান মিশনের মাঝে কোনো প্রকার দখলদারিত্বের ইচ্ছে ছিল না এইচ. জি. ওয়েলস, দ্য আউট লাইন অব হিস্ট্রি।

উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে, অবশেষে তারা গ্রেট খানের খবর পান, তিনি তখন ক্লিমেইনফু (সাঙ্গু)** নামের বিশাল এবং জাঁকজমকপূর্ণ এক শহরে বসবাস করছিলেন। এই পুরো ভ্রমণে তাদের মোট সাড়ে তিন বছরের মতো সময় লাগে; তবে শীতের মাসগুলোতে, তাদের অগ্রগতির পরিমাণ বিবেচনায় নেয়ার মতো নয়। অনেক দূর থেকেই গ্রেট খান তাদের আগমনের কথা জানতে পারেন এবং পথের দুর্ভোগের কারণে তারা কতটা অবসাদগ্রস্ত সেটা অনুমান করে, চল্লিশ দিনের পথ বাকি থাকতেই তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দূত পাঠান, আর তাদের গমন পথের সর্বত্র আরাম-আয়েশ প্রস্তুত রাখার জন্য নির্দেশ জারি করেন। এ কারণেই সদা প্রভুর কৃপায় বিশেষ বাহনে চড়ে অবশেষে তারা নিরাপদে রাজপ্রাসাদে পৌঁছান।**

৪
গ্রেট খানের সঙ্গে নিকলো, মাফলো এবং মার্কো পলোর সাক্ষাৎ

পৌঁছানোর পর গ্রেট খান তার পুরো পারিষদবর্গের গুরুত্বপূর্ণ অফিসারদের উপস্থিতিসহকারে সম্মান আর সৌজন্যের সঙ্গে তাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানান। কাছাকাছি আসার পর তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকা সবাই মেঝেতে ঝুঁকে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। এর পরপরই তিনি তাদের সবাইকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করেন এবং পোপের সঙ্গে সমঝোতাসহ তাদের ভ্রমণের যাবতীয় টুকিটাকি সম্বন্ধে জানতে চান। আগেকার মতোই তারা প্রাঞ্জল ভাষায় সব কিছুর বর্ণনা দিতে শুরু করেন, এ সময় তিনি খুব মনোযোগসহকারে ও নীরবে তাদের সব কথা শুনেন। এরপর পোপ গ্রেগরির পাঠানো চিঠি আর তাঁর উপহার সামগ্রী তাঁর সামনে রাখা হয়। তাদের মুখে সব কথা শুনে তিনি তার এই দূতেদের আনুগত্য, ঐকান্তিকতা এবং অধ্যবসায় সম্পর্কে অনেক বেশি প্রশংসা করেন; এবং তাদের হাত থেকে গভীর শ্রদ্ধা আর আগ্রহের সঙ্গে পবিত্র সমাধির তেল গ্রহণ করে, তা ধর্মীয় তত্ত্বাবধানের* মাধ্যমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করেন। মার্কো পলোকে দেখার পর তার সম্পর্কে জানতে চাইলে, জবাবে নিকলো পলো বলেন, “এ হলো আপনার সেবক, আর আমার ছেলে”; এর জবাবে গ্রেট খান বলেন, “ওকে স্বাগতম, এটা তো আমার জন্য খুব খুশির খবর” এবং এই বলে তিনি সেখানকার উপস্থিত

** ক্লিমেইনফু কুবলাই খানের গ্রীষ্মকালীন প্রিয় বাসস্থানে পরিণত হয়। এবং ১২৫৬ সালে এর নামকরণ করা হয় সানজটি বা আপার কোর্ট।

* পরে কুবলাই খান একনিষ্ঠ একজন বুদ্ধে পরিণত হয়েছিলেন এবং এতে করে তিনি অন্যের মতের প্রতি সহনশীলতা অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেন, আর তাই, কনফুসিয়াসের প্রতি সম্মান দেখাবার পরও, ১২৮১ সালের দিকে তিনি সমস্ত তাওবাদী সাহিত্যকর্ম পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। সেন্ট গিলেস, বাইয়োইরাথিক্যাল ডিকশনারি।

সবাইকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলেন। এরপর তিনি তাদের এই ফিরে আসা উপলক্ষে বিশাল ভোজের আয়োজন করেন, আর যত দিন পর্যন্ত মার্কো আর কথিত দুই ভাই কুবলাই খানের প্রাসাদে অবস্থান করেন, তারা খুব আনন্দের সঙ্গেই সেখানকার সব কিছু উপভোগ করতে থাকেন। এমনকি নিজ দেশের চাইতেও অধিক সম্মানের সঙ্গে তারা সেখানে বসবাস করতে থাকেন। তার প্রাসাদে মার্কো সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন এবং সম্মানের অধিকারী হতে সক্ষম হন।

খুব কম সময়ের মধ্যে সেসব কিছু শিখে-পড়ে, তাতারদের আচরণ আত্মস্থ করে নেয় এবং ভিন্ন ধরনের চারটি ভাষায় লেখা এবং পড়ার দক্ষতা অর্জন করে। তার এই প্রতিভা দেখে কুবলাই খান তাকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগের কথা ভেবে, তাকে খারাজান নামক শহরে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠান; রাজপ্রাসাদ থেকে শহরটা প্রায় ছ'মাসের পথ; সেখানে পৌঁছে অত্যন্ত মেধা আর প্রজ্ঞার সঙ্গে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, যাবতীয় কাজে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি নিজেও জানতে পারেন যে সেখানকার লোকেদের আচার-আচরণ আর রীতি-নীতির প্রতি তার সম্মানবোধের কথা শুনে গ্রেট কুবলাই খান নিজেও খুব আনন্দ পান। আর মনিবের কৌতূহল মেটাতে নিজ উদ্যোগে তিনি দূর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক বিদঘুটে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি যেখানেই যেতেন, যা কিছু দেখতেন বা শুনতেন তার সব কিছুই নিয়মিত টুকে রাখতেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেই টানা সতের বছর চাকরিকালীন, সে নিজেকে খুব যোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। সে জন্য তাকে নির্ভরতার সঙ্গে সাম্রাজ্যের সর্বত্র জরুরি কাজে পাঠানো হয়; এবং কখনো কখনো নিজ আগ্রহেও তিনি অনেক জায়গাতে ভ্রমণ করেন, কিন্তু সব সময়ই এর জন্য কুবলাই খান প্রশাসনের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মার্কো পলোর জন্য জ্ঞান আহরণ করা ছিল খুবই সহজ একটি কাজ, নিজ পর্যবেক্ষণ বা অন্যের মুখে শুনে তিনি বিশ্বের পূর্ব প্রান্ত সম্পর্কে এমন প্রচুর সব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যা তখনো পর্যন্ত ছিল একেবারেই অজানা। এবং যা কিছু সামনে আসত তার সবই তিনি খুব পরিশ্রমের সঙ্গে যত্ন করে নিয়মিত লিখে রাখতেন। আর এ কারণেই তিনি অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। যা রাজপ্রাসাদের অন্য সব অফিসারদের মনে হিংসার উদ্রেক করে।

৫

নিকলো, মাফিও গ্রেট খানকে কেমন করে তাদের বাড়ি ফেরার ইচ্ছের কথা জানালেন

আমাদের আলোচিত এই ভেনিসিয়ানেরা এরই মধ্যে অনেকগুলো বছর রাজপ্রাসাদে কাটিয়ে দিয়েছেন এবং এই সময়ের মাঝে তারা প্রচুর ধন-সম্পত্তি

আর মূল্যবান সব মণি-মাণিক্য আর সোনা-দানার মালিক বনে গেছেন, তখন তাদের মনে দেশের বাড়িতে বেড়িয়ে আসার গভীর ইচ্ছে জাগে, তা যতই তারা সম্মান আর স্বাধীনতা ভোগ করুক না কেন, তাদেরকে সেই আবেগ একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তত দিনে গ্রেট খানের অনেক বেশি বয়স হয়ে যায়, এই ভেবে তারা আরো বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েন, যদি তাদের সেই দেশ ছাড়ার আগেই গ্রেট খান কোনোভাবে মারা যান তাহলে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় তাদের জন্য দীর্ঘ যাত্রায় বের হওয়া অনেক কষ্টকর হবে, প্রচুর বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হতে হবে। অন্যদিকে তার জীবনকালে এ ধরনের যাত্রায় তারা তার আনুকূল্যে আর সমর্থন পাবে বলে আশা করে।

একদিন তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে আনন্দিত দেখতে পেয়ে, পরিস্থিতি বুঝে নিকোলো পলো সেই সুযোগটা কাজে লাগায়, নিজেকে তার পায়ে সঁপে দিয়ে অনুনয়-বিনয় করে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তার অনুমতি যাঞ্চা করে। কিন্তু সেই অনুরোধের কথা শুনে তিনি মনে আঘাত পান। এবং জীবনহানি হতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রার কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, সম্পদ আহরণই যদি তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করলে তাদের যা আছে তার দ্বিগুণ সম্পদ আর সম্মান তিনি তাদের দিতে প্রস্তুত রয়েছেন, কিন্তু এতে, মনে হয় এ কথা বলে তিনি তাদের বিরক্তই করেছেন, অবশ্যই আরো সুন্দরভাবে তাকে তাদের সেই আবেদন প্রত্যখ্যান করা উচিত ছিল।

সেই সময় একটা ঘটনা ঘটে, আরগন নামের ভারতের এক স্বাধীন রাজার স্ত্রী মারা যান, সেই রানির নাম বোলগানা। আর মারা যাবার আগে রাজাকে তিনি তার একটা শেষ ইচ্ছের কথা জানিয়ে যান, সেই ইচ্ছের কথা তিনি উইল করে লিখেও রেখে যান-স্বামীর প্রতি তিনি এই মিনতি করেন তার নিজ পরিবারের কেউ ব্যতীত অন্য কেউ কখনো তার স্থলাভিষিক্ত এবং তার ভালোবাসার অধিকারী হতে না পারে। আর তার সেই পরিবার তখন কুবলাই খানের রাজত্বে ক্যাথি নামের রাজ্যে বসবাস করছিল। স্ত্রীর সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ করার বাসনায় আরগন বেশ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীসহ গ্রেট কুবলাই খানের কাছে তিনজন দূত পাঠান। তাদের নাম উলাটাই, আপুসকা এবং গোজা। তারা কুবলাই খানের সঙ্গে দেখা করে তাদের রাজার মৃত রানির আত্মীয়দের অবিবাহিতা তরুণীদের মাঝ থেকে কাউকে রাজার স্ত্রী হিসেবে পাঠাবার অনুরোধ সংবলিত পত্র তার হাতে দেন। আবেদনটিকে সুবিবেচনায় নিয়ে সরাসরি সম্রাটের নির্দেশনা অনুসারে সেই পরিবার থেকে সতের বছরের এক তরুণীকে এর জন্য বাছাই করা হয়। মেয়েটি দেখতে ছিল খুবই সুন্দরী আর বুদ্ধিমতী, নাম খোগাতিন এবং দূতেরাও তাতে খুব করে সমর্থন জানায়। তাদের যাবার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হলে এবং রাজার ভাবী সঙ্গীর সম্মানে উপযোগী বেশ কিছু অনুচরের নিয়োগ দেবার পর, তারা গ্রেট

কুবলাই খানের কাছ থেকে সৌজন্যমূলক বিদায় গ্রহণ করে, যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই যাত্রা শুরু করে। আট মাস ভ্রমণের পর তাতার রাজন্যদের মধ্যকার যুদ্ধের কারণে তাদের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে ও যাত্রা ব্যাহত হয়, ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবারও তাদের কুবলাই খানের প্রাসাদে ফিরে যেতে হয় এবং ফিরে গিয়ে তারা তাকে তাদের পথের বাধার কথা জানান।

পুনরায় তাদের ফিরে আসার সময়ে, মার্কো পলো নিজের অধীনে কয়েকটা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে পূর্ব ভারত থেকে ফিরে আসে। এবং সেই সব দেশ সম্বন্ধে গ্রেট খানকে অবহিত করেন, ও সেই সমুদ্র পথটিকে নিরাপদ বলে জানান। এসব কথা সেই দূতেদের কানে আসে, যারা তখন নিজ দেশে ফেরা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন, তিন বছর হলো তারা দেশের বাইরে আছেন, তারা তখন এই ভেনিসের লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, যারা কি না তখন নিজেরাও বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছুক; এবং তারা আগে থেকেই আলোচনা করে ঠিক করে, তাদের তরুণী রানিসহ কথাটা খানের কানে তুলতে পারলে হয়তো তিনি তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন, যে মার্কো পলোর মতে, সমুদ্রপথে ফিরে গেলে তাদের জন্য অনেক সহজ হবে আর নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে এবং স্থলপথে ভ্রমণের চাইতে এতে অনুচর কম দরকার হবে, খরচও কম লাগবে ও অনেক কম সময়ে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হবে। কেননা কিছুদিন আগেই সে সেই পথে ঘুরে এসেছেন।

সম্রাট তাদের পরিবহনের বাছাইয়ের ধরন দেখে রাজি হবার সিদ্ধান্ত নেন, তারা তখন জাহাজ চালনায় দক্ষ সেই তিন ইউরোপিয়ানকে তাদের দেশে পৌঁছাবার আগ পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হিসেবে দিতে অনুরোধ করেন। অনীহা সত্ত্বেও গ্রেট কুবলাই খান তখন সেই ভেনিসের লোকদের সঙ্গে বিচ্ছেদের চূড়ান্ত বিরক্তিকর তাদের এই আবেদনের প্রতি সমর্থন দান করেন। তারপরও মনে হচ্ছিল যে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধে সহায়-সম্পত্তির সাহায্যে সমস্যাটার একটা সমাধান করতে না পেরেই এতে সমর্থন দিয়েছেন। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির গুরুত্ব আর অপরিহার্যতা অনুধাবন করে বাধ্য হয়ে এমনটা না করলে, কখনো তারা তার চাকরি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবার অনুমোদন পেতেন না।

যাই হোক, অবশেষে তিনি তাদের সেই অভিযানে পাঠান এবং দয়া আর মহানুভবতার সঙ্গে, তাদেরকে তার শুভকামনার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং তাদের কাছ থেকে এমন প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নেন যে পরিবারের সঙ্গে কিছু সময় ইউরোপে কাটাবার পর তারা যেন পুনরায় তাঁর কাছে ফেরত আসে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের হাতে দুইটি সোনালি ফলক প্রদান করেন। যাতে তাদের মুক্তির আর তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র তারা যেন তাদের এবং তাদের সঙ্গে থাকা অনুচরবৃন্দের জন্য প্রয়োজনীয় রসদপাতির সরবরাহসহ নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারেন এমন আদেশ লিপিবদ্ধ করে দেন। একইভাবে আগের মতোই তাদের

পোপ, ফরাসি এবং স্পেন রাজ ও অন্যান্য খ্রিস্টান রাজন্যদের বরাবর তার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূতের কর্তৃত্ব বহাল রাখেন।*

৬
গ্রেট খানকে ছেড়ে কীভাবে দু'ভাই নিজ দেশে ফিরে গেলেন

এরই মধ্যে চৌদ্দটা জাহাজে সজ্জিত করার মতো রসদপাতি আর যাবতীয় জিনিসপত্রের জোগাড়যন্ত্র সম্পন্ন হয়, এর প্রতিটা জাহাজে ছিল চারটি করে মাস্তুল, যা নয়টি করে পাল বহনে সক্ষম, সেই সব জাহাজের নির্মাণশৈলী আর পাল মাস্তুলের সজ্জারীতি সম্বন্ধেও বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এখানে সেসব বাদ দেয়া হয়েছে। এসব জাহাজের মধ্যে চার-পাঁচটিতে দেড়শ' থেকে দু'শ ষাট জনের মতো নাবিক ছিল। সেসবে চড়ে সেই অভিজনেরা, নিরাপত্তাসহকারে রানি, সেই সঙ্গে নিকোলো, মাফিও এবং মার্কো পলো যাত্রা করে। প্রথমেই পলোরা সম্রাটের কাছে থেকে বিদায় নেয়, সে সময় তিনি তাদের মহামূল্যবান অনেক মণি-মাণিক্য উপহার দেন। এবং ভবিষ্যতের জন্য জাহাজে অন্তত দু'বছরের মজুদ রাখার নির্দেশ দেন।

একটানা তিন মাস সমুদ্র যাত্রার পর, তারা দক্ষিণের জাভা নামক দ্বীপে এসে উপস্থিত হয়, সেখানে তারা খুব মনোযোগসহকারে বিভিন্ন জিনিস অবলোকন করেন। এই বইয়ের পরবর্তী অংশে প্রসঙ্গ অনুসারে তা তুলে ধরা হয়েছে। সেখান থেকে রাজা আরগনের এলাকায় পৌঁছাতে টানা আঠারো মাস তাদের সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়; এবং এ সময়ও তাদের নতুন আরো অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়। সেসবের বর্ণনাও প্রসঙ্গ অনুসারে এই বইতে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু এখানে যেটা উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত তা হলো, তাদের যাত্রা শুরু করার পর থেকে গন্তব্যে পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাদের নাবিকসহ মোট ছ'শ লোককে হারাতে হয়; আর যাত্রা শেষে সেই তিন অফিসারের মধ্যে গোজা নামের অভিজনই কেবল বেঁচে ছিলেন; অন্যদিকে সব নারী আর একজন মহিলা অনুচরের মাঝে কেবল একজন মৃত্যুবরণ করে।

জাহাজ থেকে নেমে তারা জানতে পারেন কিছুদিন আগে রাজা আরগন মারা গেছেন। এবং তার ছেলের নামে দেশের সব প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিয়াকাটু নামের সেই ছেলে তখনো যথেষ্ট তরুণ। সাবেক রাজার আদেশ অনুসারে তারা যে রাজতনয়াকে এনেছেন তাকে এখন কার কাছে হস্তান্তর করবে

---

* ইয়েলের অনুবাদে ফরাসি পাণ্ডুলিপিতে ইংল্যান্ডের রাজার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

সে ব্যাপারে তারা তার কাছ থেকে নির্দেশনা আশা করে। তার জবাব ছিল, যে তাদের এখন সেই নারীকে আরগনের ছেলে কাসানকে উপহার দেয়া উচিত, যিনি এখন পারস্যে সীমান্তে আরবর সেকো নামক জায়গাতে অবস্থান করছেন, সেখানে শত্রুর উপদ্রব ঠেকাতে তার নেতৃত্বে ষাট হাজার সৈন্য সমবেত করা হয়েছে।

সেখান থেকে তারা তাদের কাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং কার্যকরভাবে সেটা সম্পাদন করে কিয়াকাটুর প্রাসাদে ফিরে আসে, কেননা এরপর তাদের সেই একই পথে ফিরতে হবে। এখানে তারা নয় মাসের যাত্রা বিরতি করে। তাদের ফেরার সময় তিনি তাদের উৎকীর্ণ লিপি সংবলিত চারটে সোনালি ফলক প্রদান করেন, এর প্রতিটা দৈর্ঘ্যে এক কিউবিট বা বাইশ ইঞ্চি আর প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি, আর তিন-চার মার্ক ওজনের। তাদের সেই ফলকের খোদাই কর্ম গ্রেট কুবলাই খানের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে শুরু করা হয়, যাতে তার নাম দীর্ঘদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে উচ্চকিত থাকে এবং যারা সেই উর্ধ্বতনের হুকুম মানতে অনীহা প্রকাশ করেন তাদের সবাইকে যেন জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ডে অভিযুক্ত করে ভালোত্বের বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এরপর এই তিনজন দূত তার প্রতিনিধি হিসেবে, তার শাসিত এলাকায় এমন সম্মান ভোগ করেন, যে রাষ্ট্রে তাদের সব খরচাদি বহন করে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা-সহচরসহ তাদের ভ্রমণ করতে দেয়া হয়। রাজার সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় এবং অনেক জায়গাতে তারা দু'শ অশ্বারোহী সৈন্যের পাহারা ভোগ করে; এমন নয় যে কিয়াকাটুর সরকার অজনপ্রিয়, আর জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অপমান করতে পারে বলে সেসব এড়াতে এসব করা হয়; সার্বভৌম সরকারের অধীনে শাসিত জনগণের কেউই সেটা করতে সাহস করত না। যাত্রা পথেই আমাদের পর্যটকেরা খবর পান যে গ্রেট কুবলাই খান মৃত্যুবরণ করেছে; তাতে করে সেখানে তাদের ফিরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনাই রুদ্ধ হয়ে যায়। বাস্তবতা অনুধাবন করে, এরপর তারা তাদের মনস্থ করা পথে অগ্রসর হয়ে, অবশেষে তারা টেরিবিজন্ড শহরে এসে পৌঁছে, সেখান থেকে তারা কনস্টান্টিনোপলের দিকে গমন করে, এরপর যান নিগ্রোপন্ট এবং অবশেষে ১২৯৫ সালে তারা ভেনিসে এসে উপস্থিত হন, সেখানে এসে তারা তাদের ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং সুপ্রচুর ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন।

এই উপলক্ষে তারা স্রষ্টার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, অসংখ্য বিপর্যয় পেরিয়ে আসার পর, এত দিনে তারা তাদের সেই ভয়াবহ ক্লান্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেলেন। আগের সব বর্ণনাগুলোকে এই বইয়ের একটা প্রাথমিক অধ্যায় হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। যার উদ্দেশ্য আসলে দীর্ঘদিন বিশ্বের পূর্ব প্রান্তের আবাসস্থলে অবস্থান করে মার্কো পলো যা কিছুর বর্ণনা দিয়ে গেছেন তার সেই জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সম্বন্ধে পাঠকদের পরিচিত করে তোলা।

অধ্যায়-১

আর্মেনিয়া মাইনর থেকে কুবলাই খানের শাঙ্গুর প্রাসাদে যাবার পথে যা যা দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন তার বিবরণ

১

আর্মেনিয়া মাইনর, লেসিসাস বন্দর আর প্রদেশের সীমানা

শুরুতেই, মার্কো পলো যেসব দেশ ঘুরে দেখেছিলেন এবং সেখানে মূল্যবান যা যা শুনেছিলেন আর দেখেছিলেন সেসবের বর্ণনা তুলে ধরার আগে, বলে রাখা ভালো, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে আমাদের সবাইকে ক্ষুদ্রতর আর বৃহৎ আর্মেনিয়াকে আলাদা করে চিনতে শিখতে হবে। ক্ষুদ্রতর আর্মেনিয়ার রাজা থাকতেন সেবাসটোজ শহরে এবং তিনি সুস্পষ্ট শক্ত আইন দ্বারা দেশ শাসন করতেন, সেখানে অসংখ্য শহর, দুর্গ, আর প্রাসাদ ছিল, আরাম-আয়েশ আর জীবনধারণের জন্য সব জিনিসই সেখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। পশু আর পাখির খেলাও ছিল প্রচুর। বলে রাখা ভালো, দেশটির বাতাস স্বাস্থ্যের খুব একটা উপকারী ছিল না। অতীতে জায়গাটা এর বিজ্ঞ আর আর সাহসী সৈনিকের জন্য বিখ্যাত ছিল কিন্তু বর্তমানে সেখানকার লোকেরা বেশিরভাগই পানাসক্ত, নিচু মনের আর অকাজের হয়ে উঠেছে।

সেখানকার উপকূলীয় সমুদ্র শহরের নাম লেসিসাস, যোগাযোগ আর যাতায়াতের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা এটি। এর বন্দরে ভেনিস, জেনোয়া এবং অন্যান্য আরো অনেক জায়গার বণিকদের নিয়মিত যাতায়াত। মসলা, বিভিন্ন ধরনের মাদক, সিল্ক আর উলের তৈরি নানা ধরনের জিনিসপত্রসহ আরো অনেক মূল্যবান পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা করাই ছিল সেই সব বণিকদের মূল ব্যবসা। যারাই পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা করত তাদের সবাইকে প্রথমে লেসিসাস বন্দর হয়ে অগ্রসর হতে হতো। তখনকার আর্মেনিয়া মাইনরের সীমানা হলো, দক্ষিণে বিবাদকারীদের দখলে থাকা প্রতিশ্রুত ভূমি; উত্তরে তুর্কি অধ্যুষিত কারামেনিয়া; উত্তর-পূর্ব দিকে কাইসারিয়াহ, সেভাসটাসহ তাতারদের অধিকৃত আরো অনেক এলাকা; এবং পশ্চিমে এটি সাগর দিয়ে ঘেরা, যা খ্রিস্টান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।

২

তুর্কমেনিয়া প্রদেশের শহর কগনি, কাইসারিয়া এবং সেভাসটা আর সেখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য

তুর্কমেনিয়ার বসবাসকারীরা ছিল তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যেসব তুর্কমেন মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করত আর তার আইন অনুসরণ করত তারা ছিল খুবই রূঢ়, আর বুদ্ধির দিক দিয়েও খাটো। তারা পাহাড় আর যেখানে পশু চড়ানো সহজ ও অনুপ্রবেশ সাধারণত খুব সহজ ছিল না এমন সব দুর্গম অঞ্চলে বসবাস করত, কেননা এরা পুরোপুরি তাদের গবাদিপশুর উপর নির্ভরশীল ছিল। এখানে চমৎকার একধরনের ঘোড়া পাওয়া যেত তুর্কিদের কাছে যা ছিল খুবই প্রিয়, এখানকার খাঁটি খচ্চরগুলোও চড়া মূল্যে বিক্রি হতো। বাকি লোকেরা ছিল গ্রিক আর আর্মেনীয়, এরা শহর আর প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্যের আর নানা ধরনের পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বিশ্বের সবচাইতে উন্নত আর মিহি কার্পেট এবং গাঢ় লালসহ নানা ধরনের রং-বেরঙের সিল্ক এখানে উৎপাদিত হতো। এখানকার কগনি, কাইসারিয়া এবং সেভাসটা নামের তিনটি শহরের মাঝে শেষেরটিতে সন্ত ব্লাইজ আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এর সবই প্রাচ্যের তাতার সম্রাট গ্রেট খানের অধীনস্ত, তিনিই এখানকার শাসকদের নিয়োগ দেন। এবার বৃহত্তর আর্মেনিয়া প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক।

৩

বৃহত্তর আর্মেনিয়া যেখানে রয়েছে আর্জিনগান, আর্জিরন ও ডার্জিজ শহর এবং নূহের নৌকা নোঙর করা সেই পাহাড় আর খনিজ তেলের বিখ্যাত ঝরনা

আর্মেনিয়া মেজর বিশাল একটা প্রদেশ, এর প্রবেশপথেই আর্জিনগান শহর, এখানে বোম্বাজাইন নামের মিহি সুতি কাপড় উৎপাদিত হয়, এছাড়াও এখানে আরো অনেক প্রকারের অবাক করা কাপড় তৈরি হয়, এখানে এর সবগুলোর নাম উল্লেখ করতে গেলে পাঠকের মনে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। এখানে মাটি থেকে উৎসারিত উষ্ণ জলের এমন চমৎকার গোসলের ব্যবস্থা রয়েছে যা সচরাচর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এখানকার অধিবাসীদের বেশিরভাগই স্থানীয় আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত, তবে অঞ্চলটা তাতার শাসিত। এই প্রদেশে অনেক শহর রয়েছে, তবে সেগুলোর মধ্যে আর্জিনগানই প্রধান এবং প্রদেশের প্রধান ধর্মযাজকও এখানেই থাকেন; এবং এর পরই গুরুত্ব অনুসারে আর্জিরন ও ডার্জিজের অবস্থান। জায়গাটা খুবই বিস্তৃত এবং পর্যাপ্ত তৃণভূমি থাকায়, গ্রীষ্মকালে পূর্ব তাতার সেনাদের একটি অংশ পশু-চড়াতে চারণ উপযোগী এই জায়গাটিতে আসে; কিন্তু শীত আসার আগেই তারা এখান থেকে তাদের ছাউনি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়, সে সময় জায়গাটিতে তুষারপাতের পরিমাণ এতই গভীর হয় যে তখন

এখানকার পথঘাট আর ঘোড়া চড়াবার মতো উপযোগী থাকে না, আর তাই উষ্ণতা আর বিচালির খোঁজে তখন তারা দক্ষিণে অগ্রসর হয়। টেরিবিজন্ড থেকে তাউরিস যাবার পথে যেখানে পাইপুর্থ নামের প্রাসাদের দেখা মিলবে, সেই জায়গাটা রুপার খনিতে সমৃদ্ধ।

আর্মেনিয়ার মাঝের অংশে প্রকাণ্ড উঁচু একটি পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়, কথিত আছে, এখানেই নূহের তরী এসে ভিড়েছিল, আর সে কারণেই একে মাউন্টেই অব আর্ক* নামে অভিহিত করা হয়। এর পাদদেশের চারদিকে দু'দিনের কমে ঘুরে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। এর শৃঙ্গে সব সময় বরফ জমে থাকে বিধায় এতে আরোহণের কথা কল্পনাই করা যায় না, আর এই বরফ কখনো গলে না, বরং প্রতি শীতে এর পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নিচে, একেবারে সমতলের কাছাকাছি জায়গাতে গলনের মাধ্যমে সেখানকার ভূমি অনেক উর্বরা হয়ে উঠেছে, আর এ কারণে সেখানে গাছপালার আধিক্য লক্ষ করার মতো, আর তাই প্রতি গ্রীষ্মে এই অবিরাম সরবরাহের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় প্রতিবেশী দেশসমূহের সমস্ত গবাদিপশুপাল জায়গাটিতে এনে জড়ো করা হয়।

আর্মেনিয়া সীমান্তের, দক্ষিণ-পশ্চিমে, মগুল এবং মারেডিন জেলা, এখানে একটু পরেই এর বর্ণনা দেয়া হবে, সেই সঙ্গে অসংখ্য জিনিসের মাঝে সবার নজর কাড়তে সক্ষম এমন বিশেষ বিশেষ আরো অনেক জিনিসের কথা তুলে ধরা হবে। উত্তর দিকে জর্জিনিয়া, সেখানকার সীমান্তের ঠিক কাছাকাছি তেলের একটি ঝরনা রয়েছে, সেটা থেকে এত বেশি পরিমাণে নিঃসরণ হয় যে তা বহন করে নিয়ে যেতে অনেক অনেক উটের দরকার পড়বে। এই তেল খাবারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না গেলেও, মানুষ এবং গবাদিপশুর ত্বকের ব্যাধিসহ অন্যান্য অসুখ সারিয়ে তুলতে তা খুবই জরুরি; আর জ্বালানি হিসেবেও এটি খুব ভালো। প্রতিবেশী দেশগুলোর কেউই সনাতন প্রদীপ ব্যবহার করে না, দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা এই তেল সংগ্রহ করতে আসে।*

৪

জর্জিয়ানা প্রদেশ আর তার প্রাচীর যার নির্গমন পথে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট লৌহ ফটক নির্মাণ করেছিলেন এবং টিফেলিসের এক ঝরনায় যাওয়ার বিস্ময়কর কাহিনি

জর্জিয়ানার রাজা সাধারণত ডেভিড মেলিক তথা আমাদের ভাষায় রাজা দাউদ-এর নামে অভিহিত হন*। দেশেটির একটি অংশ তাতারদের অধিকারে এবং দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে এর অপর অংশ স্থানীয় রাজন্যের অধিকারেই থেকে গেছে। এটি দু'টি সাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত, যার উত্তর [পশ্চিম] অংশ গ্রেটার সি

---

* আরারাত বাই এর উচ্চতা ১৬৯৫৩ ফুট এবং যু ১১২৯ সালে প্রথম এতে আরোহন করেন।

[ইউজিন] এবং অপর পূর্ব অংশকে আবাকি [কাস্পিয়ান] নামে ডাকা হয়। এটি দু'হাজার আট শত মাইল বৃত্তাকার অংশ দখল করে আছে এবং আচরণে অনেকটা হ্রদের মতন, এর সঙ্গে অন্য কোনো সমুদ্রের সংযোগ নেই। এর বেশ কয়েকটা দ্বীপ রয়েছে, সেসব দ্বীপে নয়নাভিরাম অনেক শহর আর প্রাসাদও আছে, যার কোনো কোনোটাতে তাতার সম্রাটের কবল থেকে পালিয়ে আসা অনেকেই বসবাস করছে, যখন তিনি পশ্চিমে সাম্রাজ্য বিস্তৃত বা পারস্য প্রদেশ অধিকার করেন, তখন অনেকেই নিরাপত্তার আশায় এসব দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয় বা পার্বত্য এলাকার দুর্গমতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। এসবের কিছু কিছু দ্বীপ আবার একেবারেই অননুশীলিত। এই সাগরে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়, বিশেষ করে এখানকার নদীমুখে মার্সিন আর স্যালমন মাছসহ অন্যান্য আরো অনেক ধরনের মাছ ধরা পড়ে। দেশটিতে সচরাচর বক্সট্রি নামের একধরনের গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয়। আমি শুনেছি প্রাচীনকালে দেশটির রাজারা ডান কাঁধে ঈগলের চিহ্ন নিয়ে জন্মাতেন। এখানকার লোকেরা খুবই করিৎকর্মা, তারা সাহসী সৈনিক, দক্ষ তীরন্দাজ এবং যুদ্ধের ময়দানের ন্যায় যোদ্ধা। ধর্মে তারা খ্রিস্টান, গ্রিক চার্চের আচারবিধি পালন করে এবং পশ্চিমা যাজকদের মতো ছোট ছোট করে চুল ছেঁটে রাখে।

এই প্রদেশের মাঝ দিয়ে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন উত্তরে অগ্রসর হবার পদক্ষেপ নিতে গেলে একটি সরু আর দুর্গম গিরিপথের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হন, যার এক পাশ ছিল সাগরবিধৌত, অন্যদিকে ছিল উঁচু পাহাড় আর বন দিয়ে ঘেরা, পথটি ছিল টানা চার মাইল দৈর্ঘ্যের; আর এ কারণেই সেখানকার গুটি কতক লোক সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। সব প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে সেই গিরিপথের প্রবেশদ্বারে বিশাল একটা দেয়াল নির্মাণ করেন এবং তোরণ দ্বারা একে আরো দৃঢ় করে তোলেন, যাতে করে তাকে নিগ্রহকারী সেখানকার অধিবাসীদের সহজেই দমন করা যায়। গিরিপথে অসাধারণ দৃঢ়তার কারণে এর নামকরণ করা হয় আয়রন গেট তথা লৌহ ফটক। লোকমুখে প্রচলিত আছে, এর সাহায্যে আলেকজান্ডার তাতারদের দুই পর্বতের মাঝখানে বন্দি করে ফেলেছিলেন। তবে কথাটা মোটেই সত্য নয়, কেননা যাদেরকে তাতার নামে অভিহিত করা হয় তখন তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না, অন্যান্য আরো অনেক জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণে সৃষ্ট সেই জাতির নাম ছিল কুমানি। এই প্রদেশে ছিল অনেক শহর আর প্রাসাদ; জীবনধারণের বিভিন্ন উপাদানের প্রাচুর্যও ছিল জায়গাটিতে; দেশটিতে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হতো এবং সোনার মিশ্রণে সেখানে রেশমের কাপড় বোনা হতো। এখানে বিশালাকৃতির শকুনের দেখা মিলত, সেই প্রজাতিটির নাম ছিল এভিগি। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য আর শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। প্রকৃতিগতভাবে পাহাড়ে ঘেরা, আর সরু গিরিসঙ্কটের মাঝে অবস্থানের কারণে, দেশটিকে তাতাররা কখনো পুরোপুরি তাদের নিজেদের অধিকারে নিতে পারেনি।

সন্ত লুনার্দো প্রতি অনুগত সংসারত্যাগী এক সন্ন্যাসীদের আবাস থেকে সেই বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা জানতে পারা যায়। লবণ হ্রদ থেকে চার দিনের দূরত্বে একেবারে সীমান্তের কাছাকাছি চার্চটা অবস্থিত, চল্লিশ দিনের বাৎসরিক উপবাসের প্রথম দিন ছাড়া কখনো এখানে মাছের দেখা পাওয়া যায় না এবং ইস্টারের আগের দিন সেখানে প্রচুর মাছ খাওয়া হয়, কিন্তু ইস্টারের পর থেকে বছরের বাকি দিনগুলোতে সেখানে মাছের দেখা মেলে না। এই হ্রদের নাম গেলু-চালাট। ভূমিকাতে এর আগেই পাহাড় ঘেরা আবাকু সাগরের কথা বলা হয়েছে, এই সাগরে হারদিল, গেইহন, কুর এবং আরাজসহ আরো অনেক বড় নদী এসে মিশেছে। সম্প্রতি জেনসের বণিকেরা এর মাঝ দিয়ে নৌ চালনা শুরু করেছে এবং সেখান থেকে তারা ঘেল্লি নামের রেশম নিতে আসছে। এই প্রদেশে টেফলিশ নামের একটি সুরম্য শহর রয়েছে, যার চারপাশ ঘিরে অনেক উপশহর আর দুর্গ গড়ে উঠেছে। এখানকার অধিবাসীদের বেশিরভাগই আর্মেনীয় এবং জর্জীয় খ্রিস্টান, সেই সঙ্গে মুসলমান ও ইহুদিও রয়েছে; তবে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এখান থেকে উৎপাদিত রেশমসহ আরো অনেক পণ্য দেশ-বিদেশে নানা জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার অধিবাসীরা তাতার সম্রাটের অধীন। যদিও আমরা কেবল প্রদেশের প্রধান কিছু শহরের কথাই বলছি, তবে এটাও বুঝে নিতে হবে, এর বাইরেও এমন অরো অনেক জায়গার অস্তিত্ব রয়েছে, বিশেষ কিছু না থাকলে আলাদা করে যার উল্লেখ অবান্তর; কিন্তু সেসব জায়গারও এমন সব ঘটনা রয়েছে যা একটু পরেই এখানে তুলে ধরা হবে। আর্মেনিয়ার উত্তরের দেশগুলোর বর্ণনা দেবার পর এবার আমরা এর দক্ষিণ আর পুবের কথা বলব।*

৫

মশুল প্রদেশের বিভিন্ন অধিবাসীসহ কুর্দিদের কথা এবং দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্য

মশুল বিশাল একটা প্রদেশ, এখানে বিভিন্ন ধরনের লোকেদের বাস, এখানকার একটা গোষ্ঠী মুহাম্মদের অনুসারী, এরা আরবীয় নামে পরিচিত। অন্যেরা খ্রিস্টান ধর্মে বিশ্বাসী, কিন্তু গির্জার অনুশাসনের অধীন নয়, বিভিন্ন ঘটনায় তারা তা ত্যাগ করে, এখন নেস্টরিয়ান, জেকোবাইট এবং আর্মেনিয়ান হিসেবে অভিহিত। তাদের একজন প্রধান পুরোহিত রয়েছেন, তাকে তারা জেকলিট নামে ডাকে এবং তিনিই প্রধান ধর্মযাজক, যাজক এবং মঠাধ্যক্ষদের নিয়োগ দেন এবং রোমের পোপ যেভাবে ল্যাটিন দেশসমূহে তার লোক পাঠান ঠিক সেভাবে তিনিও ভারতের সর্বত্র, বুদাস, অথবা ক্যাথিতে তাদের প্রেরণ করেন।

---

* ১৮০১ সালে জর্জিয়া রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় কিন্তু তারপরও সেখানকার রাজবংশের সাতজন রাজপুত্রকে ডেভিড নামেই অভিহিত করা হয়।

আমরা যাকে মসলিন বলে চিনি, মশুলিনি নামে পরিচিত, বিশেষ ধরনের সেই কাপড়, মসলা আর মাদকের বিশাল বিশাল চালান এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া বড় বড় ব্যবসায়ীরা মশুলে উৎপাদিত সোনা আর রেশমের সেই কাপড় এই প্রদেশ থেকেই সংগ্রহ করেন।

এখানকার পাহাড়ি এলাকায় কুর্দি নামের এক জাতির বাস, তাদের কিছু খ্রিস্টান এবং অন্যেরা মুসলমান। এদের সবাই বিবেক-বর্জিত অসৎ লোক, বণিকদের কাছ থেকে লুটে নেয়াই এদের পেশা। এই প্রদেশের কাছাকাছি মুস এবং মারেদিন নামক জায়গা রয়েছে, যেখানকার লোকেরা বোক্কাসিনি নামের কাপড়সহ আরো অনেক ধরনের বস্ত্র বয়ন করে। এখানকার অধিবাসীরা পণ্যোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সবাই তাতার রাজের অধীন। এবার আমরা বাউদাস নিয়ে আলাপ করব।

৬
প্রাচীনকালের ব্যাবিলন, সেই বিস্ময়কর শহর বাউদাসের বিজ্ঞানচর্চা আর তা কেমন করে এলো

বাউদাস (বাগদাদ) একটি বিশাল শহর, এখানেই খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের প্রধান বিশপের বাস, সমগ্র খ্রিস্টানদের কাছে তিনি পোপের মতো। শহরের মাঝ দিয়ে বিশাল এক নদী বয়ে গেছে, এ পথ ধরেই বণিকেরা ভারত মহাসাগর থেকে পণ্য আনা-নেয়া করে, বাতাস অনুকূলে থাকলে নৌপথে প্রায় সাত দিনের দূরত্ব। এ ধরনের জলযাত্রায় যারা অংশ নেন, নদী পেরিয়ে প্রথমেই তারা কিসি নামক একটি জায়গাতে পৌঁছান, সেখান থেকে তারা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হনঃ কিন্তু এখানে আসার আগে তাদের বালসারা নামের শহর পেরিয়ে আসতে হয়, জায়গাটিতে বিশ্বের সবচাইতে উন্নত ধরনের খেজুর উৎপাদিত হয়।

বাউদাসে সোনার মিশ্রণে একধরনের রেশম তৈরি হয়, দামাস্কাসেও, সেই সঙ্গে উৎপন্ন হয় নানা ধরনের পশুপাখির নকশা শোভিত মখমল। ভারত থেকে ইউরোপে যেসকল মুক্তা যায় তার প্রায় সবই এখান থেকে প্রক্রিয়াজাত করা। এখানে মুহাম্মদের রীতি-নীতি নিয়মিত চর্চা করাসহ, জাদুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, মাটির বিন্যাস আর মুখের আদল দেখে ভবিষ্যৎ বলার বিদ্যাও অনুশীলন করা হয়। বিশ্বের যেকোনো শহরের চাইতে এটি উন্নত আর সবচাইতে বৃহত্তর শহর।

এর খলিফা, যিনি মনে করতেন নিজের ধনভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত সম্পদের সমপরিমাণ আর কোনো সার্বভৌম রাজার নেই, নিচে তার করুণ পরিণতির কথাই তুলে ধরা হয়েছে। তাতার রাজপুত্রদের চার ভাই যখন সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতে শুরু করেন, তাদের বড়ভাই মাঙ্গু তখন পরিবারে আধিপত্য করছিলেন। ক্যাথি ও

দেশটির পার্শ্ববর্তী এলাকার জলাসমূহ পদানত করেও তারা সন্তুষ্ট হয়নি, আরো এলাকা দখলের লালসা তাদের পেয়ে বসায় তারা সার্বজনীন সাম্রাজ্যের ধারণা কল্পনা করে নেয় এবং নিজেদের মাঝে বিশ্বটাকে ভাগ করে নেবার কথা ভাবে। এই উদ্দেশ্যে, তাদের একজন পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়, অন্যজন দক্ষিণের রাজ্যসমূহ জয় করার আশায় এগিয়ে যান এবং অন্য দু'জন বাকি দু'দিকে যাত্রা করে।

দক্ষিণের বেশিরভাগ এলাকা আলাউ-এর কর্তৃত্বে আসে, সে বিশাল এক সেনাবাহিনী সমবেত করে, যাত্রাপথের বেশিরভাগ প্রদেশ বশীভূত করে, ১২৫৫ সালে বাউদাসের দিকে অগ্রসর হন। তবে তিনি এর ক্ষমতাধর আর বুদ্ধিমান অধিবাসীদের সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন, শক্তি প্রয়োগের বদলে তিনি তাই কৌশলের আশ্রয় নেয়াকেই শ্রেয় বলে মনে করেন, আর তাই শত্রুকে ফাঁকি দেবার জন্য তিনি তার এক লাখ অশ্বারোহীসহ বিশাল পদাতিক বাহিনীর, ছোট্ট একটি দলকে একদিকে অপেক্ষায় রেখে অন্য একটি অংশকে শহরের কাছাকাছি বনের দিকে লুকিয়ে রাখেন এবং তৃতীয় দলটি নিয়ে তিনি নিজে সোজাসুজি শহরের সদর দরজার একেবারে কাছে চলে যান। শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের একেবারে শেষ করে দিতে খলিফা মুহাম্মদি জোসে সৈন্যসমেত তাদেরকে ত্বরিত আক্রমণ করতে শহরের সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আলাউ তার উপস্থিতি টের পেয়ে শীঘ্র বনের দিকে পশ্চাৎপসরণ করতে শুরু করেন, যেখানে আগে থেকেই তার সেনা দলের একটি ডিভিশনকে সতর্ক অবস্থায় মোতায়েন করা ছিল। এর কাছাকাছি আসার পর পরই উভয় দিক থেকে খলিফার সৈন্যদের ঘেরাও করে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় সবাইকে হত্যা করা হয় এবং খলিফাকে বন্দি করা হয়। শহরের ভেতরে প্রবেশ করার পর এর স্বর্ণ তোরণ দেখে আলাউ প্রচণ্ড বিস্মিত হন। তিনি খলিফাকে তার সম্মুখে আনার নির্দেশ দেন। এবং সামনে আনার পর তিনি জানান সম্পদের প্রতি প্রচণ্ড লোভের কারণেই তিনি বহু দিন ধরে তার ঝুঁকিপূর্ণ রাজধানীর ক্ষমতাধর অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সেনাবাহিনী গঠনের কোনো ব্যবস্থা নেননি, তাই সেই তোরণের মধ্যেই তাকে কোনো প্রকার খাবার-দাবার না দিয়ে বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন; এবং এখানেই, তার সব সহায়-সম্পত্তির মাঝেই তিনি অত্যন্ত করুণ মৃত্যুবরণ করেন।

৭
কেন বাউদাসের খলিফা তার দেশের সব খ্রিস্টানদের হত্যা করার পরামর্শ গ্রহণ করেন

আমার মনে হয় আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের প্রতি মোক্ষম প্রতিশোধের মাধ্যম হিসেবে তার বিশ্বাসী খ্রিস্টানদের ওপর অবিচার করাকেই এখানে একমাত্র

হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, খলিফা তাই তাদের ঘৃণার চোখে দেখতেন। ১২২৫ সালে সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই, প্রতিদিনই তিনি রাজ্যের সবাইকে তার ধর্মে ধর্মান্তরিত করাবার কথা ভাবতেন, অথবা এতে রাজি না হলে তাদের হত্যা করার ভয় দেখাবার কথা ভাবতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তার বিজ্ঞ পরামর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন, তারা নতুন নিয়মের বাইবেলের একটি লাইন আবিষ্কার করেন, যেখানে বলা আছে : "তোমাদের মনে যদি সরিষা দানা পরিমাণ বিশ্বাস থেকে থাকে, তাহলে তোমরা যদি এই পাহাড়কে বলো, এখান থেকে সরে যাও, তাহলে সেটা সেখান থেকে সরে যাবে" এবং ব্যাপারটা ওদের জন্য একেবারেই অসম্ভব হবে এটা বুঝতে পেরে এই আবিষ্কারে তিনি খুবই আনন্দিত হয়ে, বাগদাদের বিশালসংখ্যক নেস্টরিয়ান, জেকোবাইট খ্রিস্টানদের একত্রে জড়ো হবার নির্দেশ প্রদান করেন।

তাদের প্রতি তিনি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, তারা কি তাদের বাইবেলে লেখা সব কথা বিশ্বাস করে, নাকি করে না? তারা এর সব কিছুকে সত্য বলে দাবি করে। "তাহলে", খলিফা বলেন, "এটা যদি সত্যই হয়, তাহলে তোমাদের এই বিশ্বাসের সপক্ষে আমাদের সামনে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, তোমাদের মাঝে কারো যদি সরিষা পরিমাণও বিশ্বাস অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তাকে প্রতারক, ধর্মত্যাগী, অবিশ্বাসী লোক হিসেবে গণ্য করা হবে। তোমরা যার পূজা করো তার ক্ষমতা ব্যবহার করে সামনের এই পাহাড়টাকে সরাতে আমি তোমাদের দশ দিন সময় দিচ্ছি, অন্যথায় আমাদের নবির আইন মেনে নিতে হবে। কেবল তাহলেই তোমরা নিরাপদ থাকতে পারবে, নতুবা তোমাদের সবাইকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।"

৮
খলিফার কথা শুনে খ্রিস্টানেরা কতটা হতাশ হয়

খ্রিস্টানেরা তার নির্মমতা সম্বন্ধে পরিচিত ছিল, একইভাবে সব সহায়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করার আগ্রহের সম্পর্কেও তারা জানত, তাই তার মুখে এমন কথা শুনে তারা শিউরে উঠে জীবন বাঁচাতে চিন্তিত হয়ে পড়ে, তবু ত্রাতার প্রতি আস্থা অটুট থাকায় তারা ভাবে, তিনি হয়তো কোনোভাবে এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে তাদের রক্ষা করবেন, এই উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে সুচিন্তিতভাবে তারা এর মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐশ্বরিক সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষেই সেটা সম্ভব নয়, তাই তারা সর্বময়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে ছোট-বড় সবাই দিন-রাত অবিরাম অঝোরে চোখের জল ফেলতে শুরু করে এবং সর্বময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে। অবশেষে

অষ্টম দিনে একজন যাজক স্বপ্নে দেখেন— তার নাম জানা যায়নি, তাদের মাঝে এক চোখ অন্ধ এমন কোনো লোকেই কেবল মহান প্রভুর করুণায় সেটাকে সরতে আদেশ করতে পারে।

৯
এক চোখ অন্ধ মুচি খ্রিস্টানদের জন্য কীভাবে প্রার্থনা করে

একচোখা সেই মুচিকে খুঁজে বের করার পর তাকে সেই গুপ্ত-তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করা হয়, জবাবে সে জানায় এমন কাজ করার জন্য সে নিজেকে যোগ্য বলে মনে করে না, তার বুদ্ধিতে আসে না কি করে সে এমন করুণায় পুরস্কৃত হতে পারে। তবু, ভীতসন্ত্রস্ত খ্রিস্টানদের অবস্থা বিবেচনা করে সে তাতে রাজি হয়ে যায়। বুঝতে হবে লোকটা আসলে খুবই নীতিবান আর ধার্মিক, তার মন খুবই খাঁটি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী, নিয়মিত সে ধর্মীয় তীর্থসহ অন্যান্য পুণ্যস্থানে যাতায়াত করে, দান-ধ্যান আর উপোস করে।

একবার এক সুন্দরী মহিলা তার দোকানে আসে একজোড়া পাদুকা ঠিক করাবার জন্য, পা দেখাবার সময় হঠাৎ পায়ের আরো অংশ বেরিয়ে আসে, এতে করে সেই সৌন্দর্য দেখার পর মুহূর্তে তার মনে পাপ চিন্তা ভর করে। সে তখন বাইবেলের একটা ছত্র স্মরণ করে, যেখানে বলা হয়েছে, "যদি তোমার চোখ তোমাকে পাপ দ্বারা আক্রান্ত করে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেখান থেকে উৎপাটন করে ফেলে দিবে, কেননা দুই চক্ষু নিয়ে দোজখের আগুনে দগ্ধ হওয়ার চাইতে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ উত্তম", এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাতের কাছে থাকা তার কাজের একটা যন্ত্র নিয়ে নিজের ডান চোখটা তুলে ফেলে। এটুকুন থেকেই তার বিশ্বাসের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব।

দেখতে দেখতে ধার্য করা দিন আসে, দিনের শুরুতেই প্রার্থনা সারা হয় এবং পবিত্র ক্রুশ সামনে রেখে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হয়। একইভাবে খলিফাও তাদের ব্যর্থ হবার পর খ্রিস্টানদের ভুল প্রমাণ করার পর সবাইকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য অসংখ্য প্রহরীসহ সেখানে উপস্থিত থাকেন।

১০
কীভাবে একচোখা মুচির কথায় পাহাড় সরে গিয়েছিল

পাহাড়ের পাদদেশে এসে সেই ধার্মিক কারিগর, ক্রুশের সামনে প্রণত হয়ে, স্বর্গের দিকে হস্তদ্বয় উত্তোলন করে, নম্রভাবে তার স্রষ্টার প্রতি সনির্বন্ধ প্রার্থনা শুরু করেন, যেন তিনি দয়ালু দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তার নামের মহিমা

আর শ্রেষ্ঠত্বের গুণে, একই সঙ্গে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সমর্থন আর প্রমাণে, তিনি যেন তার লোকেদের সহায়তা প্রদান করেন, তাদের যে কাজ করতে বলা হয়েছে তারা যেন সেটা সম্পন্ন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে তারা যেন তার নিয়মের প্রতি শাপদানকারীকে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। প্রার্থনা শেষে, তীব্র স্বরে চিৎকার করে কেঁদে সে বলতে শুরু করে : "পিতা, পুত্র আর পবিত্র আত্মার নামে, হে পাহাড় আমি তোকে আদেশ করছি, আপনা থেকে সরে যা!"

শব্দগুলো উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, পাহাড়টা নড়তে শুরু করে এবং একই সময়ে চারপাশের মাটিও বিস্ময়কর আর প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে। খলিফাসহ তাকে ঘিরে থাকা সবাই তখন ভয়ে হতভম্ব হয়ে নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর অনেকেই খ্রিস্টান হয়ে যান, এমনকি খলিফা নিজেও গোপনে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, সব সময় গোপনে পোশাকের নিচে ক্রুশ পরতে শুরু করে, মৃত্যুর পর যা তার সঙ্গে পাওয়া যায়; এবং এজন্যই পূর্বসূরিদের মতো তাকে সমাধিস্থ করা হয়নি। ঈশ্বরের সেই অনন্য করুণার কথা স্মরণীয় করে রাখতে, সেদিন থেকে সমস্ত নেস্টরিয়ান আর জেকবাইট খ্রিস্টানেরা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে অলৌকিক ঘটনার সেই দিনটি উপবাসসহকারে রাত্রিজাগরণসহ উদ্‌যাপন করে আসছে।

১১
ইরাকের অভিজাত শহর তাউরিস আর এর ব্যবসা-বাণিজ্য

তাউরিস হলো ইরাক প্রদেশের বিশাল আর অভিজাত শহর, প্রদেশটির অভ্যন্তরে আরো অনেক শহর আর দুর্গ থাকলেও এটিই সবচেয়ে বিখ্যাত আর জনবহুল শহর। এর বাসিন্দারা ব্যবসা-বাণিজ্য আর পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, এখানে বিভিন্ন ধরনের রেশমি বস্ত্র উৎপাদিত হয়, যার কিছু কিছু স্বর্ণসহকারে বোনা হয়, ফলে তার দামও অনেক বেশি। জায়গাটা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য খুবই সুবিধাজনক জায়গাতে অবস্থিত, তাই ভারত, বাউদাস, মগুল, ক্রিমেসরসহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পণ্য বিকিকিনির উদ্দেশ্যে এখানে আসে। এখানে মূল্যবান অনেক পাথর আর মুক্তা আহরিত হয়।

এখানকার বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বণিকেরা প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সাধারণ বাসিন্দাদের বেশিরভাগই দরিদ্র। এখানকার লোকেরা মিশ্র জাতি-গোষ্ঠী, আর গোত্রের মিশ্রণের ফসল, নেস্টরিয়ান, জেকোবাইট, জর্জিয়ান, পার্শি জাতি-গোষ্ঠীর লোক চোখে পড়লেও মুহাম্মদের অনুসারীদের সংখ্যাই বেশি, আর এঁদের সঠিক নাম আসলে তাউরিসিয়ান। এঁদের সবারই আলাদা আলাদা ভাষা রয়েছে। শহরটা মনোরম বাগানে ঘেরা, তাতে চমৎকার ফলফলাদি উৎপন্ন হয়।

মুহাম্মদের অনুসারীরা কপট আর নীতি বিবর্জিত। তাদের মতবাদ অনুসারে বিধর্মীদের কাছ থেকে কোনো কিছু চুরি বা লুটে নেয়া পুরোপুরি বৈধ এবং এ

ধরনের চুরি মোটেই অন্যায় নয়; যারা খ্রিস্টানদের হাতে আহত বা নিহত হবেন তাদের সবাই ধর্মযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন বলে গণ্য করা হবে। তাই এখনকার শাসকেরা তাদের এ ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শনে আর নিষ্ঠুর কাজ করতে মোটেই বারণ করেন না। সব খ্রিস্টান ক্রুসেডারদেরও এ ধরনের নীতি অনুসরণ খুবই স্বাভাবিক। তাদের কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হলে, যাজক তাদের জিজ্ঞেস করে মুহাম্মদকে তারা আদৌ ঈশ্বরের প্রেরিত বলে মনে করে কি না। যাজকের বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খেলেই কেবল তখন তাদের পাপ মোচনের নিশ্চয়তা দেয়া হয়; আর ঘটনাক্রমে পাপ মোচনের এই সুবিধার কারণে, তারা বেশিরভাগ তাতারদের ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়।

তাউরিস থেকে পারস্য বারো দিনের পথ।

১২
তাউরিসের প্রতিবেশী সন্ত বারসামোর আশ্রম

তাউরিস থেকে খুব দূরের পথ নয়, বারসামো সন্তর নামে একটা আশ্রম রয়েছে, সেবার জন্য এটি খুবই বিখ্যাত। এতে একজন মঠাধ্যক্ষ সেই সঙ্গে আরো অনেক সন্ন্যাসী রয়েছে, তাদের সবাই একই ধরনের লাল রঙের পোশাক পরিধান করে। এরপরও তারা মোটেই অলস জীবনযাপন করেন না, সারা দিন তারা উলের কাঁচুলি তৈরি করেন, অর্চনার সময় সেসব তারা বেদিতে সমর্পণ করেন এবং প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করার সমস্ত-পবিত্র আত্মার নির্দেশিত আচরণ অনুসারে সেসব কাঁচুলিগুলো তারা বন্ধু আর গণ্যমান্যদের উপহার দেন; উলের এই কাঁচুলি পরিধান করলে বাতের ব্যথা ভালো হয় এমন বিশ্বাসের কারণে সবাই এটি পেতে আগ্রহী।

১৩
পারস্য প্রদেশ

সুপ্রাচীনকাল থেকেই পারস্য খুব বৃহৎ আর বিখ্যাত প্রদেশ হিসেবে পরিচিত, কিন্তু এর বেশিরভাগই এখন তাতারদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত।

পারস্যে সাবা নামের এক শহর রয়েছে, প্রাচ্যের যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিশু-খ্রিস্টের ভজনা করতে বেথলেহেমে উপস্থিত হয়েছিলেন; এখানেই তাদের মনোরম কবরে সব চুল-দাঁড়িসহ সমাধিস্থ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এঁদের একজনের নাম বালথাসার, দ্বিতীয় জনের নাম জেসপার, আর তৃতীয় জনের নাম মেলচিওর। এই শহরে আসার পর মার্কো অনেকের কাছেই সেই তিনজনের সম্পর্কে জানতে চান, কিন্তু প্রাচীনকালে সেই তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এই শহরের কোথাও কবরস্থ করা হয়েছে এটা ছাড়া কেউই তাকে তাদের সম্পর্কে কোনো কিছু জানাতে

পারেনি। সেখান থেকে তিন দিনের পথ অগ্রসর হলে কালা এটাপেরিসটান নামের এক প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়, এর নামের মানে অগ্নি-উপাসকেদের প্রাসাদ; এবং এটাও সত্য যে এই প্রাসাদের বাসিন্দারা আগুনের পূজা করে, আর সেই কারণের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

প্রাসাদের লোকেরা জানায়, প্রাচীনকালে সেই দেশের তিনজন রাজা সদ্য জন্মনেয়া এক নবির পূজা করতে যান এবং সেই নবি স্বয়ং ঈশ্বর, না মাটির পৃথিবীর কোনো রাজা নাকি চিকিৎসক সেটা নিশ্চিত হতে তারা উৎসর্গ হিসেবে সোনা, সুগন্ধি রজন এবং ধূপ সঙ্গে নেন।

এই জ্ঞানীরা যখন খ্রিস্টকে সেই উপহার প্রদান করেন, তিনজনের সর্বকনিষ্ঠ জন সর্বপ্রথমে তাকে ভজনা করেন এবং তখন খ্রিস্টকে দৈহিক আকার ও বয়সের দিক দিয়ে তার নিজের মতোই দেখতে মনে হয়, এরপর মাঝের জন আসেন, তারপর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ জন, তাদের প্রত্যেকেই তাকে নিজের আকৃতি ও বয়সে অবলোকন করেন। এরপর যা দেখেছেন তা একসঙ্গে তুলনা করার পর, আবারও তারা একসঙ্গে কুর্নিশ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি তাদের সামনে তার সত্যিকার আদল আর বয়সে ধরা দেন।

১৪
নিজ দেশে ফিরে আসার পর সেই তিন জ্ঞানীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল

চলে আসার সময় সেই শিশু তাদের একটা বন্ধ বাক্স দেন, যা তারা কয়েক দিন ধরে সঙ্গে করে বয়ে বেড়ায়, এরপর তিনি তাদের কী দিয়েছেন সেটা দেখতে কৌতূহলী হয়ে, তারা সেই বাক্স খুলে একটা পাথর দেখতে পান। এতে এমন একটা চিহ্ন রয়েছে যা হতে বোঝা যায় যে বিশ্বাস তারা তার কাছ থেকে লাভ করেছেন, তারা যেন তাতে পাথরের মতন অটল থাকেন। তবু পাথর দেখে তারা পুরোপুরি অবাক হন এবং প্রতারিত হয়েছেন ভেবে সেটা নির্দিষ্ট একটা গর্তের মাঝে ছুঁড়ে ফেলেন আর তখনই সেই গর্ত থেকে বিস্ফোরিত হয়ে দাউদাউ করে আগুন বেরোতে শুরু করে।

এটা দেখার পর, কৃতকর্মের জন্য তারা অনুতপ্ত বোধ করে, সেখান থেকে সামান্য আগুন সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। এবং তাদের একটি উপাসনালয়ে সেই আগুন স্থাপন করেন, অবিরাম সেটা জ্বলতে থাকে এবং ঈশ্বর জ্ঞান করে সেই আগুনের ভজনা করতে শুরু করেন এবং তাতে তাদের সব বলি উৎসর্গ করতে থাকেন। আর কখনো সেটা নিভে গেলে আবারও তারা যেখানে পাথরটা ছুঁড়ে মেরেছিলেন সেই গর্তের কাছে গিয়ে মূল আগুন থেকে আগুন নিয়ে আসতেন, যেটা কখনো নিভে যায়নি, এ কাজে তারা কখনো অন্য কোনো আগুন ব্যবহার করেনি। আর এ কারণেই এ দেশের লোকেরা আগুনের পূজা করে।

সে দেশের লোকেদের কাছেই মার্কো এতসব শুনেছেন; আর এটাও সত্য সেই তিনজনের একজন ছিলেন সাবা [সাবাহ্]-এর রাজা এবং দ্বিতীয় জন দাইভা [আভাহ] এবং তৃতীয়জন যেখানে আজও আগুনের পূজা চলছে সেই প্রাসাদ* থেকেই রাজত্ব পরিচালনা করতেন। এবার আমরা পারস্যের লোকেদের আচার-আচরণ আর তাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে জানব।

১৫
পারস্যের আট রাজ্য এবং সেখানকার ঘোড়া আর গাধা

পারস্যের মতো সুবিশাল প্রদেশের, আটটি রাজ্য রয়েছে, পর্যায়ক্রমে সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো : সে দেশে প্রবেশের প্রথমেই কাসিবিন রাজ্যের দেখা মিলবে; দ্বিতীয়ত এর দক্ষিণে কুর্দিস্তান; তৃতীয় রাজ্যটি হলো লোর; এর দক্ষিণে, চতুর্থ রাজ্যটিই সুওলিস্তান; পঞ্চমটি স্পাআন; ষষ্ঠটি, সাইরাস; সপ্তটির নাম সোনকারা; আর প্রদেশের সীমান্তঘেঁষা অষ্টম রাজ্যটির নাম টিমোচীন। রাজ্যটি উত্তরের আরবর সেকো নামক জায়গার কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত, প্রদেশের বাকি সব রাজ্য-এর দক্ষিণে।

প্রদেশটি এর উন্নত মানের ঘোড়ার জাতের জন্য খুবই বিখ্যাত, এর বেশিরভাগই উঁচু দরে বিক্রির জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়, সাধারণত যার এক একটির দাম দুই শত টোরনইসের* কম নয়। এখানে বিশ্বের বড় আকারের আর সুশ্রী গাধাও জন্মে, যা ঘোড়ার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়, কারণ এগুলোকে খুব সহজেই খাবার খাওয়ানো যায় এবং অনেক ভারী বোঝাও এরা বয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম এবং ঘোড়া বা খচ্চরের চাইতে দিনে বেশি দূর ভ্রমণ করতে পারে, ঘোড়া আর খচ্চর কখনো এর সমপরিমাণ ক্লেশ সহ্য করতে পারে না। তাই যেসব ব্যবসায়ীকে তৃণহীন বালুময় পানিশূন্য মরুভূমির ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, সেই দিনগুলোতে তাদের কাছে এটি খুবই পছন্দের বাহন, তাছাড়া এগুলো খুব দ্রুত চলাচল করে এবং খাবারও কম খায়। এ ধরনের কাজে উটও ব্যবহার করা হয় এবং এটি অনেক বেশি ভার বহনে সক্ষম আর রক্ষণাবেক্ষণে খরচ কম হলেও গাধার মতো অত দ্রুত চলতে পারে না। এদিকের ব্যবসায়ীরা ঘোড়ায় চড়ে কিসি, ওরমাস আর ভারত সাগরের উপকূলে যাতায়াত করে, সেখানে গিয়ে বিক্রি

---

* বলা হয়ে থাকে কাশান থেকে বিশ মাইল অদূরে সেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়, এখনো সেখানকার ছোট্ট একটি গোত্র আগুনের পূজা করে। দেখুন : মার্কো পলোর ওপরে লেখা প্রফেসর এ.ভি. উইলিয়ামের মনোগ্রাফ। জার্নাল অব দ্য এম. ওরিয়েন্টাল সক, ১৯০৫।
* এক ট্রিফল–২০০ স্টারলিংয়ের চেয়ে কম!

করার পর, বিক্রেতারা এদের ভারতে নিয়ে যায়। তবে দেশটির অত্যধিক গরমের কারণে সেখানে তারা খুব বেশি বছর বাঁচে না, কারণ ঘোড়াগুলো তাদের স্থানীয় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অভিযোজিত।

এর কিছু কিছু জেলার লোকেরা অসভ্য আর রক্তপাতে অভ্যস্ত, যখন-তখন একে ওপরকে খুন-জখম করা এদের কাছে নিয়মিত ব্যাপার। ব্যবসায়ী আর পর্যটকদের আহত করতেও এদের মোটেই বাঁধে না, ভয়ানক শাস্তি পাবার পরও এরা পূর্ব তাতারের লোকেদের মোটেই পরোয়া করে না। এখানে একটা নিয়মও প্রচলিত আছে, বিপদের আশঙ্কা করা ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুসারে এখানকার অধিবাসীরা বিশ্বস্ত আর কর্মঠ পথপ্রদর্শক সরবরাহে বাধ্য থাকবে, এই কাজে এক জেলা থেকে অপর জেলায় মাল বোঝাই প্রতিটি পশুর জন্য দূরত্ব অনুসারে দুটা বা তিনটা হারে ছাগল দিতে হয়। এঁদের সবাই মুহাম্মদের ধর্মের অনুসারী।

তবে শহরে, ব্যবসায়ী আর অসংখ্য কারিগরের বাস, এরা বিভিন্ন ধরনের রেশম আর স্বর্ণের পণ্য উৎপাদন করে। দেশটিতে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়, একইভাবে গম, বার্লি, জোয়ার এবং অন্যান্য শস্যও ফলে; সেই সঙ্গে আঙুরসহ সব ধরনের ফলফলাদি জন্মে।

কেউ কি এমন দাবি করবেন যে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধ চারণকারীগণ ওয়াইন পান করেন না, ধর্মে নিষেধ থাকার পরও, জানা গেছে, খুব সচেতনভাবেই তারা মনে করেন যদি আগুনে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে এটি পরিমাণে হ্রাস পায় এবং মিষ্টি স্বাদপ্রাপ্ত হয়, তখন তারা কোনো প্রকার ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ছাড়াই এটি খেতে পারেন; স্বাদ পরিবর্তনের কারণে তারা এর নামও বদলে নিয়েছেন এবং তখন একে আর ওয়াইন বলা হয় না, যদিও এটা একটা বাস্তবতা মাত্র।

১৬
ইয়াসদি মহানগরী ও এর পণ্য এবং পার্শ্ববর্তী কিরমান পর্যন্ত যেসব প্রাণীর দেখা মিলে

ইয়াসদি পারস্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নগরী, জায়গাটাতে তাই অনেক লোকের যাতায়াত। রেশম আর স্বর্ণের মিশ্রণে বিশেষ একধরনের কাপড় এখানে পাওয়া যায়, যা ইয়াসদি নামে পরিচিত এবং ব্যবসায়ীরা সেটা এখান থেকে সংগ্রহ করে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেন। এখানকার অধিবাসীরা মুহাম্মদের ধর্মের অনুসারী।

শহর থেকে বাইরে কোথাও ভ্রমণে যেতে চান, এমন সবাইকে সমতলের ওপর দিয়ে আট দিনের পথ পেরুতে হয়, সেই পথে মাত্র তিনটা থাকার মতো জায়গা মিলতে পারে। পথের দু'পাশে ঘন খেজুর বাগান, তাতে খেজুর ঝুলতে দেখা যায়, এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে, সেই সঙ্গে তিতির আর কোয়েলের মতো বিভিন্ন পশু-পাখির খেলার সঙ্গেও এখানকার লোকেরা

পরিচিত। যেসব পর্যটকেরা দাবা খেলতে ভালোবাসেন এখানে এসে তারা মজার খেলা উপভোগ করতে পারবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে সুশ্রী বুনো গাধাও দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই আট দিনের ভ্রমণ শেষে অবশেষে আপনি এমন একটি রাজ্যে এসে পৌঁছবেন, যার নাম কিরমান।

১৭
কিরমান, প্রাচীন নাম কারমানিয়া, এখানকার পণ্য, খনিজ আর শকুনের কথা

কিরমান পারস্যের পুবের একটি রাজ্য, আগে এটি বংশানুক্রমিকভাবে এখানকার স্থানীয় সম্রাটদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল; কিন্তু তাতাররা এটিকে তাদের অধীনে নেবার পর হতে, তাদের খুশিমতো তারা এখানকার শাসক নিয়োগ দিচ্ছেন। এখানকার পাহাড়গুলোতে ফিরোজা নামের একধরনের মূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। এখানে অধিক পরিমাণে ইস্পাত আর এন্টিমনিও পাওয়া যায়। ঘোড়ার জিন, লাগাম, নাল, তরবারি, ধনুকের মতো সব ধরনের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণসহ সাধারণের ব্যবহারযোগ্য সব ধরনের যন্ত্রপাতি এখানে খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়। মহিলা ও তরুণীরা সূচিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, রেশম আর স্বর্ণের সাহায্যে তারা কাপড়ের ওপর পশু-পাখিসহ অন্যান্য সাজসরঞ্জামের রং-বেরঙের চমৎকার সব নকশা আঁকে। সাধারণত বিলাসবহুল জানালা আর বিছানার পর্দা এবং বালিশের ওপর এইসব নকশা আঁকা হয়; আর অত্যন্ত শ্রদ্ধা মিশিয়ে, অনেক বেশি রুচি আর মুনশিয়ানার মাধ্যমে তারা এ ধরনের কাজ করেন বলেই বোঝা যায়।

এখানকার পাহাড়ি অঞ্চলে একধরনের শকুন দেখা যায়, এরা অনেক দূর পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। পরিযায়ী শকুনদের চাইতে এদের আকার অনেক ছোট; বুক, পেট আর লেজের নিচের দিকটা লালচে এবং দ্রুত উড়তে পারার কারণে কোনো পাখিই এদের নাগাল থেকে পালাতে পারে না।

কিরমান থেকে অন্যত্র ভ্রমণে যাবার জন্য সমতলের ওপর দিয়ে মনোরম একটি পথ রয়েছে, সাত দিনের দূরত্বের এই পথে বিভিন্ন ধরনের খেলার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ মিলতে পারে। পথে মাঝে-মধ্যেই শহর বা প্রাসাদের দেখাও মিলতে পারে, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আরো অনেক বাসিন্দারও দেখা মিলবে; তবে একটি পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছার আগ পর্যন্ত তেমন একটা চড়াই-উৎরাইয়ের মুখোমুখি হতে হয় না, সেই জায়গাটা অতিক্রম করতে দু'দিনের মতো সময় দরকার। এখানে প্রচুর পরিমাণে ফলফলাদির গাছ দেখতে পাওয়া যায়; এই জেলাটি আগে খুব জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল, বর্তমানে রাখাল ছাড়া আর কেউই এখানে থাকে না, আশপাশের তৃণভূমিগুলোতে এঁদের

পশু চড়াতে দেখা যায়। দেশের এই জায়গাতে এসে পৌঁছাবার আগে একটি খাদ পেরিয়ে আসতে হয়, শীত সেখানে এতই প্রকট যে গায়ে একনাগাড়ে অনেক পোশাক চড়িয়েও তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না।

১৮
কামান্ডু নগর এবং রিওবার্লে জেলা, এখানকার অচেনা পাখি, আজব ষাঁড় আর লুটেরা কারাউন গোত্রের কথা

সেই পাহাড়ি খাদের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারলে বিস্তৃত একটা সমতল এর দেখা মিলবে, সেখান থেকে পাঁচ দিনের পথ গেলে একটা শহর দেখতে পাবেন, নাম কামান্ডু, আগে এটি অনেক বড় আর ঘটনাবহুল ব্যস্ত শহর হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিল, তাতাররা এটাকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরিত্যক্ত এক নগরে পরিণত করেছে। এই শহরের বাসিন্দারা রিওবার্লে নামে পরিচিত। এখানকার সমতল খুবই উষ্ণ প্রকৃতির। জায়গাটিতে ধান, গমসহ অন্যান্য আরো অনেক ধরনের শস্য ফলে।

এখানকার পার্বত্য এলাকার কাছাকাছি অংশে খেজুর, বেদানা, নাশপাতিসহ নানা ধরনের ফলফলাদি জন্মে, যার একটির নাম আদমের আপেল, আমাদের শীতল জলবায়ুর অঞ্চলের লোকেদের কাছে তা একেবারেই অপরিচিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে শ্যাম-ঘুঘু দেখতে পাওয়া যায়, জায়গাটির ছোট ছোট ফল বেশি পাওয়া যায় বিধায় খাদ্যের প্রাচুর্য তাদের আকৃষ্ট হবার কারণ, তবে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার কারণে মুহম্মদের অনুসারীরা এগুলো খায় না। এখানে অনেক লম্বা লেজওয়ালা রঙিন পাখি ও চকোর দেখতে পাওয়া যায়, অন্যান্য এলাকার পাখিদের সাথে যাদের তেমন একটা মিল নেই, এদের গায়ের রং অনেকটা সাদা-কালোর মিশেল এবং পা আর ঠোঁট লালচে।

গবাদিপশুর মাঝেও বেশ কিছু ব্যতিক্রমী ধরনের প্রজাতির দেখা মেলে, বিশেষ করে ছোট ছোট লোমওয়ালা বড় আকারের একধরনের ধবল ষাড় দেখতে পাওয়া যায় উষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে এদের শিং মোটা, ভোঁতা আর খর্ব আকৃতির আর ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গাতে কুঁজ রয়েছে, যার উচ্চতা দুই করতল। পশুটা দেখতে খুবই সুন্দর, আর খুবই শক্তিশালী, ফলে এরা অনেক ভারী বোঝাও বইতে সক্ষম। আর পিঠে বোঝা চাপাবার সময় এরা উটের মতো হাঁটু গেড়ে বসে আর বোঝা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমরা এখানে লম্বা আর মোটা লেজওয়ালা একধরনের ভেড়াও দেখেছি, যা আকারে প্রায় গাধার সমান, এদের ওজন প্রায় ত্রিশ পাউন্ডের চেয়ে বেশি, মোটা এই পশুর মাংসও খুব স্বাদের।*

---

* ইয়েল এমন অনেক অভিযাত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যারা একে মোটেই অতিরঞ্জিত বলে দাবি করেননি। বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত হেনরি কর্ডিয়ার রচিত নটস এন্ড এডেনডা টু সার মার্কো পলো-এর অতিরিক্ত সংস্করণেও এর সমর্থনে প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়।

এই প্রদেশের অনেক শহর চওড়া আর মজবুত মাটির দেয়ালে ঘেরা, লুটেরা কারাউন গোত্রের লোকেদের কবল থেকে এখানকার অধিবাসীদের রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, এরা খুব দ্রুতবেগে ধেয়ে এসে হাতের কাছে যা পায় তাই ছিনিয়ে নিয়ে ভাগে। এর থেকেই পাঠক হয়তো বুঝে গিয়েছেন এরা কী ধরনের লোক। এখানে একটা কথা বলা দরকার, নুগোদার নামে এক রাজপুত্র ছিল যে কি না গ্রেট খান ওকাটার ভাই তুর্কিস্তানের রাজা জাগাটার ভাগ্নে। জাগাটার দরবারে অবস্থানের সময় থেকেই এই নুগোদার মনে রাজা হবার বাসনা জাগে এবং সে জানতে পারে ভারতে মালাবার নামের এক প্রদেশ রয়েছে, তখনো সেটা আস-ইদিন নামের এক সুলতানের শাসনাধীন রয়ে গেছে এবং তাতার সাম্রাজ্যের অধীনে আসেনি। গোপনে সে দশ হাজারের মতো দুরাচার আর মরিয়া একদল সৈনিক সংগ্রহ করে, পরিকল্পনা অনুসারে মামাকে কোনো প্রকার খবর না দিয়েই বালাশানের ভেতর দিয়ে কেসমুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, এখান দিয়ে যাবার সময় দুর্গম পথের কারণে তার অনেক লোক আর পশু ক্ষয় হয়, অবশেষে সে মালাবারে প্রবেশ করে। এখানে এসে সে আস-ইদিনের কাছ থেকে জোর করে দিলে নামের শহরসহ এই অঞ্চলের আরো অনেক শহর দখলে নিয়ে, রাজ্য শাসন করতে শুরু করে। তার সাথে ফর্সা রঙের যেসব তাতার এসেছিল, তাদের সঙ্গে স্থানীয় মহিলাদের কালো রঙের মিশ্রণে নতুন যে জাতি সৃষ্টি হয় তারাই কারানুস নামে পরিচিত, দেশটির স্থানীয় ভাষায় কথা বললেও এরা একটি সঙ্কর জাত; এরপর থেকেই তারা কেবল রিওবার্লের ভেতরেই লুণ্ঠন করে সন্তুষ্ট নয়, বরং প্রবেশ করতে সক্ষম এমন প্রতিটি জায়গাতেই তারা তাদের লুণ্ঠন আর ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে।

ভারতে এসে তারা জাদুবিদ্যা আর ডাকিনীবিদ্যার ওপর জ্ঞান অর্জন করে, এর সাহায্যে এরা দিনের আলোকে কমিয়ে নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত এমন অন্ধকার নামাতে পারে, যে তখন কাছের জনকেও চোখে দেখা যায় না। শিকারি অভিযানে গিয়ে এরা তাদের এই বিদ্যাকে কাজে লাগায় এবং তাদের এই ভাঁওতাবাজি কারো পক্ষেই বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।**[**] প্রায়ই তারা এই জেলাতে এ ধরনের দৃশ্যের অবতারণা করে; তার কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা ওরমাসে যাবার পথে এখানে এসে জড়ো হয়ে ভারতগামীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ভ্রমণ ক্লান্তি কাটাতে তারা সঙ্গে আনা ঘোড়া আর খচ্চরসহ শীতকাল পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করে, যাতে এই রিওবার্লে-এর সমতলের বিস্তৃত তৃণভূমিতে চড়ে সেগুলো মোটাতাজা হতে পারে। কারাউনরাও এসব জানে, তাই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তারা এখানে গণ-লুণ্ঠন সংঘটিত করে আর পশুর সহচরের কাছে মুক্তিপণ আদায়ে ব্যর্থ হলে তাকেও ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

** ভারতের উজানের পর্যটকেরাও এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানা যায় এবং ধূলিঝড়সহ নেমে আসা এই অন্ধকারকে তারা শুকনো কুয়াশা নামে অভিহিত করেছে। মেজর স্কাইস এন্ড আদার এক্সপ্লোরার থেকে ইয়েলের উদ্ধৃতি দেখতে পারেন।

মার্কো পলো নিজেও একবার এমন একটা ভুতুড়ে পরিস্থিতিতে পড়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে কোনোরকমে পালিয়ে সে কোনোসালমি প্রাসাদে আশ্রয় নিতে সক্ষম হলেও, তার সঙ্গীদের অনেকেই তখন ধরা পড়ে দাস হিসেবে বিক্রি হয়, অন্যেরা আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই সব লোকেদের একজন রাজাও আছে, তার নাম কোরোবার।

১৯
ওরমাস নগরী, এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব আর ঝড়ো বাতাস

একটু আগে যে সমভূমির কথা বলা হলো তার সীমানা সেখান থেকে দক্ষিণে আরো পাঁচ দিনের পথ, সেখানে বিশ মাইলের মতো একটা ঢাল রয়েছে, জায়গাটার পথঘাট প্রচণ্ড বিপদসঙ্কুল, এখানে পর্যটকদের সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের হাতে অনবরত নিগ্রহ আর লুণ্ঠনের শিকার হতে হয়। এই ঢাল পথ আরেকটা সমভূমির সঙ্গে এসে মিশেছে, জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর, এর সীমান্তে পৌঁছাতে দু'দিনের মতো লাগবে, এরই নাম ওরমাসের সমভূমি। এখানে অসংখ্য ঝরনাধারা দেখতে পাওয়া যায় এবং জায়গাটা খেজুর গাছে ছাওয়া, এখানে চকোর, তিতির, তোতাপাখির মতো আরো অনেক নাম-না-জানা পাখির দেখা মিলবে, যা আমাদের দেশে নেই। একেবারে শেষে সাগরের সীমানা, সেখানে একটা দ্বীপ আছে, বেলাভূমি থেকে তা খুব একটা দূরে নয়, এরই শহরের নাম ওরমাস, যার বন্দরে প্রায়ই ভারতের সব জায়গা থেকে আসা বণিকেরা ভিড়ে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তারা মসলা, মাদক; মণি, মুক্তা, হীরা, জহরতসহ আরো অনেক মহামূল্যবান রত্ন, স্বর্ণের কাপড়, হাতির দাঁত এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসেন। এসব তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করেন, যাদের হাত ধরে সেসব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সত্যিকার অর্থেই এটা সুবিখ্যাত একটি বাণিজ্যিক শহর; এখানকার অনেক শহর আর প্রাসাদ এর ওপর নির্ভরশীল এবং এটি কিরমান রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা। এখানকার শাসকের নাম রুকমেদিন আখোমাক, তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বসহকারে সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং একই সঙ্গে কিরমানের রাজাকে তার রাজা হিসেবে গণ্য করেন। যখনই কোনো বিদেশি বণিক মারা যান, তার যাবতীয় সম্পদ তিনি বাজেয়াপ্ত করে ধনভাণ্ডারে জমা করেন।

গ্রীষ্মকালে, অত্যধিক গরমে এখানকার বাতাস অস্বস্তিকর ঠেকায় এখানকার অধিবাসীদের কেউ শহরে থাকে না, তারা তখন সাগর তীরে তাদের বাগানে বা নদী পাড়ে গিয়ে জলের ওপর একধরনের কুঁড়ে প্রস্তুত করে বসবাস করে। জলের একদিকে খুঁটি গেড়ে অপর-পাশ পাড়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে তার উপরে পাতার ছাউনি বানিয়ে নিজেদেরকে এরা রোদ থেকে রক্ষা করে। প্রতিদিন সন্ধ্যার

আগপর্যন্ত টানা নয় ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড গরম বাতাস বয়, স্থলের দিক থেকে আসা সেই বাতাস এতই উষ্ণ যে তাতে নিঃশ্বাস নেয়া প্রায় অসম্ভব, এই অবস্থায় কেউ বাইরে গেলে দমবন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে, বালুময় সমতলের বাসিন্দাদের কেউই এই সমস্যা হতে মুক্ত নন, তারা তাই এই সময়টুকুতে নিজেদের কুঁড়েতে অবস্থান করে। তপ্ত সেই বাতাস ঝাঁপটা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার লোকেরা থুতনি পর্যন্ত পানিতে ডুব দিয়ে থাকে* আর অবস্থার উন্নতি হবার আগ পর্যন্ত সেখানেই থাকে।

এ রকম অসম্ভব গরমের কথা প্রমাণ করতে, সেখানে অবস্থান করার সময় একবার এ রকম পরিস্থিতিতে পড়ে তাকেও এমন করতে হয়েছিল বলে মার্কো পলো জানায়। ওমাসের শাসক কিরমানের রাজাকে কর দিতে অস্বীকার করে চিঠি পাঠায়। তখন বেশিরভাগ বাসিন্দা শহরের বাইরে মূল ভূখণ্ডে অবস্থান করছিল, এই কারণে ষোল হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্যের একটা দল আকস্মিকভাবে তাদের পদানত করতে রিওবার্লের ওপর দিয়ে যাত্রা করে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের ভুলের কারণে রাত্রি নামার আগেই তারা সেখানে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে, ওরমাসের কাছাকাছি একটা কুঞ্জবনে বিশ্রাম নিতে থাকে; এবং সকালবেলা যাত্রা করায় তারা সেই তপ্ত বাতাসের মুখোমুখি হয়ে সবাই দম বন্ধ হয় মারা যায়, তাদের একজনও আর সেখান থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে তাদের প্রভুর কাছে সেই খবরটা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। ওরমাসের বাসিন্দারা ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পেরে, সেই মরাগুলোকে মাটি চাপা দিতে যায়, যাতে সেগুলো বাতাস দূষিত করতে না পারে। তারা গিয়ে দেখতে পায় তীব্র তাপদাহে সেগুলো এমনভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে হাত-পা ধরে টান দিতে গেলে তা তাদের দেহ থেকে আলাদা হয়ে পড়ছিল,**[**] তাই মরার কাছাকাছিই তাদের জন্য গর্ত খুঁড়তে হয়।

ওরনামে যে জাহাজ তৈরি হয় তা খুবই বাজে ধরনের এবং সমুদ্রযাত্রার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, এগুলোর কারণে বণিকসহ বিভিন্ন লোকেদের প্রায়ই প্রচণ্ড রকমের বিপদে পড়তে হয়। নির্মাণকাজে পেরেক ব্যবহার না করা থেকেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত। এসবে খুবই শক্ত প্রকৃতির কাঠ ব্যবহার করা হয় এবং মাটির জিনিসপত্রের মতো এগুলো ভেঙে চৌচির হয়ে যেতে পারে, তাই তারকাঁটা গাঁথতে গেলে এ ধরনের কাঠ প্রায়ই ভেঙে যায়। যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে লোহার তুরপুন দিয়ে কিনারা বরাবর তক্তায় ছিদ্র করে, তারপর এর মাঝে কাঠের কাঁটা ঢুকিয়ে দেয়া হয়, এভাবেই একটির সঙ্গে আরেকটি তক্তা জোড়া লাগানো হয়। এভাবে জোড়া দেয়া ছাড়াও, দড়ি দিয়ে সেলাই করা হয়। একধরনের ভারতীয় নারকেলে ঘোড়ার লোমের মতো আঁশ থাকে, পানিতে ভিজিয়ে রেখে নরম অংশ পচিয়ে এর

** বুর্খ্রনসহ আরো অনেক পর্যটক দেশটির এ ধরনের আজব লু-হাওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।

থেকে সেই ছোবড়া বের করে নিয়ে দড়ি বানানো হয়, কাঠ সেলাইয়ের জন্য, এগুলো অনেক দিন পর্যন্ত পানির নিচে অক্ষত থাকে। জাহাজের তলায় আলকাতরার বদলে মাছের চর্বি থেকে প্রস্তুত একধরনের তেলের প্রলেপ দেবার পর আঠালো জিনিসের সঙ্গে দড়ির ফেঁসো দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করা হয়। এ ধরনের জাহাজে একটির বেশি মাস্তুল, হাল আর তল থাকে না। এ ধরনের জাহাজে কোনো লোহার নোঙরও ব্যবহার করা হয় না, এর বদলে তলদেশের সঙ্গে আটকে থাকতে অন্য একধরনের বড়শি ব্যবহার করা হয়, ফলে ভারতে ঘোড়া বহন করে নেবার সময় সাগর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তীর থেকে ছুটে গিয়ে প্রায়ই এসব জাহাজে হারিয়ে যায়।

জায়গাটির বাসিন্দারা কালো রঙের আর মুহাম্মদান। নভেম্বর মাসের দিকে এরা ধান, গম আর অন্যান্য শস্য বপন করে, আর মার্চে ফসল তোলে। এই মাসে তারা ফলও সংগ্রহ করে, তবে খেজুর ছাড়া, সেটা তোলা হয় মেতে, এসবের সঙ্গে অন্যান্য আরো বেশ কিছু উপকরণের মিশ্রণে তারা একপ্রকার উন্নত মানের ওয়াইন প্রস্তুত করে। পানে অভ্যস্ত নয় এমন অনেকেই এর সাহায্যে মেদ কমানোসহ আরো অনেক উপকারের প্রমাণ পেয়েছেন।

স্থানীয়ের খাবার আমাদের থেকে আলাদা; কেননা আটার রুটি আর মাংস তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। এরা মূলত খেজুর আর লবণ দেয়া মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। আর মাছ হিসেবে তারা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী টুনা, সিপোলের মতো পরিচিত মাছ বেছে নেয়। জলাভূমি অঞ্চলে যেমনটা হওয়া উচিত, অত্যধিক তাপের কারণে দেশটির মাটি ঠিক সেরকমভাবে তৃণ আচ্ছাদিত নয়, এখানকার তাপে এসবের সব কিছুই দগ্ধ করে ফেলে।

এখানকার গণ্যমান্যদের কেউ মারা গেলে তার বউ টানা চার সপ্তাহ ধরে শোকে মাতম করে; এ ধরনের কাজ করার জন্য এখানে পেশাদার লোকও খুঁজে পাওয়া যায়, আত্মীয়ের সম্পর্ক নেই এমন লোকেরা মৃতের জন্য শোক করে আয় করে।***

ওরমাসে ভারতের যেসব জিনিসপত্র দেখেছি তা পরে বলার ইচ্ছে রাখি, এবার উত্তরের কিরমানের কথা বলা যাক। ওরমাস ছাড়ার জন্য সমতলের ওপর দিয়ে মনোরম আরো একটা পথ রয়েছে, সেখান দিয়ে যাবার সময় সব ধরনের খাবারের উপকরণের দেখা মিলতে পারে; অসংখ্য পাখি, বিশেষ করে তিতির। কিন্তু এরা তাদের ফলানো গম থেকে যে রুটি বানায় তা খাবার একেবারে অযোগ্য, কারণ এখানকার লোকেরা এখনো রুটি বানাতে শিখেনি, পানি থেকে তাতে একটা তেতো স্বাদ যোগ হয়, কেননা এখানকার পানির সবটাই তেতো আর কটু স্বাদের। আশপাশের সর্বত্রই উষ্ণ জলের ঝরনা, এদের জল ত্বকসহ

*** পুবের অনেক জাতি এখনো এ ধরনের পেশাদার শোককারী নিয়োগ দিয়ে থাকে, আর বিশ্বের সর্বত্রই ইহুদিদের এমন লোকের সাহায্য নিতে দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন ধরনের রোগের উপশমে সক্ষম। এখানে খেজুর আর অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

২০
কিরমান আর কোবিয়াম-এর মধ্যকার বিশাল মরুভূমি আর সেখানকার তেতো পানি

কিরমান ছেড়ে তিন দিনের পথ গেলে একটা মরুভূমির সীমানায় এসে পৌঁছবেন, এখান থেকে কোবিয়াম সাত দিনের পথ। সেই পথের প্রথম তিন দিন সামান্য পানির খোঁজ মিলবে, সেই পানি সামান্য নোনতা আর ঘাসের মতো সবুজ, খেলে এমন মাথা ধরে যে পানের একেবারেই অযোগ্য। এমনকি এর এক ফোঁটা গলা দিয়ে নামলে, মনে হবে গলা দিয়ে লবণের কটা নামছে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক কাজে সারা পড়ে যাবে। এ কারণে, মরুভূমির ওপর দিয়ে যাবার সময় পর্যটকদের সবাইকে সঙ্গে পর্যাপ্ত জল বহন করতে হয়। তবে পশুরা এমন জলই খেতে বাধ্য হয় আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের এর যের টানতে হয়। তিন দিনের এই যাত্রাপথে একটাও বাসস্থান চোখে পড়বে না। চারিদিকে কেবল অনুর্বর বালিরাশি আর খাঁ খাঁ শূন্যতা। খাবার উপযোগী কোনো কিছু নেই বলে এদিকটাতে গবাদিপশুর দেখাও মিলবে না।

চতুর্থ দিনে স্বাদু পানির একটি নদীর দেখা মিলবে, তবে এর বেশিরভাগ অংশই ভূগর্ভের অভ্যন্তরে। আর কিছু কিছু স্থানে আকস্মিকভাবে উন্মুক্ত থাকলেও, স্রোতময় সেই জায়গা খুব স্বল্প জায়গাজুড়ে দৃশ্যমান হয়, এসব জায়গাতে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে। পর্যটকেরা ভ্রমণের ক্লান্তি কাটাতে তাদের পশুসহ এসব জায়গার কাছাকাছি এসে বিশ্রাম নেয়। বাকি তিন দিন আগের মতোই পথ চলতে হবে এবং অবশেষে কোবিয়াম শহরের দেখা মিলবে।

২১
কোবিয়াম শহর আর এর পণ্য

কোবিয়াম একটা বিশাল শহর, এখানকার অধিবাসীরা মুহম্মদের আইনের অনুসারী। তাদের রয়েছে লোহাসহ আরো অনেক ধাতব। এখানে তারা ইস্পাতের ওপর অতি মসৃণ পলিশ করা বিশাল আকারের খুব সুন্দর ধরনের আয়না প্রস্তুত করে। এন্টিমনি আর দস্তা দেশটিতে অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, বিশেষ যত্নসহকারে এরা টুট্টি নামের দস্তার একপ্রকার অক্সাইড সংগ্রহ করে তা দিয়ে কলিরিয়াম নামের কালো অঞ্জন আর স্পোডিয়াম নামের ছাই তৈরি করে। পদ্ধতিটা বিস্তারিত দেয়া হলো। বিশেষ স্থান থেকে এই কাজের উপযোগী অশোধিত আকরিক নিয়ে উত্তপ্ত চুল্লিতে ফেলা হয়। চুল্লির ওপরের দিকে খুব

কাছাকাছি ছোট ছোট দণ্ডের লোহার গরাদ স্থাপন করা হয়। আকরিক থেকে বাষ্প আর ধোঁয়া বের হয়ে এই লোহার শিকের ওপর এসে জমা হয়, ঠাণ্ডা হবার পর এটি শক্ত হয়ে যায়, এরই নাম টুটি; আর আকরিকের যে অংশটা নিচে ফার্নেসের ভেতরে অবশিষ্ট থাকে, সেটাই স্পোডিয়ামে পরিণত হয়।

২২
কোবিয়াম থেকে পারস্যের উত্তরে টিমোচীন প্রদেশে যাত্রা এবং সেখানকার বিশেষ ধরনের গাছ

কোবিয়াম থেকে টানা আট দিনের পথ একটা মরুভূমির ওপর দিয়ে পথ চলতে হয়, জায়গাটা প্রচণ্ড শুষ্ক; এখানে কোনো ফলফলাদি তো দূরের কথা কোনো ধরনের গাছের দেখাও মিলবে না এবং যে পানি মিলবে তার সবই কটু স্বাদের। পর্যটকদের তাই জীবনধারণের জন্য সঙ্গে পর্যাপ্ত জল নেয়া চাই। পশুরা মরুর সেই জলেই তৃষ্ণা মিটাতে পারে, তবে এর মালিদেরও মাঝে মধ্যে সেসব আটা মিশিয়ে পানের উপযোগী করতে দেখা যায়।

অবশেষে অষ্টম দিনে আপনি টিমোচীনে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন, এটি পারস্য সীমান্তের উত্তরে অবস্থিত, এখানে অনেক শহর আর সেনানিবাস রয়েছে।* এখানে বিস্তৃত মনোরম একটা সমভূমি রয়েছে, জায়গাটাতে কেবল সূর্য গাছ নামের একটি প্রজাতি চাষ হয়, আর খ্রিস্টানদের কাছে ফলহীন শুকনো এই গাছটি আরবরি নামে পরিচিত। এই গাছের ধরন-ধারণ হলো : এটি লম্বা, কাণ্ড দীর্ঘ, পাতার উপরের দিকে সবুজ, কিন্তু নিচের দিকে সাদা অথবা নীলচে। এর বদ্ধ ক্যাপসুলগুলো কাঠবাদামের মতো বদ্ধ, কিন্তু ভেতরে কোনো ফল থাকে না, এর থেকে তুষ উৎপন্ন হয়। এর কাঠ খুব শক্ত আর মজবুত, দেখতে খোসার মতোই হলদে। এর কাছাকাছি আর কোনো গাছের প্রজাতি দেখা মেলে না। এখান থেকে দশ মাইল দূরে একটা বসতি রয়েছে, স্থানীয়েরা বলে এখানেই নাকি মেসিডোনিয়ার রাজা আলেকজান্ডার আর দারিয়াসের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

শহরে জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সব কিছুই পাওয়া যায়, এখানকার সরবরাহ ব্যবস্থাও খুব ভালো, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বলে শীত আর গ্রীষ্মের প্রকোপ ততটা নেই। লোকেরা মুহাম্মদান ধর্মের অনুসারী। সাধারণভাবে এরা খুবই সুন্দর জাতি, তবে আমার মতে, এখানকার মহিলারাই বিশ্বের সবচাইতে বেশি সুন্দরী।

---

* টিমোচিন [Tun-o-kain] মার্কো পলো ভয়াবহ শুষ্ক এই লবণ মরুর একটি অংশে ভ্রমণ করেছিলেন ইয়েলের এমন তত্ত্বের সপক্ষে হেনরি কর্ডিয়ার গধলড়ৎ ঝুশবং এবং ঝবাবহ ঐবফরহ এর লেখায় তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের উচ্চভূমি হতে মার্কো পলোর সম্ভাব্য এই পথ সম্পর্কে ঝবাবহ ঐবফরহ আলোকপাত করেছেন।

২৩
পাহাড়ি বুড়ো তার প্রাসাদ আর বাগান

এই দেশের কথা তো বলা হলো, এবার এখানকার পাহাড়ি এক বৃদ্ধের কথা বলা যাক। লোকটা যে জেলাতে থাকে তার নাম মুলিহেট, সারাসিনদের (ক্রুসেডের বিরুদ্ধচারীদের) ভাষায় এর মানে তান্ত্রিকতার ধারক, আর এখানকার লোকেদের তাই বলা হয় মুলিহেটোইট বা তান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী; আমরাও যেমন খ্রিস্টান তান্ত্রিকদের প্যাথরিনি বলে ডাকি। এখানকার প্রধানের সম্পর্কেও সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে মার্কো পলো এমন কথাই শুনেছেন।

তার নাম আলোয়াদিন, ধর্মে মুহাম্মদান। দুই পাহাড়ে ঘেরা মনোরম এক উপত্যকায়, সে বিলাসবহুল একটা বাগান গড়ে তুলেছে, তাতে সব ধরনের মজাদার ফল আর সুগন্ধি জন্মে। ভাগ ভাগ করে বিভিন্নভাবে এখানকার মাটি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই সঙ্গে স্বর্ণে অলঙ্কৃত, নকশায় চিত্রিত, সম্ভ্রান্ত আসবাবে খুব দক্ষতার সঙ্গে সেটা সাজানো হয়েছে। এর দালানের ভেতরে সর্বত্র ছোট ছোট নালা দিয়ে অনবরত ওয়াইন, দুধ, মধু আর খাঁটি জলের ঝরনাধারা বইছে।

এখানকার বাসিন্দারা সবাই অভিজাত, বাকিরা সুন্দরী কুমারী নারী, এরা সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আর নাচতে জানে, বিশেষত যারা প্রেমবিলাসী আর কামার্তভাবে কাউকে কাছে টানতে আগ্রহী। মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছেদে সেজেগুজে সব সময় এদেরকে বাগান আর চত্বরে খেলাধুলা বা ঘুরতে দেখা যায়, এদের মহিলা অভিভাবকেরা দরজার ভেতরে থাকে বলে, তাদের কখনো দেখা যায় না। এখানকার চিফ এই মনোমুগ্ধকর বাগানটি তৈরি করেছেন তার কারণ : মুহাম্মদকে তার স্রষ্টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেই তার আইন মান্য করবে তাকে তিনি স্বর্গের আনন্দ উপভোগের সুযোগ দিবেন, যেখানে সব ধরনের ইন্দ্রিয় সুখের সন্ধান মিলবে, সর্বত্র মনোলোভা রূপসী পরি ঘুরে বেড়াবে, লোকটা নিজেও যে একজন নবি অনুসারীদের কাছে এ কথা প্রমাণ করতে, নিজেকে মুহাম্মদের সঙ্গে তুলনা করতে এবং স্বর্গ তৈরির ক্ষমতা দেখে স্রষ্টা যেন তাকে সুনজরে দেখেন এ জন্য তিনি এটা নির্মাণ করেছেন।

এ কারণে তার অনুমতি ছাড়া কেউই সেই মনোরম উপত্যকায় প্রবেশ করতে পারে না, এর মুখে তিনি একটা সুরম্য অ-প্রবেশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন, সেটার গোপন পথ দিয়েই কেবল এর ভেতরে যাতায়াত সম্ভব। দরবারেও সবসময় একদল তরুণ-তরুণী এই প্রধানকে আনন্দ দেবার জন্য তৈরি থাকে, এদের বয়স বারো থেকে বিশের মধ্যে, বৈবাহিক আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিতে আশপাশের পাহাড়ের অসীম সাহসী এক শ্রেণির বাসিন্দাদের মাঝ থেকে লোক বাছাই করা হয়। নবির বর্ণনার সঙ্গে মিল রেখে প্রতিদিন তিনি এদের প্রবেশ অনুমোদন

করেন। এবং নির্দিষ্ট সময়ে একসঙ্গে এদের দশ-বারোজনকে আফিম গ্রহণ করানো হয়; যার অর্ধেকের মৃত্যু হয় ঘুমের মাঝে, তখন সেই মৃতদেহগুলোকে বাগানের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়।

২৪
কীভাবে বৃদ্ধ আততায়ীদের প্রশিক্ষণ দিতেন

মাদকের প্রভাব কেটে গেলে, আশপাশের সুন্দর সব জিনিস দেখে এদের অনুভূতি আনন্দে দিশেহারা হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই তাকে ঘিরে আমোদ-ফুর্তি করতে করতে নাচতে শুরু করে, এভাবে এদের সবাই তাকে মুগ্ধ করে নজর কাড়তে চেষ্টা করে; তাকে মজাদার খাবার আর কড়া ওয়াইন পরিবেশন করে; দুধ আর ওয়াইন খেতে খেতে আনন্দে মাতাল হবার আগ পর্যন্ত এসব চলতে থাকে, একপর্যায়ে স্বর্গে অবস্থান করছেন আপনা থেকেই সবার মনে এমন বিশ্বাসের জন্ম হয়, তাতে করে কেউই তখন সেই আনন্দ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না।

এভাবে চার-পাঁচ দিন পেরিয়ে যাবার পর আবারও তাদেরকে মাদক সেবন করিয়ে মাতাল অবস্থায় বাগানে নেয়া হয়। এরপর তারা এখন কোথায় আছে সবাইকে তিনি এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, তারা জবাব দেয়, "আপনার মতো মহিমান্বিতের করুণায়, স্বর্গে আছি" : এবং সবাই তখন আকুল হয়ে অবাক বিস্ময়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনতে থাকে।

এরপর চিফ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন : "আমরা আমাদের নবির কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পেয়েছি যেই তার প্রভুর সপক্ষে থাকবে তিনি স্বর্গের অধিকারী হবেন এবং তোমরা যদি আমার আদেশ মান্য করো, তাহলে তোমাদের জন্যেও এখানে অসীম সুখ অপেক্ষা করবে।" স্বাভাবিকভাবেই তার এ ধরনের কথায় তারা উৎসাহে নড়েচড়ে ওঠে, তাদের প্রভুর আদেশ শোনার অপেক্ষা করে এবং সেই নির্দেশ পালনে মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকে।

এখানকার রীতি হলো প্রতিবেশী কোনো রাজা বা অন্য কেউ চিফের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় করলে, তাকে প্রশিক্ষিত আততায়ীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়; ভয়ে কেউ তাই নিজের প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিতে চান না, ফলে কোনো প্রকার বাছবিচার না করেই চোখ বুজে সবাই তাদের কর্তার ইচ্ছা পূরণ করে। এ কারণে চারপাশের এলাকায় সব সময় একটা আতঙ্ক বিরাজ করে।

তিনি দু'জন প্রতিনিধিও নিয়োগ করেছেন। এদের একজনের বাস দামাস্কাস এবং অন্যজন থাকেন কুর্দিস্তানে; এরাও তার হয়ে তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তুলে। তাই সেই এলাকার কেউই পাহাড়ি সেই বৃদ্ধের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার আশা করতে পারে না।

২৫
কীভাবে সেই বৃদ্ধের পতন ঘটে

তার এলাকাটা গ্রেট খান মাঙ্গুর রাজ্যে আলাউতে অবস্থিত, রাজা তার এই নির্মম কাজকারবার সম্পর্কে জানতে পারে, সেই সঙ্গে জানতে পারে বৃদ্ধ তার দেশে ভ্রমণে আসা পর্যটকদের লুণ্ঠন করতে পথেঘাটে লোক নিয়োগ করে রাখে এবং ১২৫২ সালে এই চিফকে তার প্রাসাদের ভেতরে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে তিনি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তখনই প্রমাণ হয় লোকটা নিজেকে সুরক্ষা দিতে খুবই সক্ষম, কেননা টানা তিন বছর চেষ্টা করেও তাকে বন্দি করা সম্ভব হয়নি; অবশেষে সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য ও একপর্যায়ে হত্যা করা হয়। তারপর তার প্রাসাদটা গুঁড়িয়ে দিয়ে, বাগানটা ধ্বংস করে ফেলা হয়। সেই দিনের পর থেকে পাহাড়ে* কোনো বৃদ্ধ নেই।

২৬
মরুর পরে উর্বরভূমি আর সাপুরগান নগরের পথে

এই প্রাসাদ ছেড়ে, সড়ক প্রশস্ত একটা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে, তারপর গেছে টিলা আর খেজুরসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় একটা দেশের ওপর দিয়ে, জায়গাটায় চারিদিকে লতাগুল্ম আর সবুজ তৃণভূমির প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে প্রচুর ফলফলাদিও জন্মে, এ কারণেই আলাউ-এর সেনারা অনেক দিন ধরে ব্যারাকের বাইরে অবস্থান করতে সক্ষম। দেশটি পুরো ছয় দিনের যাত্রাপথের দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এতে অনেক শহর আর প্রাচীর ঘেরা জায়গা রয়েছে, আর এখানকার অধিবাসীরাও মুহম্মদান ধর্মের। এর পরই একটা মরুভূমি, প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে কোথাও জলের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই, ভ্রমণকারীদের তাই নিজেদের স্বার্থেই কথাটা মাথায় রাখতে হয়। জায়গাটা পেরিয়ে আসার আগে গবাদিপশুরাও পান করতে পারে না, পানি খুঁজে পেতে হলে তাদেরও বড় ধরনের অভিযানে নামতে হয়।

---

* গল্পটা একেবারে গাঁজাখুরি নয়। শত্রুর কবল হতে মিসর থেকে পালিয়ে এসে ১০৯০ সালে পারস্যের এলামুন্ট দুর্গটি কৌশল হিসেবে হাসান করায়ত্ত করে। তিনি ছিলেন শেখ-আল-জাবাল যার অনুবাদ একজন সার্বভৌম শাসক: ওল্ড ম্যান অন দ্য মাউন্টেইন, এন্ড দ্য ফার্স্ট অব দ্য সেক্ট অব এসাসিন। এসাসিন [হাশিশিন] শব্দটা এসেছে মাদক হাসিস থেকে, যা সেই তরুণ-তরুণীদের মাতাল করার কাজে ব্যবহৃত হতো। ১২৫৫ সালে সেই বৃদ্ধকে হত্যা করা হয় এবং এর পরের বছর সেই দুর্গে অভিযান পরিচালনা করে ১২০০ আততায়ীকে হত্যা করে পারস্যে তাদের ক্ষমতা চিরতরে লুপ্ত করে দেয়া হয়। গোত্রটির ছোট্ট একটি দল সিরিয়ার পার্বত্য এলাকার দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং ধারণা করা হয় এখনো তারা টিকে আছে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, দেখুন।

ছয় দিনের ভ্রমণ শেষে, সে সাপুরগান নামের একটা শহরে এসে হাজির হয়, যা সব ধরনের সরবরাহের যোগানে ভরপুর, বিশেষ করে জায়গাটিতে বিশ্বের সেরা তরমুজ জন্মে। সেসব আবার সংরক্ষণ করে রাখা হয়। আর তা করা হয় এভাবে, আমরা যেভাবে কুমড়া কাটি সেভাবে খুব পাতলা করে সর্পিল আকারে কেটে তারপর রোদে শুকানো হয়, তারপর বিক্রির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাঠানো হয়, মধুর মতো মিষ্টি বলে সেখানকার লোকেরা এই জিনিসের জন্য সব সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে। এখানে পশু আর পাখির এই উভয় ধরনের প্রচুর খেলাও রয়েছে।

এই জায়গাটা ছেড়ে, এবার আমরা বালাক নামের অন্য একটা জায়গার কথায় আসছি; এটা বিশাল এক নগর।

২৭
বালাক নগর

আগের মতোই এখনো বালাক গুরুত্বপূর্ণ এক নগরী, কিন্তু তাতারদের নির্মমতার ক্ষত বুকে নিয়ে সেটা টিকে আছে, তাদের বারবার আক্রমণের কারণ এখানকার দালানকোঠার একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানকার অনেক প্রাসাদই মার্বেলের তৈরি, আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সেসবের প্রশস্ত চত্বর এখনো দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, আলেকজান্ডার এই শহরেই সম্রাট দারিয়াসের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এখানেও মুহাম্মদের অনুসারীরা বসবাস করছে।

প্রাচ্যের তাতার সাম্রাজ্য এখান পর্যন্ত বিস্তৃত; আর এর সীমান্ত থেকেই পারস্য সাম্রাজ্য উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত।

বালাক ছেড়ে, আগের মতোই বারো দিনের পথ গেলে, একটি দেশ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানকার বসতির সর্বত্র দুঃখ আর দুর্দশার চিহ্ন, যারা একে এভাবে বিধ্বস্ত করেছে। সেই সব নির্বিচার খুনি শিকারিদের আক্রমণের ভয়ে এখানকার অধিবাসীদের সবাই পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় পালিয়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপদ করেছে। এখানে ব্যাপক পরিমাণে জল পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ধরনের খেলাও। এই অংশে বড় বড় সিংহও দেখতে পাওয়া যায়, যারা সংখ্যায় অনেক বেশি। তবে পাহাড়ি এলাকার বারো দিনের যাত্রায় রসদের ঘাটতি দেখা দিলে সেসবের সরবরাহ মেলা দুষ্কর, আর তাই পর্যটকদের তাদের পশুসহ নিজেদের জন্য সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ খাবারদাবার বহন করতে হয়।

২৮
থাইকান প্রাসাদ, লবণ পাহাড় আর স্ক্যাসেম প্রদেশের কথা

টানা বারো দিন ভ্রমণ শেষে একটা প্রাসাদের দেখা মিলে, নাম থাইকান, সেখানে শস্যের বিশাল এক বাজার বসে, কেননা সেটা সুজলা-সুফলা এক দেশে অবস্থিত। এর দক্ষিণের পাহাড়গুলো খুবই বৃহৎ আর উঁচু। এর সবগুলোতেই রয়েছে সাদা লবণ, যা খুবই শক্ত, এসব সংগ্রহের আশায় ত্রিশ-দিনের পথ পাড়ি দিয়েও লোকেরা এখানে আসে, কেননা একে বিশ্বের সবচাইতে খাঁটি লবণের ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়; কিন্তু একই সঙ্গে তা এতই শক্ত যে লোহার কুড়াল ছাড়া সেগুলো ভাঙা সম্ভব নয়। এর পরিমাণ এতই বেশি যে পৃথিবীর সব দেশে এখান থেকে লবণ সরবরাহ করা সম্ভব। অন্যসব পাহাড়ে কাঠবাদাম আর পেস্তা জন্মে, স্থানীয়েরা লাভের আশায় এখান থেকে তা সংগ্রহ করে।

থাইকান ছেড়ে, উত্তর-পূর্বে তিনদিনের পথের সবটাতেই লোকের বসতি, জায়গাটা খুবই সুন্দর, আর আঙুরসহ নানা ফল এবং শস্যে ভরপুর। লোকেরা মুহাম্মদান এবং রক্তপিপাসু আর প্রতারক। এরা নীতিভ্রষ্ট আর অতিরিক্ত মদ্যপও, নিজেদের তৈরি মিষ্টি ওয়াইন তাদের প্রেরণার উৎস। দশ বিঘত দড়ি ছাড়া তারা মাথায় আর কিছুই পরে না, সেটা মাথায় ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখে। এরা খুব পাকা খেলোয়াড়, আর সেই উদ্দেশ্যে অনেক বুনো জানোয়ার পোষে, নিজেদের শিকার করা পশুর চামড়া ছাড়া গায়ে অন্য কোনো পোশাক চড়াতে দেখা যায় না, সেসব উপকরণ দিয়ে তারা জুতাও প্রস্তুত করে। তাদের সবাই চামড়া প্রক্রিয়ার কৌশল জানে।

তিন দিনের ভ্রমণের এই সময় অনেক শহর আর প্রাসাদের দেখা মিলে, আর এর সব শেষের শহরটার নাম স্ক্যাসেম, একজন প্রশাসক কর্তৃক শাসিত, যার পদবি আমাদের ব্যারন বা কাউন্টের সমান; আর আশপাশের পাহাড় ছাড়াও তার মালিকানায় আরো বেশ কিছু শহর আর দুর্গও রয়েছে। শহরের মধ্যখান দিয়ে মাঝারি আকারের একটা নদী বয়ে গেছে। জায়গাটাতে সজারু পাওয়া যায়, শিকারিরা কুকুর লেলিয়ে দিবার পর তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, এদের ত্বক বড় বড় কাঁটায় আবৃত, যা মানুষ এবং কুকুর এই উভয়কেই জখম করার জন্য যথেষ্ট।

এই দেশের লোকেরা তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে, যা খুবই বিচিত্র ধরনের। যেসব রাখালেরা আশপাশের পাহাড়গুলো তাদের পশু চড়ায়, তারা পাহাড়ে গুহা তৈরি করে সেখানেই থাকে, সাধারণ মাটির হওয়ায় এবং পাথরের নয় বলে তাদের জন্য কাজটা খুব একটা কঠিন নয়।

জায়গাটা ছেড়ে আসার পর টানা তিন দিনের ভ্রমণে কেবল পানি ছাড়া, কোনো প্রকার দালানকোঠা বা প্রয়োজনীয় কিছু সংগ্রহ করার মতো কোনো জায়গা পর্যটকদের চোখে পড়ে না; কিন্তু ঘোড়া চড়াবার মতো যথেষ্ট তৃণভূমির সন্ধান

মিলতে পারে। তাই পথে দরকার হতে পারে এমন সব কিছুই সঙ্গে নিতে হবে। তিন দিনের এই যাত্রার শেষ দিন বালাসান প্রদেশে এসে পৌঁছানো যায়।

২৯
বালাসান প্রদেশ, সেখানকার মূল্যবান রত্ন আর নারীদের পোশাক

বালাসান প্রদেশের লোকেরা মুহাম্মদান, এখানকার স্থানীয়েরা নিজেদের অদ্ভুত ধরনের ভাষায় কথা বলে। জায়গাটা অনেক বড়, প্রায় বারো দিন ভ্রমণের সমান দৈর্ঘ্যের এবং এখানকার রাজারা বংশানুক্রমিকভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করে আসছেন, যাদের সবাই পারস্য সম্রাট দরিয়াসের কন্যা ও আলেকজান্ডারের বংশধর; জন্মের পর থেকেই সারাসেনিক ভাষায় তাদের সবার উপাধি হয় জুলকারনায়েন, যা আলেকজেন্ডারের উপাধির সমতুল্য।

দেশটিতে খুব উন্নত আর মহামূল্যবান বালাস নামের একধরনের রক্তিম রুবি পাওয়া যায়, এর থেকেই প্রদেশের এমন নামকরণ করা হয়েছে। উঁচু পর্বতের মাঝে সেগুলো প্রথিত রয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সিকিনাম নামের একটা মাত্র পর্বতেই এর খোঁজ পাওয়া গেছে। রাজার নিয়ন্ত্রণে সেই খনির কাজকারবার পরিচালিত হয়, স্বর্ণ এবং রুপার খনির ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে; এবং কেবল রাজার অনুমতিসাপেক্ষেই সেসব সংগ্রহ করা চলে; তাই বিশেষ রাজকীয় অনুমোদন ছাড়া কেউ সেসব উত্তোলন করতে পারে না।

ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ এবং অনুমোদন ব্যতীত রপ্তানি সম্ভব নয় বলে মাঝেমধ্যে এখানে আসা আগন্তুকদের উপহার হিসেবে রাজা এসব দিয়ে থাকেন। এ ধরনের বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করা হয়, এসব রুবি দেশের সম্পদ আর তাই এর সঙ্গে তার আস্থার বিষয়টি জড়িত বিধায় মূল্যায়ন এবং উচ্চ মূল্য বজায় রাখা হয়; কেননা অবিবেচকের মতো খনি খনন করতে দিলে এবং যে কেউ সেসব কিনে দেশের বাইরে গিয়ে বিক্রয় করতে পারলে, সহজপ্রাপ্যতার কারণে, শীঘ্র সেসব মূল্যহীন হয়ে পড়বে। এর কিছু কিছু তিনি অন্যান্য রাজা-বাদশাদের কাছে উপহার হিসেবে পাঠান; কিছু প্রেরণ করেন ঊর্ধ্বতন রাজার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে; এবং কিছু স্বর্ণ আর রৌপ্যের সঙ্গে বিনিময়ও করা হয়। কেবল এভাবে তিনি এর রপ্তানি অনুমোদন করেন।

জায়গাটিতে এ ধরনের আরো অনেক পাহাড় রয়েছে যেখানে বিশ্বের সবচাইতে উন্নত ধরনের গাঢ় নীল রঙের লেপিস লেজুলি পাওয়া যায়। একইভাবে এখানকার রুপা, তামা এবং সিসার খনি হতেও প্রচুর পরিমাণে খনিজ আহরিত হয়। দেশটি শীত প্রধান।

এখানে উন্নত প্রজাতির ঘোড়া জন্মে, এগুলো খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। এদের খুর এতই শক্ত যে তাতে আলাদা করে কৃত্রিম খুর পরাবার কোনো দরকার

হয় না। যেসব স্থানে অন্যান্য পশুরা চলাচল করতে পারে না সেসব জায়গা দিয়ে দ্রুত বেগে ধেয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা এখানকার স্থানীয়দের মধ্যে দেখা যায়। এদের দাবি কপালে বিশেষ চিহ্নওয়ালা আলেকজেন্ডারের সেই প্রসিদ্ধ ঘোড়া ব্যাসিফেলাসের জাতটি প্রদেশটিতে বেশ কিছুদিন আগেও পাওয়া যেত, এর পুরো জাতটির মালিক ছিলেন এখানকার রাজার মামা, যিনি, ভাগ্নেকে তা দিতে অস্বীকার করার পর হত্যার শিকার হন। এরপর তার বিধবা স্ত্রী সেই খুনির প্রতি প্রতিশোধ হিসেবে সেই পুরো জাতটিকে ধ্বংস করে ফেলেন; আর এভাবেই প্রজাতিটি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়।

এখানকার পাহাড়ে সাকের নামের এক প্রজাতির শকুন আছে, যা দেখতে খুবই চমৎকার আর উড়তেও দক্ষ; সেই সঙ্গে ধাড়ি শকুনও সংখ্যায় প্রচুর রয়েছে পরিমাণে। এখানে বিশুদ্ধ প্রজাতির ধাড়ি বাজপাখি ও স্প্যারো হকও দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা তাই একাধারে পশু আর পাখি শিকারে খুবই দক্ষ। এখানে উন্নত মানের গম এবং তুষহীন এক প্রজাতির বার্লির আবাদ হয়। এখানে জলপাইয়ের তেল মোটেই পাওয়া যায় না, তবে বিশেষ ধরনের বাদাম, আর তিসির মতো দেখতে তিল নামের একপ্রকার শস্য থেকে নির্যাসাকারে সেটা বের করে নেয়া হয়, তিসির সঙ্গে এর পার্থক্য হলো এর রং অনেকটা হালকা; আর এর থেকে উন্নতমানের তেল উৎপাদন সম্ভব আর এর ঘ্রাণও যেকোনো তেলের চাইতে বেশি। তাতারসহ এখানকার অন্যান্য বাসিন্দারা এই তেল ব্যবহার করে।

রাজ্যটি অসংখ্য গিরিখাত আর গিরিসঙ্কটে ঘেরা এবং গিরিপথ ধরে যাতায়াত করতে হয় বলে বৈরী মনোভাব নিয়ে কোনো বিদেশি শক্তির পক্ষে এখানে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। লোকেরা সুঠামদেহী আর চমৎকার খেলোয়াড়; সাধারণত বুনো পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরিধান করে। পাহাড়ে অসংখ্য ভেড়া চড়ে বেড়াবার মতো তৃণ-আচ্ছাদন বিদ্যমান, যেখানে দলে দলে বুনো ভেড়ারা চষে বেড়ায়, যার প্রতিটি দলে চার, পাঁচ বা ছয় শ'য়ের বেশি ভেড়া দেখতে পাওয়া যায়; আর প্রচুর পরিমাণে শিকারের পরও এদের সংখ্যা মোটেই কমতে দেখা যায় না।

এই পাহাড়গুলো খুবই উঁচু, এর কোনো একটির শিখরে আরোহণ করতে হলে যে কাউকে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একনাগাড়ে হাঁটতে হবে। এসব পাহাড়ের মাঝে রয়েছে ঘাস আর নানা ধরনের গাছগাছালি ছাওয়া বিস্তৃত সমতল, সেই সঙ্গে রয়েছে পাথরের ফাটল গলে অবিরাম বইতে থাকা বিশুদ্ধ জলের বিশাল বিশাল জলধারা, এইসব পাহাড়ি স্রোতধারায় রয়েছে মিঠা পানির হরেক প্রজাতির সুস্বাদু অনেক মাছ। এই সব পাহাড় চূড়ার বাতাস খুবই বিশুদ্ধ আর স্বাস্থ্যপ্রদ, শহর, সমতল আর উপত্যকার কেউ অসুখে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে উপশমের আশায় পাহাড়ে চলে যান, আর দু'চার দিন অবস্থানের পরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে দেখা যায়। মার্কো পলো জানিয়েছেন একবার তার নিজেরও এমন চমৎকার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়েছে; এই দেশে আসার পর থেকে বছর খানেক

অসুস্থ থাকায় তাকে পাহাড়ে গিয়ে বায়ু পরিবর্তনের কথা বলা হয়; খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি তখন সেই উপদেশ মেনে চলেন।

এখানকার উঁচু শ্রেণির মহিলারা কোমরে অদ্ভুত একধরনের পোশাক পরিধান করে, ষাট বা আশি এল (আগেকার দিনের কাপড় মাপার একক) খাঁটি সুতির কাপড় দিয়ে এর প্রতিটি বানানো হয়। কাপড়ের স্তূপে কটিদেশ যত বেশি স্থূল করতে পারে তাকেই এই অঞ্চলে সবচেয়ে সুশ্রী হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩০
দক্ষিণের ব্যাসিয়া প্রদেশ, স্থানীয়দের কানের দুল আর অন্যান্য রীতি

বালাসান ছেড়ে দক্ষিণে দশ দিনের পথ গেলে, ব্যাসিয়া প্রদেশের দেখা মিলে, এখানকার লোকেরা অদ্ভুত এক ভাষায় কথা বলে। এরা পৌত্তলিক; গায়ের রং কালো, বদমেজাজি এবং জাদুটোনায় ওস্তাদ, আর সব সময় শয়তানকে তুষ্ট রাখতে মন্ত্র উচ্চারণ করে বেড়ায়, আর সচরাচর অন্যের ওপর সেসব প্রয়োগ করে। এরা কানে সব সময় মণি-মুক্তাসহ মূল্যবান রত্ন খচিত সোনা, রুপার গহনা পরে থাকে। প্রদেশের কিছু অংশের আবহাওয়া খুবই উষ্ণ প্রকৃতির। এখানকার লোকেদের খাবার হলো মাংস আর ভাত।

৩১
দক্ষিণ-পূর্বের কেসমুর প্রদেশ

কেসমুর [কাশ্মীর] এমন একটা প্রদেশ যার দূরত্ব ব্যাসিয়া থেকে সাত দিন। এখানকার অধিবাসীরাও আজব একধরনের ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে। এদের সবাই-ই জাদুবিদ্যায় পারদর্শী; স্বভাবতই বোবা আর বধির হওয়ায় কথা বলতে অক্ষম হবার পরও এরা তাদের মূর্তিগুলোকে খুবই মান্য করে। একইভাবে এরাও দিনের আলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করাসহ আরো অনেক অলৌকিক* ভেল্কিবাজি দেখাতে সক্ষম। অনেক আগে থেকেই এরা পৌত্তলিক জাতি হিসেবে পরিচিত, আর এখান থেকেই অন্যান্য অংশে মূর্তি পূজার প্রসার ঘটে।**

এ দেশ থেকে জলপথে ভারত সাগরে যাতায়াতের একটি সুযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের গায়ের রং একটু চাপা হলেও তাকে একেবারে কালো বলা চলে না, আর এখানকার নারীরা কালো হলেও দেখতে সুন্দরী হয়। এরা ভাত আর অন্যান্য শস্য উপাদানের সঙ্গে মাংস খায়; সাধারণত পরিশ্রমী স্বভাবের।

---

* এই প্রদেশের জাদুকরেদের কুবলাই খানের দরবারে নিয়োগ করা হয়।

** কেসমুর [কাশ্মীর]-এর কেন্দ্র থেকে একসময় অনেক আশ্রমের বিচ্ছুরণ ঘটে এবং অনেক পবিত্র গ্রন্থ অনূদিত হয়।

আবহাওয়া মধ্যম ধরনের উষ্ণ। প্রদেশের রাজধানী ছাড়াও এখানে আরো অনেক শহর ও দুর্গ রয়েছে। এখানে বনবনানী, মরু-এলাকা, পার্বত্য গিরিপথসহ দুর্গম অনেক পাহাড়ি পথ রয়েছে, যা এখানকার বাসিন্দাদের বহিরাক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে। এদের রাজা অন্য কোনো ক্ষমতাধরের প্রতি অনুগত নন।

এদের মাঝে নির্দিষ্ট ধরনের ভক্ত শ্রেণির দেখা মিলে, যারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করে, পান, ভোজন আর কামসহ সব ধরনের ইন্দ্রীয় সুখে মিতাচার অবলম্বন করে, যাতে এর মাধ্যমে তাদের পূজনীয় মূর্তি দেবতার প্রতি কোনো ধরনের পাপাচার প্রদর্শিত না হয়। এখানকার লোকেরা অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচে।

তাদের বেশ কয়েকটি মঠ রয়েছে, যেখানে আমাদের যাজকদের মতোই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মীয় আচার পালন করা হয়ে থাকে। এখানকার স্থানীয়েরা কোনো প্রাণীকে বঞ্চিত করে না, রক্তপাতও করে না, তবে করলে কেবল মাংস ভক্ষণের প্রয়োজনেই কাজটা করে, আর অধিবাসীদের মধ্যকার মুসলমানদেরই কেবল পশুবধের প্রয়োজন হয়। ইউরোপ থেকে আনা কোরালের জিনিস এখানে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে বেশি দামে বিক্রয় করা যায়।

এভাবে একই দিকে এগোতে থাকলে, পথটা আমাকে ভারতে নিয়ে যেতে পারত; কিন্তু সেই সব বর্ণনা আমি এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য তুলে রাখছি; এবং এখন বালাসান ফিরে সেখান থেকে সোজা ক্যাথির [চায়না] পথ ধরার উদ্দেশ্যে দেশটির ডানে-বামে আরো যেসব জায়গাতে যেতে হয়েছিল সেসবের বর্ণনা তুলে ধরতে চাইছি।

৩২
পার্বত্য ভোখান প্রদেশ

বালাসান প্রদেশ ছেড়ে, উত্তর-পূর্ব আর পূর্বে যেতে থাকলে নদীর দু'ধারে অনেক বসতি আর প্রাসাদের দেখা মিলবে, জায়গাটা এখানকার রাজার ভাইয়ের, টানা তিন দিন ভ্রমণের পর, ভোখান নামের একটা প্রদেশে এসে পৌঁছাই; যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে তিন দিনের পথের সমান। এখানকার লোকেরা মুহাম্মাদান, এদের নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে, আচরণে সভ্য এবং বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, এখানকার প্রধান বালাসানের প্রতি অনুগত।

বুনো পশু ধরতে এরা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। এখান থেকে বেরিয়ে এসে, তিন দিনের পথ সামনে এগোলে, পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে, পথে একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে এলে, অবশেষে পথের এমন একটি অবস্থানে এসে পৌঁছা সম্ভব, যেখান এসে মনে হতে পারে, আপনি বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া দিয়ে ঘিরে আছেন। এখান থেকে সামান্য এগোলেই বিশাল একটা হ্রদের দেখা মিলবে, যেটা থেকে বড় একটা নদী সবুজে সমৃদ্ধ বিস্তৃত একটা সমতলের পানে বয়ে গেছে।

যার ওপর দশ দিনের মতো চড়ে বেড়াতে পারলে সবচাইতে শুকনো ভেড়াটাও যথেষ্ট মুটিয়ে যেতে সক্ষম।

এই সমতলটিতে তিনটি প্রাণী সবচাইতে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে বড় আকারের ভেড়া, এর শিং তিন, চার এমনকি সাত তালু পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। এদের রসদ সংগ্রহের জন্য রাখালেরা হাতা আর আধার তৈরি করে; এবং পশুগুলোকে ঘের দেবার জন্য ও নেকড়েদের থেকে নিরাপদ রাখতে এই একই ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে তাদের এরা বেড়া নির্মাণ করে। তাদের ভাষায় দেশটা নেকড়েতে ভরা আর এগুলো এখানকার আরো অনেক বুনো ভেড়া আর ছাগলপালের ধ্বংসের কারণ। এখানে প্রচুর পরিমাণে সেগুলোর হাড় আর শিং দেখতে পাওয়া যায়, পথের পাশে সেগুলো স্তূপ করে রাখা হয়, যাতে শীতকালে তুষারে আচ্ছাদিত পথঘাট পর্যটকরা খুব সহজেই চিনে নিয়ে পথ চলতে পারে।

সমতলের ওপর দিয়ে বারো দিনের বিস্তৃত পথ, একই দিকে পাহাড় আর উপত্যকার মাঝ দিয়ে একটানা আরো চল্লিশ দিন পথ চলতে হবে, বহু নদী আর মরুপথ পেরুতে হবে, সেই পথে কোনো লোকালয় বা সবুজের দেখা মিলবে না। তাই দরকারি সব কিছুই সঙ্গে করে বয়ে নেয়া চাই। এই জায়গাটির নাম বেলোরো। এসব পাহাড়ের চূড়ায় বৈরীভাবাপন্ন, আর পৌত্তলিক এক আদিম গোত্রের বাস, এরা শিকারের পশুর ওপর নির্ভরশীল আর সেগুলোর চামড়া জামা হিসেবে পরিধান করে।

৩৩
কাশকার নগর আর সেখানকার লোকেদের ব্যবসা-বাণিজ্য

অবশেষে আপনি এমন একটি জায়গাতে গিয়ে পৌঁছবেন যার নাম কাশকার [কাশগার]।* জানা যায় জায়গাটি আগে সার্বভৌম একটি রাজ্য ছিল কিন্তু বর্তমানে এটি গ্রেট খানের অধীনস্ত। এখানকার অধিবাসীরাও মুহাম্মাদান। প্রদেশটি অনেক বড় এবং এতে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে, যার মাঝে কাশকার বৃহত্তর এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার ভাষাও তাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। সাধারণত ব্যবসা আর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এখানকার লোকেরা জীবিকা নির্বাহ করে, বিশেষ করে তুলার।** এখানকার লোকেদের খুব সুন্দর সুন্দর খামার, আঙুর আর ফলের বাগান রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়, সেই সঙ্গে জন্মে মসিনা আর শণও; কিন্তু সত্যি করে বলতে গেলে এরা আসলে খাওয়া আর

---

* কাশগার এখনো চীনের সর্বপশ্চিমের শহর হিসেবে টিকে আছে। ১১৬৫ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এটি রাশিয়ার অধীনে ছিল।

** রাশিয়ার অধীনে যাবার আগপর্যন্ত এখানে এই শিল্পটি টিকে ছিল।

পানে[***] মত্ত ভাগ্যপীড়িত এক শোচনীয় জাতি। মুহাম্মদান ছাড়াও এখানে বেশ কিছুসংখ্যক নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান বাস করে, যাদের নিজেদের আইনের অধীনে জীবনযাপনের অনুমতি রয়েছে এবং নিজস্ব চার্চও আছে। প্রদেশটি দৈর্ঘ্যে পাঁচ দিনের পথ বিস্তৃত।

৩৪

ইয়ারকান শহর এবং সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট চার্চের বিস্ময়কর স্তম্ভ

ইয়ারকান [ইয়ারকান্দ] একটি বিখ্যাত শহর, এটি সুশোভিত বাগানে অলঙ্কৃত, আর সমতলে ঘেরা, জায়গাটিতে কারো ধারণা করা সম্ভব না এমন সব ফল ফলফলাদি জন্মায়। অধিবাসীদের কিছু খ্রিস্টান, কিছু মুসলমান, এটি গ্রেট খানের ভাগ্নের রাজ্যের অধীন, তবে সেই অধীনস্ততা খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়, তাই দু'পক্ষের ধ্যে সব সময় দাঙ্গা-ফ্যাসাদ লেগেই থাকে। শহরটা উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানকার একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা জানা যায়। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, এখানে জাগাতা'ই নামের এক রাজপুত্র জন্মে, যিনি নিজ ভাইয়ের পর গ্রেট খানের দ্বারা রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন এবং এর পরপরই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এতে এখানকার রাজার অধীনস্ত খ্রিস্টানেরা প্রচণ্ড খুশি হয়ে, একটা চার্চ নির্মাণ করার পর, সেটা সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্টকে উৎসর্গ করে।

এটা এমনভাবে বানানো হয় যাতে এরবৃত্তাকার ছাদের সমস্ত ভর গিয়ে ঠেকে মাঝখানের স্তম্ভে, আর সেটার নিচে ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করা হয় একটা বর্গাকার পাথর, যেটা রাজার অনুমতি নিয়ে আনা হয়েছিল মুসলমানদের একটা মসজিদ থেকে। তারা তখন এতে বাধা দিতে সাহস করেনি। কিন্তু জাগাতা'ই-এর মৃত্যুর পর তার ছেলে খ্রিস্টান হবার কোনো ধরনের আগ্রহ না দেখালে, মুসলমানেরা তখন তার কাছ থেকে এমন আদেশ পাবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে, যাতে বিরোধীরা তাদের সেই পাথরখানা ফেরত দেয় এবং পরবর্তীতে তারা এর জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে অর্থ দেবারও প্রস্তাব করে, সঙ্গত কারণেই তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কেননা তাদের ধারণা এটা সরালে চার্চটা ধসে পড়তে পারে।

এই অবস্থায় খ্রিস্টানদের তাদের সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট বরাবর চোখের জল ফেলা আর তাদের এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্য অনুনয়-বিনয় জানানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অবশেষে পাথরটি উদ্ধারের দিন, পিলারটা তার ভিত্তি থেকে তিন বিঘত উঁচুতে উঠে যায়, যাতে নির্বিঘ্নে পাথরটা সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া যায়। সেই অবস্থায় পিলারটা আজও সেখানেই রয়েছে।

এসব নিয়ে যথেষ্ট বলা হলো, এবার আমরা কারকান প্রদেশের দিকে অগ্রসর হবো।

*** তাদের আচরণের এখনো কোনো ধরনের উন্নতি ঘটেনি। স্যার আউরেল স্টেইন রচিত এনস্যান্ট খোতান, দেখুন।

৩৫

কারকান প্রদেশ, যেখানকার অধিবাসীরা পা ফোলা আর গলগণ্ডে আক্রান্ত

সেখান থেকে চলে আসার পর কারকান [ইয়ারকান] নামের আরেকটা প্রদেশে প্রবেশ করবেন, যা পাঁচ দিন ভ্রমণের সমান দূরত্বে অবস্থিত। এখানকার বেশিরভাগ এলাকার লোকেরা মুসলমান, সেই সঙ্গে কিছু নেস্টরিয়ান খ্রিস্টানও রয়েছে, যারা গ্রেট খানের অধীনস্ত। তুলার মতোই, বাদবাকি দরকারি সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

লোকেরা দক্ষ কারিগর। এদের সবাই কমবেশি পা ফোলা আর গলগণ্ডে আক্রান্ত, তারা যে পানি পান করে তার মানের জন্যই এমনটা ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।* এখানে বলার মতো মূল্যবান তেমন কিছুই দেখতে পাওয়া যায়নি।

৩৬

কোটান নগর যেখানে জীবনের সব উপাদানের দেখা মেলে

সেখান থেকে উত্তর-পূর্ব আর পূর্বে দিকে এগিয়ে আসলে, আপনি কোটান [খোতান] প্রদেশে এসে পৌঁছবেন, যা আট দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা গ্রেট খানের এলাকাধীন এবং এখানকার লোকেরা মুহাম্মাদান। এখানেও অনেক শহর আর দুর্গ রয়েছে। কিন্তু প্রধান শহর হলো কোটান আর এর থেকে প্রদেশের নামকরণও করা হয়েছে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন তেমন সব কিছুই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে তুলা, মসিনা, শণ, শস্য, ওয়াইনসহ অন্যান্য আরো অনেক ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। এখানকার বাসিন্দারা তাদের আঙুর ক্ষেত আর খামারে চাষাবাদ করে। এছাড়াও নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন আর ব্যবসাপাতি করেও তারা জীবিকা নির্বাহ করে, তবে এরা সৈনিক হিসেবে তেমন একটা ভালো নয়। এবার আমরা পেইন নামের একটা প্রদেশের কথা বলব।

৩৭

পেইন প্রদেশ, এখানকার নদীর স্ফটিক আর আজব বিয়ে

পেইন [পেইন] পূর্ব-উত্তর-পূর্বে পাঁচ দিনের পথের দৈর্ঘ্যের একটি প্রদেশ। এটি গ্রেট খানের অধীন একটি রাজ্য, জায়গাটিতে অনেক শহর আর দুর্গ রয়েছে, যার প্রধানটির নামে প্রদেশটির নামকরণ করা হয়েছে। এর মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া

---

* সভেন হেডিন, ১৮৯৫ সালে ইয়ারকান্দ গিয়েছিলেন, তিনি জানান সেখানকার দেড় লাখ বাসিন্দাদের তিন-চতুর্থাংশ গলগণ্ডে আক্রান্ত। মাই লাইফ এজ এন এক্সপ্লোরার।

নদীতে চেলসেডনি আর জেসপার** নামের স্ফটিক পাথর পাওয়া যায়। জীবনযাত্রার সব ধরনের জিনিসপত্রই এখানে পাওয়া যায়। দেশটিতে তুলাও উৎপাদিত হয়।

অধিবাসীরা পণ্য উৎপাদন আর ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে একটি রীতি প্রচলিত আছে, আর তা হলো কোনো বিবাহিত ব্যক্তি যদি বাড়ি থেকে দূরে কোথাও ভ্রমণে গিয়ে বারো দিনের বেশি অবস্থান করেন, তার স্ত্রী তখন অন্য একজন স্বামীগ্রহণ করার অধিকার অর্জন করেন; আর পুরুষদের জন্যেও এই একই নিয়ম অনুসারে সেই স্বামীটিও তখন যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে অন্য আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। এর আগে উল্লেখ করা প্রদেশ সম্পর্কে বলা যায়, কাশকার, কোটান, পেইন এবং দূরবর্তী মরু লোপ, এই জায়গাসমূহ সবই তুর্কিস্তানের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত। এরপর চারচান প্রদেশ সম্পর্কে বলা যাক।

৩৮
চারচান প্রদেশ

পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত চারচানও তুর্কিস্তানেরই একটা প্রদেশ। আগে এটি অনেক সমৃদ্ধ আর উৎপাদনশীল একটি স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু তাতারদের কারণে তা পরিত্যক্ত জায়গাতে পরিণত হয়েছে। এখানকার লোকেরা মুহাম্মদান। আগের মতোই এর প্রধান শহরের নাম চারচান। প্রদেশটির ভেতর দিয়ে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের স্রোতধারা বয়ে গেছে, এগুলোতেও চেলসেডনি আর জেসপার পাওয়া যায়, যা বিক্রির জন্য ক্যাথিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রয়যোগ্য বাণিজ্যিক পণ্যের উদ্বৃত্ত অংশ।

পেআইনসহ আশপাশের জেলা এবং এই পুরো অঞ্চল বালুময়, যার কারণে এখানকার পানি তেতো স্বাদযুক্ত এবং পানের অযোগ্য, যদিও নির্দিষ্ট কিছু জায়গাতে তা সুমিষ্ট এবং ভালো। একবার তাতার সেনাবাহিনীর একটি দল জায়গাটি অতিক্রম করার সময়, সেখানকার অধিবাসীরা ভাবে যদি এরা শত্রু হয় তাহলে তারা লুণ্ঠন চালাবে আর তাদের পশুগুলো বধ করে খেয়ে নিবে। এই ভয়ে সৈনিকদের কাউকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পরিবার আর গবাদিপশু নিয়ে বালুময় মরুর দিকে পালাতে শুরু করে এবং দু'দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার সেই পথের অনেক জায়গাতে তারা স্বাদু পানির সন্ধান পায়, ফলে সে যাত্রায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়। এভাবে যখন-তখন আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় ফসল তোলার সময়, তারা তাদের শস্য বালির গর্তে সঞ্চয় করে; এবং ভোগের জন্য যতটা পারা

---

* চেলসেডনি আর জেসপার = রত্ন জেডের প্রকারভেদ।

যায় প্রতি মাসে তা সেখান থেকে সংগ্রহ করে। তাদের কাছের লোক ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই সেই জায়গার খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়, কেননা তাদের পায়ের ছাপ খুব শীঘ্রই বাতাসে মিলিয়ে যায়।

চারচান ছেড়ে যাবার পাঁচ দিনের পথের খুব স্বাভাবিকভাবেই পানির দেখা মিলে, তবে সর্বত্রই সেই জল পানের অযোগ্য নয়। কিন্তু সেটা নিয়ে মন্তব্য করারও খুব বেশি একটা সুযোগ থাকে না। টানা পাঁচ দিন পথ চলার পর বিশাল মরুর সীমান্তে লোপ নগরের দেখা মিলবে।

৩৯

লোপ নগর, বিশাল মরু আর বিস্ময়কর শব্দ

উত্তর-পূর্বে মহামরু লোপ-এর শুরুর একেবারে কাছাকাছি জায়গাতে লোপ নগর অবস্থিত। এটা গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অধীন এবং এখানকার অধিবাসীরা মুহাম্মদান ধর্মের অনুসারী। যেসকল পর্যটকেরা মরুটি অতিক্রম করতে চান তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট একটা সময় এখানে অবস্থান করতে হয়, বিশ্রামসহ বাকি পথ পাড়ি দেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা বেশ কয়েকটা শক্ত-সমর্থ গাধা আর উটের পিঠে রসদপাতি আর ব্যবসার পণ্য চড়ায়। এখান থেকে যাবার আগে সঙ্গে আনা আগেকার দু'ধরনের পশুই বধ করে খেয়ে নিতে হয়, কিন্তু সাধারণত এখানে গাধার সঙ্গে উটও কাজে লাগানো হয়, কেননা এরা খুব ভারী বোঝা বইতে সক্ষম আর খাদ্য হিসেবে খুব সামান্য পরিমাণ রসদ ব্যবহার করে।

রসদের সেই মজুদ নিয়ে মাস খানেক অপেক্ষার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, তার কারণ মরুর সংকীর্ণ এই অংশ অতিক্রম করতে নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতে হয়। তা না হলে এই পথে ভ্রমণের চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে, তাতে করে এক বছরের কিছু কম সময় সেখানেই ব্যয় হয়ে যেতে পারে এবং এমন দীর্ঘ সময়ের একপর্যায়ে সঙ্গে বহন করা মজুদ অপর্যাপ্ত ঠেকবে। এই ত্রিশ দিনের যাত্রায় নিয়ত বালুময় সমতল নতুবা ঊষর পাহাড়ি ঢাল বেয়ে পথ চলতে হবে; কিন্তু প্রতিদিনই দিন শেষে আপনাকে এমন একটা জায়গাতে গিয়ে থামতে হবে যেখান থেকে জল সংগ্রহ করা সম্ভব; তবে সত্যি বলতে কি অধিকসংখ্যক লোকের জন্য তা পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু শ'খানেক লোক আর তাদের সঙ্গে থাকা ভারবাহী পশুদের তৃষ্ণা মেটাতে সেটুকুই যথেষ্ট। এ রকম তিন-চারটি জায়গার পানি লবণাক্ত আর তেতো স্বাদযুক্ত হলেও, বাকি আরো বিশটির পানি মিষ্টি আর ভালো। এই পথে কোনো পশুপাখির দেখা মিলবে না, কেননা এখানে তাদের জন্য কোনো ধরনের খাবার নেই।

শোনা যায়, এই মরু নাকি আবার দুষ্ট-আত্মায় ভরা, তারা নাকি তাদের মায়ার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করে পর্যটকদের ধ্বংস ডেকে আনে। যদি, দিনের বেলায় কেউ ঘুমিয়ে থাকার কারণে বা প্রাকৃতিক কাজে সাড়া দিতে গিয়ে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ততক্ষণে তার কাফেলা পাহাড় পেরিয়ে গেলে, তাদের অনেকেই শুনতে পায় কেউ যেন তাদের নাম ধরে ডাকছে, আর সেই গলার স্বর তাদের কাছে পরিচিত ঠেকে। কখন সঙ্গীদের কেউ ডাকছে সেটা মনে করে সেদিকে গিয়ে পথ হারিয়ে অনেকেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। আর রাতের বেলাতে পথের দু'ধারে বিশাল অশ্বারোহী দলের পদশব্দ আর একধরনের গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায় এবং সেই পায়ের আওয়াজ ও শোরগোলকে নিজের দলের উপস্থিতি ভেবে নিয়ে সেই দিকে তাদের পিছু নেওয়াকেই যুক্তিযুক্ত মনে করা হয়। কিন্তু ভোর হবার পর, দেখা যায় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। কখনো কখনো এই একইভাবে দিনের বেলাতেই এই দুষ্ট-আত্মা সঙ্গী ভ্রমণকারীদের সাজে সামনে এসে হাজির হয়ে, নাম ধরে ডেকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কারো কারো কাছ থেকে এমনও শোনা গেছে যে, মরুর মাঝ দিয়ে ভ্রমণের সময়, একজন একদল সশস্ত্র লোক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং আক্রান্ত হবার ভয়ে আর লুটের আশঙ্কায় তখন তারা পালাতে শুরু করে। এভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে ফিরে যাবার ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ না করায়, তাদের অত্যন্ত করুণভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সত্যিই চমৎকার আর মরুর আত্মা নিয়ে এমন জমকালো আরো অনেক গালগল্প এখানে ছোঁয়াচে একটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। জানা যায়, কোনো কোনো সময় বাতাসে সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ভেসে বেড়ায় এবং সেই সঙ্গে ড্রাম আর হাতে তালিও শুনতে পাওয়া যায়; এতসব অভিযাত্রীদের একই রেখায় পথ চলতে আর ঘেঁষা-ঘেঁষি করে অগ্রসর হতে বাধ্য করে। রাতে বিশ্রামে যাবার আগে আগাম সতর্কতার অংশ হিসেবে, একটা অগ্রবর্তী সংকেত স্থাপন করে রাখে, যা দেখে বোঝা যায় এর পর তারা কোন দিকে যাবে, সেই সঙ্গে প্রতিটা ভারবাহী পশুর সঙ্গে একটা করে ঘণ্টা বাঁধে যাতে তাদের আরো সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এই মরু-পথে* অনতিক্রম্য এমন আরো অনেক সমস্যা আর বিপদের মুখোমুখি হবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হয়

---

* এখনো পর্যন্ত ছড়ানো-ছিটানো এই সব হাড় আর পরিত্যক্ত আবর্জনাময় মরুপথ খুব কম পর্যটকই অতিক্রম করেছে আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে এমন একটা জনশূন্য মরুভূমির সীমান্তে থাকা লোকেরা দুষ্ট-আত্মায় বিশ্বাস করবে। সেই সব বাদ্যযন্ত্র আর ড্রামের আওয়াজ আসলে মরুভূমির বালিয়াড়ি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসে বালির আলোড়নে বালির ঢিবি থেকে এ ধরনের শব্দ তৈরি মরুভূমির একটা নিয়মিত ঘটনা। ইয়েলের নোট এবং কর্ডিয়ারের লেখা উট্রাস এন্ড এডেনডাস দেখুন।

৪০
টাঙ্গুথ প্রদেশের সাচিওন শহর

মরুর ওপর দিয়ে টানা ত্রিশ দিনের ভ্রমণ শেষ হলে, আপনি একটি শহরে এসে পৌঁছাবেন, যার নাম সাচিওন [সাচিউ], যা গ্রেট খানের মালিকানাধীন। এখানকার প্রদেশের নাম টাঙ্গুথ। এখানকার লোকেরা পৌত্তলিক। এদের মাঝে কিছু নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান আর কিছু মুসলমানসহ কিছু তুর্কমেনও রয়েছে। তবে পৌত্তলিকদের ভাষা অন্যদের থেকে আলাদা আর বৈশিষ্ট্যসূচক। শহরটা পূর্ব-উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত। এরা কেউ ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তবে চাষবাসের মাধ্যমে প্রচুর গম উৎপাদন করে।

এই দেশে অনেক আশ্রম আর ধর্মালয় রয়েছে, যেগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। লোকেরা এই মূর্তিগুলোকে অত্যন্ত ভক্তি করে আর শ্রদ্ধার চোখে দেখে, এগুলোর প্রতি তারা বলি উৎসর্গ করে; এবং পুত্র সন্তান জন্মাবার পর, এই সব মূর্তির কোনো একটির কাছে তারা তার সুরক্ষা ভিক্ষা করে। সেই দেবতার সম্মানে উক্ত পুত্রের পিতা তার ঘরে এক বৎসর যাবৎ একটা ভেড়া পুষেন, বছর গড়াবার পর, কাঙ্ক্ষিত দিনে দেবতার বিচিত্র উৎসবে, তারা তাদের পুত্র আর সেই ভেড়াকে দেবতার সামনে হাজির করে পশুটাকে তার সামনে উৎসর্গ করে। সেটার গোস্ত সেদ্ধ করে সেই মূর্তির সামনে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে তার কাছে তাদের পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করে; তাদের বিশ্বাস এই ফাঁকে তা সেই মাংসের রসনারোচক অংশ শুষে নেয়। তারপর এর বাকিটা তারা বাড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে সব বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনসহ উৎসবমুখর পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে খায়। আর হাড়গুলো সুন্দর একটা পাত্রে সংরক্ষণ করে রাখে। সেই দেবতার পুরোহিত সেখান থেকে মাথা, পা, ভুঁড়ি, চামড়া আর মাংসের কিছু অংশ পায়।

একইভাবে, মৃতের সম্মানে এই সব মূর্তি উপাসকরা নির্দিষ্ট উৎসব পালন করে। উচ্চপদস্থ কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ পোড়ানোর উদ্দেশ্যে, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করে রাশিচক্র অনুসারে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করে তারপর মৃতের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। যদি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক না থাকে তাহলে মৃতদেহ সপ্তাহখানেক বা তার চাইতে বেশি সময়ের জন্য রেখে দেয়া হয়, কখনো কখনো গ্রহ-নক্ষত্র অনুসারে সৎকার অনুষ্ঠানের অনুমোদন না মেলায় ছয় মাসেরও অধিককাল ধরে তা রেখে দেয়া হয়। ধারণা করা হয়, গ্রহ-নক্ষত্রের সঠিক অবস্থান অনুসারে মৃতদেহ পোড়ানো না হলে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

তাই দীর্ঘদিন ধরে মৃতদেহ ঘরে রাখার জন্য পচন ঠেকাতে তারা পুরু কাঠের তক্তা দিয়ে কফিন প্রস্তুত করে, তাতে শবদেহ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে

মিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত আঠা, কর্পূরসহ অন্যান্য মাদক যোগ করে বাইরের দিকে রং করা হয়। কফিনের জোড়ায় তারা পিচ আর চুনাপাথরের মিশ্রণের প্রলেপ দিয়ে সেটাকে সিল্কে আবৃত করে রাখে। এই সময়টাতে প্রতিদিন খাবার টেবিলে রুটি, মদসহ অন্যান্য সব ধরনের খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখা হয়, ধারণা করা হয় মৃতের আত্মা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পরিবেশিত খাবার আর পানীয় গ্রহণ করে নিজেতে পরিতৃপ্ত করে। কখনো কখনো গণকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে এ কথাও বলে দেন যে শবদেহ বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বের করা উচিত হবে না, সেটা করা হলে অশুভ কিছু ঘটতে পারে, তখন সেটা বাড়ির অন্য দিক দিয়ে বাইরে বের করা হয়। এ ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃতদেহ ঘরের দেয়াল ভেঙেও বা আলো প্রবেশের ফাঁক দিয়েও বের করা হয়; এ সময় তাদের বোঝানো হয়, সেটা না করা হলে মৃতের আত্মা পরিবারের কারো ক্ষতি করবে।

একইভাবে, কোনো বাড়িতে দুর্ভাগ্যজনক কোনো ঘটনা ঘটলে, বা বাড়ির মালিক কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে বা তার অকালমৃত্যু হলে, গণকেরা তখন এর জন্য মৃতের সেই আত্মীয়ের জন্মগ্রহের প্রভাবের সাথে মিল না রেখে সৎকার অনুষ্ঠান করা বা সঠিক দরজা দিয়ে মৃতদেহে বের না করাকে দায়ী করেন।

শহর ব্যতীত অন্য কোথাও সেই মৃত পোড়াবার অনুষ্ঠান করতে হয় বলে, তারা সড়কের ওপর দিয়ে শোভাযাত্রাসহকারে সেখানে শব বয়ে নিয়ে যায়, আর যাবার সময় পথের দু'ধারে প্রতিটি কাঠের বাড়ির সামনে পৌঁছাবার পর থামে, তারা তখন মৃতের সামনে মদ আর মাংস পরিবেশন করে। নির্ধারিত জায়গাতে পৌঁছাবার আগ পর্যন্ত এমনটা চলতেই থাকে, বিশ্বাস করা হয় এর মাধ্যমে মৃতের আত্মা সতেজ হয়ে ওঠে ও সৎকারের স্তূপে উপস্থিত থাকার জন্য শক্তি সংগ্রহ করে। এই উদ্দেশ্যে আরো একটা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তারা নির্দিষ্ট গাছের বাকলে তৈরি বেশ কিছু কাগজের টুকরো জোগাড় করে, যার ওপর নারী, পুরুষ, ঘোড়া, উট, টাকা, পয়সা আর পোশাকে ছবি আঁকা থাকে, সেগুলোও মৃতের সঙ্গে এই বিশ্বাসে পোড়ানো হয় যে পরজগতে মৃত সেই সব বস্তু উপভোগ করতে পারবে। এইসব আচার-অনুষ্ঠানের সবটাতেই সেখানকার প্রচলিত সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র উচ্চনাদে বাজানো হয়ে থাকে।

এবারে উত্তর-পশ্চিমের মরুর একেবারে শেষ মাথায় অবস্থিত অন্য একটা শহরের কথা শোনা যাক।

৪১
কামুল জেলা আর সেখানকার আজব নিয়ম

গ্রেট খানের শাসনাধীন বৃহত্তর প্রদেশ টাঙ্গুথ-এ অবস্থিত একটি জেলার নাম কামুল। এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে, যার প্রধানটির নামও কামুল। জায়গাটি

দুই দুইটা মরুভূমির মাঝখানে অবস্থিত। বলার অপেক্ষা রাখে না এদেরই একটি সুবিশাল মরুভূমির বর্ণনা ইতোমধ্যেই আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর বাকিটা মোটে তিন দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিবাসীরা পৌত্তলিক, সেই সঙ্গে নিজস্ব অপরিচিত এক ভাষায় কথা বলে। এখানকার লোকেরা ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করে, জায়গাটিতে সেসব প্রচুর পরিমাণে ফলে, বিধায় তারা পর্যটকদেরও প্রয়োজনমতো সরবরাহ করতে সক্ষম। এখানকার লোকেরা আনন্দ-ফুর্তিতে আসক্ত, তাই নৃত্য, গান, বাজনা, পড়া এবং লেখার চর্চাসহ সব ধরনের আমোদ-প্রমোদের পেছনে সময় ব্যয় করতে পছন্দ করে।

অপরিচিত কেউ এলে, খুব সম্মানের সঙ্গে তাকে নিজগৃহে স্থান করে দেয়। এখানকার লোকেরা তাদের অতিথির সব ধরনের ইচ্ছা পূরণে গঠনমূলকভাবে তাদের বউ, মেয়ে, বোনসহ অন্যান্য নারী আত্মীয়দের আদেশ-নির্দেশ প্রদান করে থাকে। এই সময়টাতে তারা বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে যান, সেই ভিনদেশি তখন তাদের নারীর সঙ্গে নিজের স্ত্রীর মতোই বসবাসের সুযোগ পান এবং চাওয়া মাত্র তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই পান; কিন্তু বুঝে নিতে হবে, এর বিনিময়ে, তারা অর্থ প্রত্যাশা করে : ভিনদেশি তাদের সঙ্গে থাকাকালীন তারা আর বাড়ি ফিরে আসে না। পরিবার কর্তৃক ছেড়ে যাওয়া এই নারীদের কাছ থেকে আকস্মিক অতিথি ঠিক নিজের বউয়ের মতোই একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা আর প্রশ্রয় ভোগ করে, তাদের মান-সম্মান-যশ তখন তাদের ওপর অর্পিত হয়; দীর্ঘ যাত্রায় বিধ্বস্ত হওয়া অবসাদ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাওয়া এই সব ভিনদেশিরা তাদের কাছ থেকে ঠিক নিজেদের স্ত্রীর মতোই অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। সত্যি করে বলতে গেলে, এখানকার মেয়েরা আসলে খুবই সুন্দরী, খুবই ভোগবিলাসী এবং স্বামীর আদেশে যেকোনো কিছু প্রস্তুত।

একবার এই প্রদেশে মঙ্গু খানের দরবার বসলে, দেশটির এমন গর্হিত প্রথার কথা তার কানে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কামুলের লোকেদের জন্য অবমাননাকর এ ধরনের কর্ম ত্যাগ কারার আদেশ দেন এবং সবাইকে এভাবে ভিনদেশিদের কাছে ভাড়া খাটাতে নিষেধ করেন, তবে পর্যটকদের আহার আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন, টানা তিন বছর ধরে সেখানকার অধিবাসীরা প্রচণ্ড মর্মপীড়ার সঙ্গে তাদের প্রভুর আদেশ পালন করেন; কিন্তু পরবর্তীতে গাছে ফল না আসায় এবং তাদের পরিবারে বহু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটায়, তারা মঙ্গু খানের কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে সেই লোক তাদের হয়ে সেখানকার লোকেদের আগেকার সেই পৈতৃক প্রথায় ফিরে যাবার ব্যাপারে কথা বলতে পারে, যে প্রথা তারা সুপ্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে পেয়ে এসেছে। এবং বিশেষ করে যেদিন থেকে তারা ভিনদেশিদের প্রতি আতিথ্য আর তাদের সন্তোষবিধানে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন থেকেই তাদের পারিবারিক লাভালাভের বিষয়টি বলতে গেলে একপ্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। খান, তাদের এমন

আবেদনের কথা শুনে, জবাবে বলেন : "যেহেতু তোমরা তোমাদের নিজেদের লজ্জাজনক পরিস্থিতি ধরে রাখতে এতটাই নাছোড়বান্দার মতো অটল রয়েছ, সেহেতু তোমরা তা যেমন ইচ্ছে তেমনি চালিয়ে যেতে পারো। যাও, নিজেদের প্রথা আর আচরণ অনুসারে বসবাস করো গিয়ে, আর নিজেদের বউদের ভিক্ষুকের মতো পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে মজুরি কামাই করতে দাও।" এই জবাব নিয়ে তাদের সেই প্রতিনিধি বাড়ি ফিরে আসে, এতে লোকেরা সবাই খুব আনন্দিত হয়, যারা, আজ পর্যন্ত, তাদের সেই প্রাচীন প্রথা চর্চা করছে।

৪২
চিনচিতালাস নগর

কামুল জেলার পরই চিনচিতালাস, এটা সেই মরুভূমির উত্তর সীমান্তে অবস্থিত এবং এর বিস্তার ষোল দিনের পথের সমান। এর মালিক গ্রেট খান এবং এখানে বেশ কয়েকটা শহর আর দুর্গ রয়েছে। এখানে তিন ধর্মের অধিবাসীদের বসবাস। এদের সামান্য একটি অংশ খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী, যাদের সবাই নেস্টরিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী, অন্যেরা মুহাম্মাদান, তৃতীয় দলটি পৌত্তলিক। এই জেলাতে একটা পাহাড় আছে, যেখানকার খনিতে স্টিল, জিঙ্ক আর এন্টিমনি উৎপাদিত হয়।

একইভাবে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশে স্যালামান্ডারের মতো একধরনের জিনিস পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে কাপড় বোনার পর, আগুনে নিক্ষেপ করলেও তা পুড়ে না। কার্ফিকার নামে আমার এক খুব বুদ্ধিমান তুর্কমেন সঙ্গী পর্যটকের কাছ থেকে আমি সেটার প্রস্তুত প্রণালি সম্পর্কে জানতে পারি, সে এই প্রদেশের খনি পরিচালনার সঙ্গে টানা তিন বছর ধরে সম্পৃক্ত ছিল। সেই জীবাশ্ম বস্তুটিতে উলের মতো একধরনের আঁশ থাকে। সেসব, রোদে শুকিয়ে তামার হামানদিস্তায় কেচে, তারপর মাটির অংশ সরাবার আগপর্যন্ত ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তখন এর আঁশগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, তারপর সেগুলো দিয়ে সুতা তৈরি করে কাপড় বোনা হয়। এর ধবধবে সাদা রং ফিরিয়ে আনার জন্য তারা একে আগুনে দেয়, সেখানে ঘণ্টা খানেক উত্তপ্ত হবার পর, যখন আগুন থেকে অক্ষত অবস্থায় বের করা হয় তখন সেটা দেখতে একেবারে তুষারের মতো ধবধবে সাদা হয়। এবং যখনই সেই কাপড় আবারও ময়লা হয় তারা একে আগুনে দিয়ে সাদা করে।

আগুনের সামনে টিকতে পারে, এ ধরনের কোনো জিনিসের চিহ্ন পুবের আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। জানা যায়, এই ধরনের জিনিস দিয়ে বোনা একটা ন্যাপকিন রোমে সংরক্ষিত আছ, যা গ্রেট খানের পক্ষ থেকে পোপের কাছে পাঠানো হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের পবিত্র সামারিয়াম আবৃত করার জন্য।

৪৩
সুক্কুইর জেলা যেখানে রেউচিনি জন্মে

সব শেষে যে জেলার কথা উল্লেখ করা হলো, সেখান থেকে পূর্ব-উত্তর-পূর্বে দশ দিনের পথ গেলে একটা জায়গা পড়ে, যেখানে লোকজন খুব বেশি নয়, আর এখানে চোখে পড়ার মতো তেমন কিছু নেই বললেই চলে, জায়গাটার নাম সুক্কুইর [সুকচু], এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে, আগের মতোই যার প্রধানটার নাম সুক্কুইর। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত মূর্তি পূজারি, তবে অল্পসংখ্যক খ্রিস্টানও রয়েছে। এরা গ্রেট খানের শাসনাধীন।

সাধারণ এই প্রদেশটিতে আরো তিনটি প্রদেশ রয়েছে, যার প্রতিটির নামই টাঙ্গুথ।

এখানকার পাহাড়ি অংশে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের রেউচিনি জন্মে, বণিকেরা সেসব কিনে নিয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেন। তবে ভারবাহী পশু নিয়ে এখানকার পথ চলার সময় সবাই পাহাড়ি এলাকা এড়িয়ে যাতায়াত করে। তার কারণ সেখানে একধরনের বিষাক্ত গাছ জন্মে, যা খেলে ভারবাহী পশুদের খুর ঝরে যায়। তাই এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে এখানে সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হয়।* জীবিকার জন্য এখানকার লোকেরা ফলফলাদি আর মাংসের ওপর নির্ভর করে এবং বলতে গেলে এই অঞ্চলের কেউই ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এখানকার লোকেরা স্বাস্থ্যবান, স্থানীয়দের গায়ের রং বাদামি।

৪৪
ক্যাম্পিচু নগরের মূর্তির ধরন বর্ষপঞ্জি আর বিবাহ প্রথা

কাম্পিচু, টাঙ্গুথ প্রদেশের প্রধান শহর, খুবই জাঁকজমকপূর্ণ প্রকাণ্ড এক শহর এটি এবং এখানকার পুরো প্রদেশ একটি মাত্র বিচারব্যবস্থার অধীন। বেশিরভাগ লোক মূর্তি পূজারি হলেও বেশ কিছু মুহাম্মদান আর খ্রিস্টান রয়েছে। শহরে তিনটি বৃহৎ আকারের সুরম্য চার্চ আছে। পৌত্তলিকদের অনেক ধর্মীয় ঘোড়া, আশ্রম আর উপাসনালয় রয়েছে, যার বেশিরভাগই দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে নির্মিত হয়েছে এবং এসবের মাঝে অনেক মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, যার কিছু কিছু কাঠের, কিছু পাথরের, আর বাকিগুলো কাদামাটির তৈরি। তারা এগুলোকে চমৎকারভাবে পলিস করে গিল্টিতে আবৃত করে রেখেছে। এগুলোর সবই খুব দক্ষ

---

* রুইনস অব ডেসার্ট ক্যাথি বইতে স্যার আউরেল স্টেইন, এ ধরনের বুনো রেউচিনির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে তার পনি ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যে দুর্বিষহ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল এমন ঘটনাসহ সেখানকার একধরনের বিষাক্ত ঘাসের কথাও তার লেখাতে খুঁজে পাওয়া যায়।

শৈলীতে প্রস্তুত। এর মাঝে বেশ কয়েকটি খুবই বড় আকৃতির, বাকিগুলো ছোট। যার একেবারে সামনেরটি উচ্চতায় পুরো দশ পদক্ষেপের সমান, খোদাই করা মূর্তিটা শায়িত অবস্থায় রাখা; এর পেছনে ছোটগুলোকে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা, যেন অনুসারীরা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানাচ্ছে। ছোট-বড় এই মূর্তির সবগুলো গভীর শ্রদ্ধার। পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা তাদের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত অন্যান্যদের চাইতে নীতি, নৈতিকতার দিক দিয়ে তারা খুবই ন্যায়শুদ্ধ জীবনযাপন করে। এরা ইন্দ্রিয় আর দৈহিক সুখভোগ থেকে নিজেদের বিরত রাখে। সাধারণত অবৈধ যৌন সংসর্গকে মারাত্মক কোনো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; আর এই কাজে নারীদের দিক থেকে প্রথম সাড়া মিললে, বেশিরভাগই সেটাকে কোনো অপরাধ বলে গণ্য করে না, কিন্তু পুরুষদের দিক থেকে এমন কোনো প্রস্তাব এলে তাকে মোটেই সুনজরে দেখা হয় না।

আমাদের মতোই পত্রিকা অনুসরণ করে তারাও নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট মাসের পাঁচ, চার বা তিন দিন, কোনো রক্তপাত করে না, মুরগি, মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকে; শুক্রবার তথা স্যাবাথের ভিজিল অব সেইন্ট* এর রাত্রি জাগার দিন আমরা যেমনটা করি। এখানকার সাধারণ জনগণের সবাই কম করে হলেও ত্রিশটির মতো বিয়ে করে, বউ পালার সামর্থ্য অনুসারে কারো এর চাইতেও বেশি, কারো বা কম, কারণ এখানকার কেউ যৌতুক নেয় না, তবে পাত্রী সম্প্রদানের বিপরীতে পাত্রী পক্ষকে গবাদিপশু, দাস আর অর্থকড়ি দিতে হয়। প্রথম বউ পরিবারের অন্যদের কাছে সব সময়ই উচ্চপদস্থ হিসেবে বিবেচিত হন এবং অন্য বউদের কেউ তাকে মান্য করছে না বা কেউ যদি স্বামীর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে তাহলে সে তাদের বিদায় করে দেবার অধিকার রাখে। এরা রক্তের সম্পর্কের খালাতো-মামাতো বোন, এমনকি শাশুড়িকে পর্যন্ত বিয়ে করে। তাদের কাছে অনেক পাপই মামুলি বলে গণ্য হয়, কাজেই এই ক্ষেত্রে তারা অনেকটা বুনো জানোয়ারের ন্যায় জীবনযাপন করে।

মার্কো পলো বাবা আর চাচাকে সঙ্গে নিয়ে এই শহরে বছর খানেক মত অবস্থান করে।

৪৫
এজিনা শহরের পশুপাখি আর মরুভূমি

কাম্পিচু থেকে উত্তরে বারো দিনের পথ গেলে এজিনা শহর, বালুময় মরুর [গোবি] শুরুতে টাঙ্গু প্রদেশের ভেতরেই অবস্থান। এখানকার অধিবাসীরা প্রতিমা উপাসক। উটসহ এদের বিভিন্ন ধরনের গবাদিপশু রয়েছে। এখানে বড় আকৃতির

---

* তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম

লেনার আর বাদামি রঙের চমৎকার ধরনের সেকারা শকুন দেখতে পাওয়া যায়।* জমিতে উৎপাদিত ফলমূল আর মাংসে এদের প্রয়োজন মেটে এবং এখানকার কেউই ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

পর্যটকেরা এই শহরের ওপর দিয়ে যাবার সময় চল্লিশ দিনের উপযোগী রসদ সংগ্রহ করে নেন, কেননা, এখান থেকে উত্তরের দিকে এগোলে এই সময়ের মধ্যে আর কোনো বসতির দেখা মিলবে না, কেবল গ্রীষ্মের দিকে কিছু কিছু পাহাড় আর উপত্যকায় অল্প কিছু লোকের দেখা মিলতে পারে। বাকি পথে কালেভদ্রে বুনো গাধাসহ অন্যান্য পশু দেখা মিলতে পারে, এগুলো পাইনের বনের গভীরে খাবার আর পানির সন্ধান করে বেড়ায়।

এই মরু পেরিয়ে আসলে, আপনি এটার উত্তরে একটা শহরে এসে উপস্থিত হবেন, যার নাম কারাকোরান।

৪৬

তাতারদের প্রাচীন আবাসস্থল কারাকোরান শহর এবং তাতার সাম্রাজ্যের পত্তন

কারাকোরান শহরটা চারদিকে তিন-মাইলের মতো বিস্তৃত এবং এখানেই প্রাচীনকালে তাতাররা তাদের বসতি স্থাপন করে। দেশের এই প্রান্তে পাথর পাওয়া না যাওয়ায়, শহরটি মজবুত মাটির প্রাচীরে ঘেরা। এই প্রাচীরের বাইরে, এর কাছাকাছি বিশাল আকৃতির সুরম্য একটা প্রাসাদ রয়েছে, তাতে এখানকার প্রশাসক বসবাস করেন।

এবার তাতারদের রাজ্য শাসন পত্তনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কের কথা বলা যাক। তারা থাকত চরর্চির সীমানার একেবারে কাছাকাছি এলাকাতে, কিন্তু তখনো স্থায়ী বসবাস শুরু করেনি, তাই তাদের কোনো শহর বা দুর্গ ছিল না; সেখানে শুধু ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত সমভূমি আর নদী আর প্রচুর জল। তখনো তারা স্বাধীন নয়, ক্ষমতাধর একজন রাজন্যকে কর দিতে হতো তাদের, আমার জানা মতে তাদের ভাষায় তার নাম উঙ্ক ক্যান, কারো কারো মতে আমাদের রাজা প্রেস্টর জনের মতোই তার গুরুত্ব। তাকে পশুর দশ ভাগ দিতে হতো তাতারদের।

সময়ে এই গোত্রের লোকসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে উঙ্ক ক্যান তাদের ক্ষমতা অনুধাবন করতে পেরে, তাদেরকে আলাদা একটা প্রশাসনের আওতায় এনে দেশের দূরবর্তী অংশে সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবেন। কাজটা করার সময় যাতে কোনো প্রদেশে বিদ্রোহ দেখাদিতে না পারে সে জন্য তিনি তিন থেকে চার শত

---

* চীনের পাখির ওপরে লেখা অনেক বইপত্র থেকে এদের কথা জানা যায়। এনসাইক্লোপিডিয়া সিনিকাতেও চিনের ১৪০ প্রজাতির পাখির একটা তালিকা রয়েছে, সেখানেও এদের নাম রয়েছে।

লোক নিয়োগ করেন, যাতে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা খর্ব করে দেয়া যায়। এই ভেবে তিনি সেই সব লোকেদের অভিযানে পাঠান, তাদের সঙ্গে উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসারও দেন যাতে তার ইচ্ছে বাস্তবায়িত হতে পারে।

ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়টি বুঝতে পেরে অবশেষে তাতাররা তাদের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে একতাবদ্ধ হয়, নিজেদের আসন্ন ধ্বংস টের পেয়ে তারা সেখান থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজেদের নিরাপদ বোধ করার আগপর্যন্ত উত্তরের বিশাল মরুভূমির ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তারপর তারা উঙ্ক ক্যানকে খাজনা দিতে অস্বীকার করে।

৪৭

প্রথম তাতার খান চেঙ্গিসের সঙ্গে উঙ্ক ক্যানের যুদ্ধ আর নিজ সাম্রাজ্যের পত্তন

সেখান থেকে তাতারদের চলে আসার কিছুদিন পর ১১৮৭ সালে তারা নিজেদের জন্য একজন রাজা নির্বাচিত করে, যার নাম চেঙ্গিস খান, চারিত্রিক সরলতা, অসম্ভব ধরনের প্রজ্ঞা, কর্তৃত্বপূর্ণ বাকপটুতা এবং পরাক্রমের জন্য তিনি সবার কাছে পরিচিত। ন্যায় এবং মিতাচারের মাধ্যমে তিনি তার রাজ্য শাসন শুরু করেন। আর সে কারণেই তিনি তাদের শাসকের বদলে সবার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন। তার নাম-যশ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তার নির্দেশেই তাতারগণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নিজেকে অসংখ্য সাহসী লোকের নেতা হিসেবে আবিষ্কার করার পর, তিনি মরু সেই বুন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের প্রকাশ ঘটাতে উচ্চাকাঙ্খী হয়ে, তীর-ধনুকসহ যেসব অস্ত্র চালনায় পারঙ্গম তাতে সজ্জিত হয়ে সৈনিকদের প্রস্তুত হবার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি শহর আর প্রদেশসমূহের রাজা হবার জন্য অগ্রসর হন; এবং তিনি দেখতে পান, তার ন্যায়তা আর অন্যান্য সদগুণ অনুসারে, তার ইচ্ছে মাফিক, লোকেরা নিজেদেরকে তার কাছে সঁপে দিতে প্রস্তুত এবং তার সুরক্ষা ও আনুকূল্যে নিজেদের সঁপে দিতে পেরে তারা সবাই যেন অনেক বেশি সুখী। এভাবে তিনি নয়টি প্রদেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও সে সময় প্রতিটি শহর আর জেলা হয় সেখানকার লোকেদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল, অথবা সেখানে কর্তৃত্বপরায়ণ কোনো রাজা ছিলেন, তবুও এগুলোর কোথাও তার সাফল্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপ্রস্তুত হয়নি; এবং যেহেতু তাদের মাঝে সাধারণ আস্থার অভাব ছিল, তাই তাদের পক্ষে আলাদা আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এত বড় শক্তিকে রুখে দেয়া সম্ভব হয়নি। এই সব জায়গাতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তিনি সেখানে প্রশাসক নিয়োগ করেন, যারা আচরণে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে এর জন্য সেখানকার অধিবাসীদের কাউকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কোনোরকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।

নিজের এমন সমৃদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্য দেখে তিনি আরো বড় কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করে দেন। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা থেকে তিনি উঙ্ক ক্যানের কাছে বার্তাসহকারে দূত প্রেরণ করেন, তবে তিনি আগে থেকেই জানতেন রাজার মেয়েকে বিয়ে করার এই প্রস্তাব তিনি আদৌ মেনে নিবেন না। চিঠি পাবার পরই তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়ে বলেন : "কী করে চেঙ্গিস খান এ কথা ভাবতে পারল, যে কি না, নিজেকে আমার দাস হিসেবে জানে, কী করে সে আমার সন্তানের হস্ত কামনা করতে পারে? এখান থেকে এখনি বেরিয়ে যাও", সে বলে, "এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে জানিয়ে দাও, যে এ ধরনের দাবি উত্থাপনের পর, আমি তাকে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে হত্যা করব"। এ ধরনের জবাব শোনার পর দূতেরা সরাসরি তার কাছে ফিরে এসে উঙ্ক ক্যানের বলা কথার কোনো কিছু বাদ না দিয়ে সব কিছু তাকে সবিস্তারে অবহিত করেন।

৪৮

কীভাবে উঙ্ক ক্যানের বিরুদ্ধে চেঙ্গিস নিজের লোকেদের প্রস্তুত করেন

তার জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে, চেঙ্গিস খান বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন, যার নেতৃত্ব দিয়ে তিনি উঙ্ক ক্যানের এলাকায় প্রবেশ করেন এবং টেনডুক নামের বিশাল সমতলের ওপর তাঁবু স্থাপন করে, নিজেকে রক্ষা করার উপদেশ দিয়ে তার কাছে বার্তা পাঠান।

৪৯

চেঙ্গিসের মুখোমুখি হতে উঙ্ক ক্যান কীভাবে অগ্রসর হন

উঙ্ক ক্যানও তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সমতলের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে, প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থান নেন। এই পরিস্থিতিতে চেঙ্গিস খান তার জ্যোতিষী আর জাদুকরদের কাছে জানতে চান, আসন্ন যুদ্ধে এই দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে কাদের জয় হবে। এ কথা শুনে তারা একটি সবুজ নলখাগড়া নিয়ে সেটাকে দৈর্ঘ্য বরাবর দুই ভাগ করেন, তার একটির ওপর তারা নিজেদের রাজার নাম লিখেন, আর অন্যটির ওপর লিখেন উঙ্ক ক্যান-এর নাম। তারপর তারা সেটাকে মাটির ওপর কিছুটা দূরে মুখোমুখি স্থাপন করে, রাজাকে জানান যে তাদের মন্ত্র পাঠের সময়, নলখাগড়ার এই দু'টা খণ্ড, তাদের দেবতার ক্ষমতাবলে, একে অন্যের দিকে অগ্রসর হবে এবং সব শেষে যার খণ্ডটা ওপরে থাকবে যুদ্ধে সেই রাজারই জয় সুনিশ্চিত।

এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য পুরো সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হয়, আর জ্যোতিষীরা তাদের পুস্তক থেকে মন্ত্র পড়তে শুরু করার পর, সেই দু'টা নলখাগড়ার খণ্ড একে অপরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং খানিক বাদেই

চেঙ্গিস খানের নামাঙ্কিত খণ্ডটি তার শত্রুর নাম লেখা খণ্ডের ওপর পড়ে থাকতে দেখা যায়।

৫০

চেঙ্গিস খান এবং উঙ্ক ক্যানের যুদ্ধ

এই দৃশ্য অবলোকন করার পর, রাজা এবং উপস্থিত তাতারগণ সারি বেঁধে উঙ্ক ক্যানের সেনাদের আক্রমণ করতে অসীম উৎসাহে অগ্রসর হয়। শত্রু সেনার ব্যূহ ভেদ করে তারা পুরো সেনা দলটাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। উঙ্ক ক্যান নিজেও নিহত হন, তার রাজ্য বিজেতার বশীভূত হয় এবং চেঙ্গিস খান তার মেয়েকে বিয়ে করেন। এই যুদ্ধ শেষ হবার ছয় বছর পর্যন্ত তিনি আরো অনেক রাজ্য আর শহর, নগর জয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন; অবশেষে থাইগিন নামের প্রাসাদ অবরোধের সময় একটা তীরের আঘাতে হাঁটুতে জখম হন, সেই আঘাতের কারণে তিনি মারা গেলে, আলতাই পাহাড়ে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

৫১

পর পর ছ'জন তাতার সম্রাট এবং আলতাই পাহাড়ে তাদের সমাহিত করার অনুষ্ঠান

চেঙ্গিস খানের পর ক্ষমতা আরোহণ করেন কুই খান; তৃতীয়জন বাটুই খান, চতুর্থজন আলাকু খান, পঞ্চমজন মঙ্গু খান, ষষ্ঠজন কুবলাই খান, যিনি তার আগের সবার চাইতে অনেক বেশি সুবিদিত আর ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন; সত্যি করে বলতে গেলে, আপনি যদি এই পাঁচজনের কথা একসঙ্গে বলেন, তাহলে তাদের কেউই একত্রে তার সমান ক্ষমতাধর নয়। শুধু তা-ই নয়, আমি আপনাদের এখানে তার চাইতেও বেশি কিছু জানাব; যদি সমস্ত খ্রিস্টান বিশ্বের সকল সম্রাট আর রাজারা একত্রিত হন সেই সঙ্গে ক্রুসেডবিরোধী সারাসিনরাও, তাহলেও সেরকম ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারবে না, অথবা কুবলাই খানের সমকক্ষ হতে পারবে না, যিনি সমগ্র তাতারদের সেই সঙ্গে লেভেন্ট এবং ধনাঢ্যদের রাজা। কেননা এদের সবাই তারই শাসনাধীন।*

খান বা কান উপাধি আমাদের ভাষার সম্রাটের সমতুল্য। এটা এমন একটা অপরিবর্তনীয় রীতি, যে সকল গ্রেট খানদের এবং চেঙ্গিস জাতির সমস্ত নেতাদের, তাদের সর্বপ্রথম রাজাকে, সমাহিত করার জন্য সুউচ্চ আলটাই পর্বতে বয়ে নিয়ে

---

* এই গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি ইতালিয়ান পাণ্ডুলিপিতে নেই তবে ইয়েলের বিবরণে অন্তর্ভুক্ত আছে।

যাওয়া হয়, হোক তারা যত দূরেই মৃত্যুবরণ করুন, শত দিনের পথের দূরত্ব হলেও, তাদের সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও সমাহিত করার রীতি নেই।

একই রীতি অনুসারে, মরদেহ বয়ে নিয়ে যাবার সময় রাজন্যদের শবযাত্রার সহচররা পথে আকস্মিক যার যার দেখা পান তাকেই এই কথা বলতে বলতে হত্যা করেন, "পরকালে গিয়ে তোমার মৃত রাজার সেবায় নিয়োজিত হও," যাদেরকে এভাবে হত্যা করা হবে তাদের সবাই পরকালে তার দাস হবে এমন বিশ্বাস থেকেই এ ধরনের কাজ করা হয়। সম্রাটের ঘোড়া, পালের পশুদেরও একইভাবে হত্যা করা হয়, যাতে পরকালে তিনি তাদের ব্যবহার করতে পারেন। মঙ্গু খানের মরদেহ যখন পাহাড়ে ওঠানো হয়, তখন সঙ্গী ঘোড়সওয়ারদেরসহ পথের আরো বিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।

৫২
তাতারদের বিস্ময়কর জীবনযাত্রা

এবার আমি তাতারদের কথা বলা শুরু করছি, তাদের সম্পর্কে অনেক কথাই বলব। তাতাররা কখনো এক জায়গাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না, শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা উষ্ণ সমভূমির দিকে চলে যায়, যাতে তাদের গবাদিপশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চারণভূমির সন্ধান পেতে পারে; এবং গ্রীষ্মে নিরুত্তাপ পরিবেশের সংস্পর্শ পেতে তারা ঘন ঘন পাহাড়ে যাতায়াত করে, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি আর গাছ-গাছড়া পাওয়া যায় এবং তাদের গবাদিপশু ঘোড়া-মাছির আর অন্যান্য পতঙ্গের উৎপাত থেকে মুক্ত থাকে। মাস তিনেক ধরে তারা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে চারণভূমির খোঁজ করে বেড়ায়, তাদের এই বিশাল পশুপালের উদর পূর্তির জন্য কোনো স্থানের ঘাসই যথেষ্ট নয়।

দেখতে গোলাকার তাদের এই কুঁড়ে আর তাঁবুগুলো দণ্ডের ওপর পশমি বস্ত্র আবৃত করে তৈরি করা হয়, একটির সঙ্গে আরেকটি সুন্দর করে ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে নির্মাণের কারণে, সবাই তারা একসঙ্গে দল বেঁধে থাকতে পারে, আর যাবার সময় সেসব চার চাকার গাড়িতে তুলে অন্যত্র চলে যেতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবে এতে ওঠার সময়, সব সময়ই তারা সামনে থেকে উত্তর দিক দিয়ে প্রবেশ করে। এই সব যানের মধ্যে দুই চাকার উন্নত একধরনের গাড়ি রয়েছে, এতেও কালো পশমি কাপড়ের ছাউনি দেয়া থাকে এবং সারা দিন বৃষ্টি হলেও সেটা এর ভেতরের লোকেদের আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। ষাঁড় বা উটে টানা এই সব গাড়ি, তাদের বউবাচ্চা, সাজসরঞ্জাম আর রসদ পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। মহিলারা সাধারণত ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা বেচাকেনা এবং স্বামী ও পরিবারের প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করে থাকে; একই সময়ে পুরুষেরা পুরোপুরি শিকারে ব্যস্ত থাকে, বাজপাখির সাহায্যেও এরা শিকার করে, তাছাড়া

সামরিক বিষয়াদিতেও সম্পৃক্ত থাকে। বিশ্বের সর্বোত্তম শকুন এবং সেই সঙ্গে সেরা কুকুরগুলোরও মালিক তারা।

এখানকার লোকেরা মাংস এবং দুধের ওপর নির্ভরশীল, তাদের উৎপাদন থেকেই একটি অংশ আহার করে এবং খরগোশের মতো দেখতে একপ্রকার ছোট্ট প্রাণীর মাংসও তারা খায়, গ্রীষ্মকালে সমতলজুড়ে এটি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। একইভাবে তারা সব ধরনের প্রাণী যেমন ঘোড়া, উট, এমনকি কুকুরের মাংস পর্যন্ত খায়। এখানকার লোকেরা গাধার দুধ থেকে স্বাদে, গন্ধে এবং দেখতে ধবল ওয়াইনসদৃশ একপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করে পান করে।

তাদের নারীরা কেবল স্বামীর প্রতি ভালোবাসা আর দায়িত্ব পালনের দিক দিয়েই নয়, কৌমার্যব্রত আর শালীনতায় তারা বাকি বিশ্বকে ছাড়িয়ে। বাসর রাত্রির অসতীত্ব তাদের কাছে কেবল মামুলি অসম্মানজনক পাপ কাজ হিসেবেই গণ্য হয় না, একে সবচাইতে ঘৃণ্য মনে করা হয়। পতির প্রতি বিশ্বস্ততাকে এখানে সম্মানের চোখে দেখা হয়, দশ-বারোটি বউ রাখার পরও, সংসারে তাদের সবাই মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে। কারো মুখে কখনো বাজে কথা শুনতে পাওয়া যায় না, সবাই নিজেদের আর বাড়ির কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, পরিবারের জন্য খাবার বানানো, চাকরবাকরদের খোঁজ-খবর রাখা আর ছেলেমেয়েদের দেখাশোনাই তাদের সাধারণ ভাবনা-চিন্তার বিষয়।

পুরুষেরা পছন্দমতো যত ইচ্ছা বউ রাখতে পারে। তাদের পেছনে স্বামীর তেমন একটা খরচ হয় না এবং অন্যদিকে নিজ পেষার কাজকারবার তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে যথেষ্ট লাভালাভের সুযোগ থাকে। এজন্য তার মাকে টাকা দিতে হয়। প্রথম বউ সবচাইতে বেশি সুনজরে থাকার সুবিধা ভোগ করেন এবং সবচেয়ে বেশি বৈধ বলে বিবেচিত হন আর তার গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তান-সন্ততিরাও এই সুবিধার ভাগিদার হন। অসংখ্য বউ থাকায়, যেকোনো লোকেদের চেয়ে এদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও হয় বেশি। বাবার মৃত্যুর পর, তার রেখে যাওয়া স্ত্রীদের ছেলে চাইলে গ্রহণ করতে পারে, কেবল তার নিজের মা ছাড়া। বোনদের বিয়ে করা বৈধ না হলেও ভাইয়ের মৃত্যুর পর তারা ভাবিদের বিয়ে করতে পারে। এর এ ধরনের সব বিয়েই জাঁকজমক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়।

৫৩
তাতারদের ঈশ্বর আর তাদের প্রার্থনার ধরন

তাতারদের বিশ্বাস আর ধারণা হলো : তারা এমন এক দেবতায় বিশ্বাসী যিনি মহিমান্বিত আর স্বর্গীয়। তার উদ্দেশ্যে তারা ধূপ-ধুনা জ্বালায়, আর বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করে। তারা নাটিগে নামের আরো এক দেবতার পূজা করে, সবাই তার ছবি রেশমি বস্ত্রে আবৃত করে ঘরে রাখে। এই

দেবতার সেবায় তার মূর্তির পাশে তার বউ আর সন্তানের মূর্তি সহযোগী হিসেবে রাখা হয়, বাম পাশে আগের জনকে আর পরের জনকে পেছনে রাখে। তাদের ধারণা ইনিই পৃথিবীর পৌরোহিত্য করছেন আর তার সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করছেন এবং ফসল ও গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত আছেন। তারা একে প্রচণ্ড শ্রদ্ধাভক্তি করে এবং মাংস ছাড়া কখনো তাদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হয় না এবং সেই মাংস মূর্তির একেবারে মুখে পুরে দেয়া হয়, একই সময়ে তার স্ত্রী আর সন্তানদের মুখেও খাবার তুলে দেয়া হয়। এরপর তারা যেই মদে সেই মাংস প্রস্তুত করা হয়েছে তার কিছুটা অন্য সব আত্মার উদ্দেশ্যে বাইরে ছুড়ে মারে। এসব করে তারা ভাবে তাদের দেবতা আর তার স্ত্রী-পরিবার তা সমানভাবে ভাগ করে খাবে, আর তারপর তারা আর কোনো আনুষ্ঠানিকতা না করে নিজেরা খেতে শুরু করে।

ধনাঢ্য তাতাররা স্বর্ণ আর পশমি কাপড় পরে, সেই সঙ্গে স্যাবল, এরমেনসহ (শীত ও গ্রীষ্মে লোমের রং বদলায় এমন একধরনের প্রাণী) অন্যান্য পশুর চামড়ার দিয়েও তারা পোশাক তৈরি করে।

৫৪
তাতারদের যুদ্ধরীতি অস্ত্র আর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

তীর-ধনুক, লোহার গদা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্শাই তাদের প্রধান অস্ত্র কিন্তু প্রথম অস্ত্রেই তারা সবচাইতে বেশি দক্ষ, ছেলে-বুড়ো সবাই খেলার উপকরণ হিসেবে এগুলোর ব্যবহার করে। সুরক্ষা বর্ম বানাতে তারা মহিষ ও অন্যান্য পশুর চামড়া ব্যবহার করে, তার আগে এগুলোকে বিশেষ কৌশলে আগুনের তাপে শুকিয়ে প্রচণ্ড শক্ত করে নেয়া হয়। অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তারা যুদ্ধে লড়ে, এমনকি প্রচণ্ড হতাশার মাঝেও, জীবনের প্রতি খুব কমই মূল্য দেয়, আর যেকোনো ধরনের বিপদ মোকাবেলায় মোটেই গড়িমসি করে না। তাদের স্বভাব খুবই হিংস্র ধরনের।

এরা যেকোনো ধরনের বঞ্চনা আর অভাব সহ্য করতে সক্ষম, আর প্রয়োজনে, কেবল তাদের ঘোটকী বা পাকড়াও করতে সক্ষম এমন বুনো পশুর দুধে মাস পার করে দিতে পারে। খাবার হিসেবে তাদের ঘোড়াগুলোকে শুধুমাত্র ঘাস দেওয়া হয়, তাই বার্লিসহ অন্যান্য শস্যের দরকার হয় না। বিশ্রামের জন্য না নেমেই এদের পুরুষেরা টানা দুই দিন দুই রাত্রি ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারে; এ ধরনের কোনো পরিস্থিতিতে তারা ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াবার সময়ও তার পিঠের ওপর ঘুমায়। বিশ্বের কোনো স্থানের লোকেরাই তাদের মতো কঠিন পরিস্থিতি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম নয়, কেউই তাদের মতো অসহনীয় ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারবে না। দলনেতার প্রতি তারা অত্যন্ত অনুগত আর খুব কম খরচে

এদের দিয়ে কাজ করানো যায়। সৈনিক হবার এ ধরনের গুণাবলির সাহায্যে, সারা বিশ্বকে বশে আনার উপযোগী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব, আর সত্যিকার অর্থেই এর উল্লেখযোগ্য একটা অংশ নিজেদের অধীনে এনে কাজটা যে তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল সেটা তারা খুব ভালোভাবেই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

যখন সর্বশ্রেষ্ঠ এই তাতার রাজ কোনো অভিযানে অগ্রসর হন, তিনি তখন এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈনিকের সেনানায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এভাবে সেনা সংঘটিত করেন। প্রতি দশজন সৈনিকের নেতৃত্বের জন্য তিনি একজন করে অফিসার নিয়োগ করেন এবং এর পরের জনের অধীনে থাকে এক শত জন সৈনিক, এর পরের জনের অধীনে এক হাজার, এর পর দশ হাজার, এভাবে পুরো সেনাদলের কমান্ড বিন্যস্ত করা হয়। প্রথম সারির দশজন অফিসার তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ গ্রহণ করে তাদের অধীনস্ত এক শত জন অফিসারের দশজনকে নির্দেশনা প্রদান করেন; এদের দশজনের প্রত্যেকে হাজার জনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে তাদের দশজনের প্রত্যেকের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অধীনস্ত দশ হাজার সৈনিকের কাছে নির্দেশনা পৌঁছে।

এ ধরনের বিন্যাসে প্রত্যেক অফিসারকে কেবল দশজনের ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এক শত লোকের প্রত্যেক কোম্পানিকে এক একটি টাক হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় আর দশ হাজার জনের এমন একটি বাহিনীকে বলা হয় টোমান। সেনাবাহিনী কাজে বের হলে, দুই শত লোকের একটি দলকে দু'দিন আগে থেকে অগ্রসর হবার জন্য পাঠানো হয় এবং আকস্মিক আক্রমণ ঠেকাতে প্রত্যেক পর্বতের সানুদেশ আর পেছনে অবস্থান নেবার জন্য দল ঠিক করে দেয়া হয়।

দূরে কোথাও অভিযানে বের হবার সময় তারা সঙ্গে খুব কম জিনিসপত্রই বহন করে এবং কেবল থাকা আর রান্না করার মতো দরকারি উপকরণ সঙ্গে নেয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে তারা কেবল দুধ খেয়েই অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম। সবাইকে পশমি কাপড়ে তৈরি একধরনের ছোট্ট তাঁবু সরবরাহ করা হয়, যার ভেতরে তারা বৃষ্টিবাদলার সময় আশ্রয় নিতে পারে। পরিস্থিতির মোকাবেলায় দ্রুত কোথাও দায়িত্ব পালনে যাবার প্রয়োজন হলে, তারা আগুন না জ্বেলে অথবা একবারের জন্যও খাবার না খেয়ে টানা দশ দিন পথ চলতে পারে। এই সময়ে তারা নিজের ঘোড়ার রক্ত চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের সঙ্গে থাকা পশুর শিরা থেকে তা পান করে।

দুধ ঘন করে এবং শুকিয়ে তারা পেস্টের মতো একধরনের খাবার তৈরি করে তা রসদ হিসেবে সঙ্গে নেয়, আর সেটা বানানো হয় এভাবে। প্রথমে তারা দুধ গরম করে, এর উপরকার সরের অংশ থেকে মাখন আলাদা পাত্রে রাখা হয়; এটা যতক্ষণ পর্যন্ত দুধের ভেতর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুধ শক্ত হতে পারে না। এরপর শুকানোর আগ পর্যন্ত একে রোদে রাখা হয়। অভিযানে বের হবার সময় প্রত্যেকের জন্য এর দশ পাউন্ড নেয়া হয় এবং প্রতিদিন সকালে এর আধ পাউন্ড

প্রয়োজনীয় পানির সঙ্গে মিশিয়ে চামড়ার বোতলে ভরা হয়। ঘোড়ায় সওয়ার হবার পর প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সেটা বোতলের জলের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায়, আর সেটা দিয়েই তারা রাতের খাবার সারে।

তাতাররা যুদ্ধে জড়াবার পর, কখনো শত্রুর সঙ্গে মিশে যায় না, বরং তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে, প্রথমে একদিক থেকে তীর ছুড়ে, তারপর অন্য পাশ থেকে, প্রায়ই শত্রুর চোখে ধোঁকা দেওয়ার ভানও করে, পেছন দিকে ধাওয়া করা লোকেদের দিকে ঠিক সামনাসামনি লড়ার মতো তীর ছুড়ে লোক আর ঘোড়া হত্যা করতে পারে। এভাবে শুরুতেই প্রতিপক্ষ যখন ভাবে তারা যুদ্ধে জিতে গেছে তখন আসলে তারা পরাজিত হয়; কেননা ঘুপটি মেরে থাকা অপেক্ষমাণেরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পুনরায় যুদ্ধে শুরু করে সবাইকে বন্দি করে, তাতাররা তখন তাদের শত্রুর দুর্দশাই প্রত্যক্ষ করে। তাদের ঘোড়াগুলো এত দ্রুত বাঁক নিতে সক্ষম যে সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো যেকোনো দিকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে; এবং এই ধরনের দ্রুত চালনার জন্য তাদের অনেক বিজয় অর্জন সম্ভব হয়।

এখানে তাতার রাজের সত্যিকার যুদ্ধ রীতির কথা তুলে ধরা হলো; কিন্তু বর্তমানে এর অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। যারা ক্যাথিতে বসবাস করছে তারা তাদের পৌত্তলিকতার নিজস্ব নিয়ম-কানুন মেনে চলছে, আর পুবের প্রদেশসমূহের বাসিন্দারা ক্রুসেডবিদ্বেষী সারাসিনদের রীতি আত্মস্থ করে নিয়েছে।

৫৫
বিচারব্যবস্থা আর ভিন্ন পরিবারের সন্তানদের মাঝে বিবাহের রীতি

তাদের বিচারব্যবস্থা এভাবে পরিচালিত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে এমন মনে না হলে তাকে বেতের সাহায্যে নির্দিষ্টসংখ্যক আঘাত করা হয়—সাত, সতের, সাতাশ, সাঁইত্রিশ, সাতচল্লিশ, অথবা এক শত সাত, এই সংখ্যা ঠিক হয় তার ডাকাতি করা জিনিসের মূল্যমান থেকে। এ ধরনের কঠোর শাস্তির কারণে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। ঘোড়া বা এর মতো কোনো জিনিস লুটের দায়ে দোষীকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, আর তরবারির সাহায্যে অপরাধীর শরীর দ্বিখণ্ডিত করে এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করা হয়। কিন্তু ডাকাতি বা চুরি করা সম্পদের নয়গুণ ফেরত দিতে সক্ষম হলে তাকে সব ধরনের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়।*

---

* অপরাধের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার এই চৈনিক প্রথা আজকে আমেরিকা আর ইউরোপে অতি চর্চিত হচ্ছে। আমেরিকাতে বিশেষ ধরনের অপরাধে আইন অমান্য করার জন্য একদল লোক জোটবদ্ধ হয়ে উনত্রিশ লাখ ডলার জরিমানা প্রদানের কথা জানা যায়।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে সকল গোত্রর চিফ এবং অন্যান্য সবাই পশুসম্পদ তথা ঘোড়া, ঘোটকী, উট, ষাঁড়, অথবা গরুর অধিকারী হন অন্যদের চোখে নিজেদের বিশিষ্ট করে তোলার জন্য আর এতে করে এগুলোকে উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘাস খাওয়াতে যথেষ্ট ভোগান্তি পোহাতে হয়, সমতল বা পাহাড়ের যেকোনো অংশে কোনো রাখালের তত্ত্বাবধায়ন ছাড়াই পশুপাল চড়ে বেড়ায়। এগুলো থেকে কোনো একটি যদি অন্যের পালের সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকে, তাহলে পশুর গায়ের চিহ্ন দেখে তা মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অপরদিকে ভেড়া আর ছাগলের সঙ্গে রাখাল দেয়া হয়। তাদের পালা সব পশুই হৃষ্টপুষ্ট, মোটা আর দেখতেও চমৎকার।

যদি কারো পুত্র সন্তান এবং অপর কারো ঘরে কন্যা থাকে, আর এদের উভয়েই বছর খানেকের অধিক সময় আগে মরে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের সেই মৃত সন্তানদের মাঝে বিবাহ দেবার একধরনের রীতি প্রচলিত রয়েছে এবং এ ধরনের বিয়ের মাধ্যমে তারা সেই মৃত যুবকের কাছে হারানো কন্যাকে সম্প্রদান করে থাকে। এ সময় তারা অভ্যাগতদের আর তাদের সঙ্গে থাকা ঘোড়া আর অন্যান্য পশুসহ সব ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ, টাকা-কড়ি, সব ধরনের আসবাবপত্র এবং বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুর ছবি কাগজের টুকরোর ওপর এঁকে, তার সঙ্গে নিয়মিত বিয়ের চুক্তিপত্র লিখে তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়, যাতে পরকালে তাদের সন্তানেরা সেসব পেতে পারে আর সেখানে তারা যেন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের পর তাদের বাবা-মায়েরা নিজেদের আত্মীয় হিসেবে গণ্য করে, ঠিক যেমনটা তাদের জীবিত সন্তানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদিও তাতারদের এই সব রীতি আর প্রথার সঙ্গে তাদের সম্রাট গ্রেট খানের কার্যকলাপের কোনো মিলই নেই, এবার আমরা আমাদের আগের সেই আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি, যেই বিস্তৃত সমভূমির ওপর দিয়ে ভ্রমণ করার সময় আমরা সেখানকার লোকেদের ইতিহাস জানতে কিছু সময়ের জন্য থেমেছিলাম।

৫৬
কারাকোরানের কাছে বার্গু সমতল আর সেখানকার লোকেদের রীতি-প্রথা

কারাকোরান আর তাতারদের রাজকীয় সমাধি ক্ষেত্র সম্বন্ধে যা বলা হলো সেই আলটাই পাহাড় ছেড়ে সামনে এগোবার পর, উত্তরে গেলে সমতল একটি দেশ পড়বে, জায়গাটিকে বার্গু নামে অভিহিত করা হয়, সেটা চল্লিশ দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানকার লোকেদের মেসক্রিপ্ট নামে ডাকা হয়, খুবই রূঢ় একটি গোত্র, যারা কেবল মাংস আর পশুর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, কর্মকাণ্ড অনুসারে তারাই সেখানকার সবচাইতে বৃহৎ গোষ্ঠী; শিকারের উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন

জায়গাতে ঘুরে বেড়ায়। সেখানকার হ্রদ আর জলাভূমিতে জড়ো হওয়া অসংখ্য পাখিও শিকার করে, একইভাবে সেসব জায়গা থেকে তারা মাছও মারে। বরফ গলার সময় বা গ্রীষ্মে, পাখিরা খাবারের সন্ধানে এই সব জলাভূমিজুড়ে জড়ো হয়, ডিম পাড়ে, আর বাচ্চা ফোটায়, পালক গজাবার অপেক্ষায় থাকে বলে এগুলো উড়তে অক্ষম, তাই তাদের পাকড়াও করতে স্থানীয়দের তেমন একটা বেগ পোহাতে হয় না। উত্তরে এই সমতল সাগরে গিয়ে মিশেছে। এদের আচার-আচরণ একটু আগে বর্ণনা করা তাতারদের মতোই, জায়গাটিও তাতার রাজ গ্রেট খানের অধীন। এদের এখানে শস্য ফলে না, ওয়াইনও তৈরি করতে পারে না; আর সমস্ত গ্রীষ্মজুড়ে জীবিকার তাগিদে তাদের ছুটে বেড়াতে হয়, কেননা প্রচণ্ড শীতের সময় এখানে কোনো পশু বা পাখির দেখা একেবারেই মেলে না। এর ওপর দিয়ে টানা চল্লিশ দিন পথ চলার পর, আগেই বলা হয়েছে, আপনি সেই সাগরের দেখা পাবেন। এর কাছেই একটা পাহাড় রয়েছে, এতে, আর এর পার্শ্ববর্তী সমতলজুড়ে শকুন আর পেরিজিন নামের বাজপাখির বাস। এখানে মানুষ বা কোনো গবাদিপশুর দেখে মেলে না, আর পাখির মধ্যে বার্গেলাক নামের কেবল একটি মাত্র প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়, যা বাজ পাখির খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর আকার প্রায় তিতিরের সমান, নখ তোতা পাখির মতো, আর এগুলো খুব দ্রুত উড়তে সক্ষম। পেরিজিন শাবক পেতে গ্রেট খান এখানেই লোক পাঠান। এখানকার উপকূলের কাছে একটি দ্বীপ রয়েছে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গারফেলকন নামের বাজপাখি এখানে প্রচুরসংখ্যক পাওয়া যায় বলে সম্রাটকে খুশি করতে এখান থেকে সংগ্রহ করে অনেক বাজ তার কাছে পাঠানো হয়। তাই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে গ্রেট খানের দরবারের বাজ ইউরোপ থেকে আনা। কেবল আর্মেনিয়া আর কোমানিয়ান-এর মতো সীমান্তবর্তী অঞ্চলের তাতার প্রধান আর অন্যান্য গণ্যমান্যদের জন্য সেসব বাজের দরকার হয়। এই দ্বীপটি এতটাই উত্তরে অবস্থিত যে এখানে ধ্রুবতারা পেছনের দিকে থাকে, আর সেটা সামান্য দক্ষিণে হেলে থাকতে দেখা যায়।

উত্তর সাগরের কাছের এলাকার কথা হলো, এবার আমরা গ্রেট খানের আবাসের কাছাকাছি প্রদেশগুলোর বর্ণনা তুলে ধরছি এবং আবারও কাম্পিচু প্রসঙ্গে ফিরছি, যার কথা একটু আগেই আপনাদের বলা হয়েছে।

৫৭
কাম্পিচুর পাশের রাজ্য আর্জিনুল এবং সিনজু প্রদেশের রীতি-নীতি আর সুন্দরী নারী

কাম্পিচু থেকে পুবে আর্জিনুল, তবে দিনের বেলায় যেতে হবে, কারণ রাতের বেলা পথ চলতে গিয়ে পর্যটকেরা প্রায়ই দুষ্ট-আত্মার গলার আওয়াজ শুনে ভয় পান বলে শুনতে পাওয়া যায়, এই জায়গাটাসহ টাঙ্গুথ প্রদেশ গ্রেট খানের অধীন।

এই রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি আরো বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, সেই সঙ্গে কিছু নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান আর মুহাম্মদের অনুসারীও রয়েছে।

অনেক শহর আর দুর্গের মধ্যে প্রধানতম হলো আর্জিনুল। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এগোলে, সেই পথ আপনাকে ক্যাথিতে নিয়ে যাবে, আর এই একই পথে একটা শহর নজরে আসবে, তার নাম সিনজু, এখানকার জেলারও এই একই নাম, যেখানে রয়েছে অনেক প্রাসাদ আর শহর, যার নির্মাণশৈলী টাঙ্গুথেরই মতো এবং এটিও গ্রেট খানের অধীনস্ত। এখানকার অধিবাসীদের বেশিরভাগই পৌত্তলিক, তবে কিছু মুসলমান আর খ্রিস্টানও রয়েছে। এখানে অনেক বুনো গবাদিপশু দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোর আকার প্রায় হাতির সঙ্গে তুলনা করার মতো।* এগুলোর রং সাদা-কালোর মিশ্রণ আর দেখতে খুবই সুন্দর। এগুলোর সারা শরীরজুড়ে লোম ঝুলে থাকতে দেখা যায়, তবে কেবল ঘাড় ছাড়া, ঘাড়ের ওপর খাড়া পশমের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন বিঘত। এই পশম, অথবা যাকে উল বলাই শ্রেয় হবে, ধবধবে সাদা আর সিল্কের চাইতে তা অনেক বেশি কোমল আর মসৃণ। কৌতূহলবশত এর কিছু মার্কো পলো ভেনিসে এনেছিলেন, আর যাদের সেটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের সবাই তার উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। এসব পশুর বেশ কিছু পোষ মানানো আর সাধারণ গরুর সঙ্গে সংকরায়নের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব হয়েছে, আর এর ফলে আরো উচ্চগুণসম্পন্ন শ্রান্তি প্রতিরোধী প্রজাতি উৎপাদন করা গেছে। কর্মক্ষম আর অধিক শক্তিশালী এই প্রাণীটি তার সাধারণ প্রজাতি থেকেও অনেক বেশি ভার বইতে এক দ্বিগুণ পরিশ্রমে সক্ষম।

এই দেশে উন্নত আর সবচাইতে মূল্যবান মৃগনাভি পাওয়া যায়। আর তা উৎপাদিত হয় গজলা নামের একপ্রকার হরিণ থেকে। এর লোমের আস্তর সর্ববৃহৎ ধরনের হরিণের মতোঃ পা আর লেজ এন্টিলোপ তথা কৃষ্ণসার মৃগের মতো, তবে এর মাথায় কোনো শিং নেই। মুখ থেকে বেরিয়ে থাকা সামনের পাটির চারটি দাঁত প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা, যার দুটি উপরের পাটি থেকে নিচের দিকে তাক করা, আর নিচের পাটির বাকি দুটা উপরের দিকে তাক করা থাকে, এদের দৈর্ঘ্যে সামান্য তারতম্য লক্ষ করা যায়, আর এগুলো হাতির দাঁতের মতো ধবধবে সাদা। সব কিছু মিলিয়ে খুব সুন্দর একটি প্রাণী। এর থেকে মৃগনাভি সংগ্রহ করা হয় এভাবে। পূর্ণিমা রাতে এর নাভিদেশে একটি থলে বা ত্বকে রক্ত জমাট বেঁধে এটি তৈরি হয়, আর যারা এই পেষার সঙ্গে জড়িত তারা এর জন্য পূর্ণিমা রাতে হরিণের কাছ থেকে তা সংগ্রহের অপেক্ষায় থাকে, সেই পর্দা কেটে নিয়ে পরে এর ভেতরকার আধেয়সহ রোদে শুকানো হয়। এটা প্রামাণ্য সত্য যে গজলা হরিণ

---

* বুনো চমরি গাই বা ষাঁড়

থেকে চমৎকার সুগন্ধি পাওয়া যায়। এগুলো প্রচুর পরিমাণে ধরা হয়, আর এদের মাংসও খেতে অত্যন্ত উপাদেয়। এ রকম একটি হরিণের মাথা আর পা শুকিয়ে মার্কো পলো ভেনিসে নিয়ে এনেছিলেন।

দেশের বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ব্যবসা আর পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের প্রচুর পরিমাণে শস্য রয়েছে। প্রদেশের বিস্তৃতি পঁচিশ দিনের ভ্রমণের সমান। এখানকার ফিজন্ট পাখির লেজ আমাদের দেশেরগুলোর চাইতে দ্বিগুণ লম্বা, তবে ময়ূরের চেয়ে কিছুটা ছোট। এদের লেজের পালক আট থেকে দশ বিঘত লম্বা।** এখানে আরো বেশ কয়েক প্রকার ফিজন্ট দেখতে পাওয়া যায়, আকার-আকৃতিতে সেগুলো আমাদের দেশেরগুলোর মতোই। এছাড়াও এখানে আরো অনেক ধরনের পাখি রয়েছে, যেগুলোর কোনো কোনোটার পালক খুবই সুন্দর।

অধিবাসীরা পৌত্তলিক। ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রত্যেকেই স্থূল আর তাদের নাক ছোট। চুল কালো আর গালে দাড়ি বলতে গেলে প্রায় দুর্লভ, বা বলা যায় থুতনির কাছে কেবল বিক্ষিপ্ত অল্প কয়টা চুলের দেখা মিলে। এখানকার অভিজাত শ্রেণির মহিলারা অভ্যাসবশত অনর্থক চুল খুলে রাখে, এদের ত্বক উজ্জ্বল আর অটুট। পুরুষেরা নারীদের প্রতি খুবই অনুরক্ত; এরা দেশের রীতি আর প্রথা অনুসারে সামর্থ্য মাফিক ইচ্ছেমতো অনেক বউ রাখতে পারে। সুন্দরী আর সুশ্রী তরুণীরা দরিদ্র হলেও ধনীরা তাদের বউ হিসেবে পেতে মোটেই পিছপা হয় না, আর এ ধরনের কাউকে পাবার জন্য তাকেসহ তার বাবা-মাকেও মূল্যবান সব উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়, এ ক্ষেত্রে কেবল সৌন্দর্যই একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। এবার আমরা এই জেলা ছেড়ে আরো দূরে অবস্থিত পুবের অঞ্চলের অন্যত্র যাবার কথা আলোচনা করব।

৫৮

এগ্রিগয়া প্রদেশ আর কালাচা নগরবাসীর আচার-আচরণ

আর্জিনুল ছেড়ে পুবে টানা আট দিনের পথ গেলে আপনি এক দেশে এসে উপস্থিত হবেন, যার নাম এগ্রিগয়া, এখনো পর্যন্ত এটা বৃহত্তর প্রদেশ টাঙ্গুথের অংশ, আর গ্রেট খানের অধীন। এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে, যার প্রধানতম শহরের নাম কালাচান। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত পৌত্তলিক; তবে নেস্টরিয়ান খ্রিস্টানদের তিনটা চার্চ রয়েছে। এই শহরে উটের লোম থেকে

** লেজের এই পালক ছয় ফুটের চাইতেও লম্বা, চৈনিক নাটকে নায়কের টুপিতে প্রায়ই এ ধরনের পালক পরতে দেখা যায়।

একধরনের মনোহর কাপড় প্রস্তুত করা হয়, যা বিশ্বের সবচেয়ে মিহি বস্ত্র হিসেবে পরিচিত, দেখতে অনেকটা সাদা উলের মতো। এদের সাদা উট থাকার কারণেরই এসব এতটা সুন্দর আর ধবল। ব্যবসায়ীরা এসব এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংগ্রহ করে, ক্যাথিসহ বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতে নিয়ে যায়।

এই প্রদেশ ছেড়ে এসে, আমরা এবার পুবের অন্য একটা জায়গার কথা বলব, আর উঙ্ক ক্যানের এলাকায় প্রবেশ করব।

৫৯
উঙ্ক ক্যানের বংশধরদের শাসিত টেন্ডুক প্রদেশ

পুবের প্রদেশ টেন্ডুক উঙ্ক ক্যানের এলাকা, এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে, যার সবই গ্রেট খানের শাসনাধীন; প্রথম সম্রাট চেঙ্গিস খানের কাছে দেশটি পদানত হবার পর থেকেই সেই পরিবারের সব রাজপুত্রেরা পরমুখাপেক্ষী। আগের মতোই এখানকার রাজধানীর নামও টেন্ডুক। এখানকার অধিবাসীদের বেশিরভাগই খ্রিস্টান। রাজারা গ্রেট খানকে খাজনা প্রদান করেন, তবে আসল উঙ্ক ক্যানের সব সম্পত্তির ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়, কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য তা দেয়া হয়; এবং খানকে তার উর্ধ্বতন হিসেবে গণ্য করা হয়, একইভাবে তার পরিবারের অন্যান্য রাজপুত্র, তার কন্যা এবং তার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ রাজ পরিবারের অন্যান্য মহিলারা খানকে কর প্রদান করেন।

এই প্রদেশে গাঢ় নীল রঙের খুব উন্নত ধরনের একপ্রকার পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানেও উটের লোম থেকে বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অধিবাসীরা চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যান্ত্রিক শ্রমের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এখানকার লোকেরা পৌত্তলিক, পাশাপাশি মুসলমান আর খ্রিস্টানও রয়েছে। প্রদেশের শাসনভার খ্রিস্টানদের হাতে। এখানকার একশ্রেণির লোক নামের সঙ্গে আরগনের মতো উপাধি ব্যবহার করে, কেননা তারা স্থানীয় পৌত্তলিক টেন্ডুক আর মুসলমান এই দুটি জাতির মিশ্রণ। এখানকার পুরুষদের গায়ের রং ফর্সা, আর এ পর্যন্ত যেসব জায়গার কথা বলা হয়েছে সেসব জায়গার পুরুষদের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর, শিক্ষিত আর দক্ষ ব্যবসায়ী।

এখানকার প্রধান প্রশাসন উঙ্ক ক্যানের সার্বভৌম সরকারের আদলে পরিচালিত, ঠিক যেভাবে তারা তাতার আর প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ শাসন করত এবং এখনো আগের মতোই উঙ্ক ক্যানের বংশধরেরা বংশানুক্রমিকভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করে। বর্তমানে, উঙ্ক ক্যানের চতুর্থ বংশধর জর্জ এখানকার রাজা, তিনি পরিবারের জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করছেন। এখানকার দুটি স্থানে তারা এ ধরনের আধিপত্য বিস্তার করছে।

এরাই আমাদের কাছে ইয়াজুজ আর মাজুজ (গগ এবং ম্যাগগ)* নামে পরিচিত, তবে স্থানীয়দের কাছে আঙ্গ এবং মোঙ্গল নামে পরিচিত; এদের উভয়ই খুব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতি। আঙ্গরা হলো ইয়াজুজ আর মোঙ্গলরাই হলো তাতার।

এই প্রদেশ দিয়ে পুব দিকে ক্যাথির দিকে সাত দিনের পথ চলার সময়, পৌত্তলিক অনেক শহর চোখে পড়বে, সেই সঙ্গে মুসলমান আর নেস্টরিয়ান খ্রিস্টানদের দেখাও মিলবে। এরা নিত্যব্যবহার্য পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বুনন, স্বর্ণ আর মুক্তা খচিত কাপড় তৈরি, বিভিন্ন বুনন আর রঙের রেশমি বস্ত্র আর নানা রকমের উলের কাপড় তৈরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

এই সব লোকেদের সবাই গ্রেট খানের অধীন। এখানকার সিন্ডিচু নামের শহরে অস্ত্রসহ সৈনিকদের ব্যবহারের উপযোগী সব ধরনের যুদ্ধ উপকরণ প্রস্তুত হয়। ইদিফু নামক পার্বত্য অংশ রুপার খনিতে সমৃদ্ধ, জায়গাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপা আহরিত হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে পশু-পাখি দেখতে পাওয়া যায়।

৬০
চাঙ্গানর শহরের নানা ধরনের পাখি

একটু আগে উল্লেখ করা শহর আর প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসে তিন দিন পথ চললে, চাঙ্গানর নামের একটা শহরে এসে পৌঁছবেন, জায়গাটা এর স্বচ্ছ জলাধারের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এখানে খানের বিশাল এক প্রাসাদ রয়েছে, নদী ও জলাধারে ঘেরা আর রাজহাঁসের আস্তানা হওয়াতে জায়গাটি তার বিশেষ পছন্দের। এখানে মনোরম সমতলও রয়েছে, যেখানে প্রচুর সংখ্যায় সারস, লম্বা লেজওয়ালা পাখি ফিজন্ট, তিতিরসহ অন্যান্য পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার সবচেয়ে প্রচলিত খেলা ধড়িবাজ আর বাজপাখির খেলা তার খুবই পছন্দের।

---

* খুব অবাক হবার মতো একটা বিষয় হলো মার্কো পলো চীনের প্রাচীর নিয়ে কিছুই বলেননি। তার চলার পথে বেশ কয়েকবার চীনের প্রাচীর পড়েছে, আর এই প্রদেশে আবারও তাকে সেই প্রাচীর অতিক্রম হতে হয়। স্যার হেনরি ইয়েল মনে করেন মার্কো পলো চীনের মহাপ্রাচীর দেখেই প্রদেশটির লোকেদের "গগ এন্ড ম্যাগগ" হিসেবে উল্লেখ করেন। অবশ্য তার উল্লেখ করা মুসলমান বসতির অনেক সূত্র আমাদের কোরআনের সেই আয়াতের কথাই কথাই মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বলা হয়েছে : "ওঁরা বলল 'ওহে' আমি এই কোরআনে যথার্থই বলছি, ইয়াজুজ এবং মাজুজ [গগ এবং ম্যাগগ] এই ভূমির ওপর যাবতীয় অশুভ কার্য সম্পাদন করিবে। আমরা কি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকব, যে পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের আর তাদের মাঝে দুর্গ গড়ে করে দিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমার প্রভু আমার মাঝে যা প্রতিষ্ঠা করলেন তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই আমাকে শক্তি প্রদানপূর্বক পূর্ণ সহায়তা করুন, যাতে করে আমি তোমার ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর নির্মাণ করতে পারি।" (এখানে কোরআনের সূরা বা আয়াতের সূত্র উল্লেখ নেই : অনুবাদক)

এখানে মোট পাঁচ প্রজাতির সারস রয়েছে। প্রথমটা একেবারে কয়লার মতন কালো, এর ডানা দীর্ঘ। দ্বিতীয়টার ডানা প্রথমটার চেয়ে লম্বা আর পালক সাদা, এতে ময়ূরের মতো গোলাকার চোখ রয়েছে, তবে সেটা সোনালি আর খুবই উজ্জ্বল, এর মাথা সুগঠিত, রং লাল আর কালো; গলা সাদা-কালো, স্বাভাবিকভাবে পাখিটা দেখতে খুবই সুন্দর। তৃতীয়টার আকার আমাদেরগুলোর সমান। চতুর্থটা ছোট আকৃতির সারস, এর শরীর খুব সুন্দর ধরনের লাল আর গাঢ় নীল পালকে আবৃত। পঞ্চমটি বাদামি রঙের, মাথা লাল আর কালো, এটি আকৃতিতে সবথেকে বড়।

শহরের কাছাকাছি উপত্যকাজুড়ে প্রচুর তিতির আর কোয়েলের দেখা মেলে, এদের খাবার জন্য গ্রেট খান যব আর অন্যান্য উপযোগী শস্যের আবাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন। প্রতি ঋতুতে এর চারপাশে রাজহাঁসের সমাগম ঘটে, বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য এগুলো শিকারে কড়াকড়ি আরোপ করা আছে। তাই কেউ এগুলো মারার সাহস দেখায় না। ফলে এখানে এই ধরনের পাখির কোনো অভাব নেই। এদের দেখাশোনা করার জন্য অনেক লোক রাখা আছে, তাই এখান থেকে কারো পক্ষে পাখি ধরা বা শিকার করা সম্ভব নয়। এইসব রক্ষকেরা শীতকালে পাখিকে যব খেতে দেয়। পাখিকে খাবার দেবার জন্য এরা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত, শস্য ছিটিয়ে শিস দেবার পর চারদিক থেকে পাখিরা খারাব জন্য ভিড় করে। এদের রাতে থাকার জন্য ছোট ছোট খুপরি তৈরি করে দিতে গ্রেট খান নির্দেশ দিয়েছেন; আর এখানে থাকার সময় তিনি পাখির খেলা অনেক উপভোগ করেন। আর প্রচণ্ড শীতের সময় যখন তিনি এখানে থাকেন না তখনো তার দরবার যেখানেই বসুক না কেন উটের পিঠে করে এখান থেকে তার কাছে পাখি পাঠানো হয়। এই প্রদেশ ছেড়ে এসে, এবার আমরা উত্তর-পূর্বে তিন দিন পথ চলব।

৬১

শাণ্ডু শহরে কুবলাই খানের মনোরম প্রাসাদ আর সেই রাজকীয় প্রাসাদের রীতি

শেষবার উল্লেখ করা সেই শহর ছেড়ে উত্তর-পূর্বে তিন দিনের পথ গেলে, আপনি শাণ্ডু [শাংটু] নামের এক শহরে এসে পৌঁছবেন, বর্তমান শাসক গ্রেট খান কুবলাই এই নগর পত্তন করেন। এখানে তিনি শ্বেত পাথরসহ অন্যান্য মূল্যবান পাথর দিয়ে বিশাল একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছেন, দক্ষ নির্মাণশৈলী, আভিজাত্য আর নান্দনিকতার দিক দিয়ে যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার।

এর সভাকক্ষ আর শোবার ঘর সর্বত্রই গিলটি করা, ভেতরের সব কিছু পরিপাটি আর সুন্দর। সামনের দিকে এটি শহরের দিকে মুখ করে তার শোভা বর্ধন করছে, এর বাকি তিন দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আর এই প্রাসাদ সমতলের ষোল মাইল ঘিরে এর প্রাচীরের প্রান্ত বরাবর প্রসারিত, যেখান দিয়ে এতে

প্রবেশের কোনো ব্যবস্থা নেই। রাজকীয় উদ্যানের সীমানার ভেতর মনোরম তৃণ আচ্ছাদন আর চারণভূমির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত ছোট নদীর জলধারা আর তার চারপাশে হরিণ ও ছাগলসহ বিভিন্ন পশু চড়ে বেড়ায়, খেলুড়ে বাজ আর অন্যান্য ধাওয়া করা পাখিদের খাবারের ব্যবস্থার জন্যই এদের পোষা হয়, আশপাশেই এইসব পাখিদের খোঁয়াড়। এসব পাখির প্রজাতির সংখ্যা দুই শতের বেশি, আর বাজপাখির সংখ্যা বলতে গেলে গুনাগুনতির বাইরে; গ্রেট খান প্রতি সপ্তাহে একবার নিজে এদের খোঁজখবর নেবার জন্য এখানে আসেন। আর প্রায়ই তিনি শিকারের জন্য তার সংরক্ষিত বনে যান, তখন ঘোড়ার পিঠে করে তিনি একটি কিংবা এরও বেশিসংখ্যক ছোট চিতাবাঘ সঙ্গে নিয়ে ফিরেন, সেই সময় এদের দেখভালের জন্য সাথে প্রশিক্ষিত কর্মী থাকে; তার কথামতো তাদের রাজকীয় চারণভূমিতে ছেড়ে দেবার পর, তৎক্ষণাৎ তারা সেই বাজের খাবারের জন্য পালা হরিণ বা ছাগল ধরতে শুরু করে। সেই দৃশ্য দেখে তিনি খুব আনন্দে অবসর যাপন করেন।

এই মাঠের ঠিক মধ্যখানে, যেখানে মনোরম একটি কুঞ্জবন রয়েছে, তার পাশে তিনি একটা রাজকীয় ভবন তৈরি করিয়েছেন, গিল্টি আর বার্নিশ করা এর থামগুলো খুবই চমৎকার, এ ধরনের প্রতিটা স্তম্ভ ঘিরে ড্রাগন আঁকা আছে, যার লেজও থামগুলোর মতোই গিল্টি করা, আর সেই ড্রাগনের মাথাগুলো ছাদ বরাবর তাক করে রাখা, আর এর নখ ডানে-বামে প্রসারিত। এবং আর সব ভবনের মতো এই দালানের ছাদও বাঁশ দিয়ে বানানো এবং তা এমনভাবে বার্নিশ করা যাতে ভিজে গিয়ে এর কোনো ক্ষতি হতে না পারে। এ ধরনের কাজে তিন বিঘত পরিধি আর ষাট ফুট দৈর্ঘ্যের বাঁশ ব্যবহার করা হয় এবং বৃষ্টির জল নিষ্কাশনে নালা তৈরির জন্য তা কেটে সমান দু'ভাগে ভাগ করে, উপর-নিচ বরাবর সেই ভবনের ওপর আচ্ছাদন দেয়া হয়। বাতাসের ঝাঁপটা থেকে ছাদ রক্ষা করতে, প্রতিটি বাঁশের প্রান্ত কাঠামোর কিনারার সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয়। ভবনের ভার নেবার জন্য তাঁবুর মতো করে এর প্রতিপার্শ্বে দুই শতের অধিক রেশমের মজুত দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। এমনটা না করা হলে এ ধরনের হালকা উপকরণের জন্য প্রচণ্ড বাতাসে সেটা উল্টে যেতে পারে। সম্পূর্ণ নির্মাণকাজটি এমন দক্ষতার সঙ্গে করা হয় যেন সম্রাটের ইচ্ছে অনুসারে এর প্রতিটা অংশ খুলে নিয়ে আবারও অন্য কোথাও স্থাপন করা যায়। এখানকার মৃদু তাপমাত্রা আর স্বাস্থ্যকর বাতাসের জন্যই তিনি এই জায়গাটি বেছে নিয়েছেন, আর বছরের তিন মাস অর্থাৎ জুন, জুলাই আর আগস্টে তিনি এই জায়গাতে অবস্থান করেন, এ কারণেই এখানে নিজ বাসস্থান স্থাপন করান। প্রতি বছরের শেষ চন্দ্র মাসের আটাশতম দিন, বরাবরের মতো এটা তার একটা প্রতিষ্ঠিত রীতি, এই দিনে তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখা স্থানে গমন করার উদ্দেশ্যে এই জায়গা ত্যাগ করেন, তার আগে এর জন্য নির্দিষ্ট কায়দায় বলি দেয়া হয়। এবার সেই বলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা যাক।

এ কথাও জানা যায় যে খানের আস্তাবলে দশ হাজারেরও বেশি ঘোড়া আর ঘোটকী রয়েছে, যার সবগুলো তুষারের ন্যায় শুভ্র। চেঙ্গিস খানের বংশধরদের বাইরে অন্য কেউই সেই সব ঘোটকীর দুধ পান করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না, কেবল হরিয়াড নামের অন্য একটি পরিবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সম্রাটের উপস্থিতিতে এক যুদ্ধে পরাক্রমের সঙ্গে লড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনায়, পরিবারটিকে রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে এমন অভূতপূর্ব সম্মানের ভাগিদার করা হয়।

এই সব ঘোড়ার প্রতি এতটাই সম্মান দেখানো হয় যে, এমনকি যখন তারা রাজকীয় চারণভূমি বা বনে ঘাস খেতে থাকে তখন কেউ এদের সামনে দাঁড়াবার সাহস দেখায় না, বা অন্যভাবে বলতে গেলে এদের চলাফেরার ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হয়। যেসব জ্যোতিষীকে তিনি নিজের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, সেই সঙ্গে যারা জাদুবিদ্যায় অগাধ জ্ঞানের অধিকার হয়ে তার সেবায় অঙ্গীকারাবদ্ধ, প্রতি বছর, আগস্ট মাসের চাঁদের আটাশতম দিনে তারা তাদের সকল দেব-দেবী আর আত্মার সম্মানে এই সব ঘোটকী থেকে সংগ্রহ করা দুধ বাতাসে ছিটিয়ে দেয়। কখনো কখনো এ ধরনের অনুষ্ঠান চলাকালে এইসব জ্যোতিষীরা বা জাদুকর নামে ডাকা এই সব লোকেরা চমৎকারভাবে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকেন; এ সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে, তারা কুবলাই খান তখন যেই প্রাসাদে অবস্থান করছেন তার ছাদে আরোহণ করেন, আর জাদুর ক্ষমতাবলে বৃষ্টি পড়া রোহিত করেন এবং ঝড়কে দূরে ঠেলে দেন। দেশের চারদিকে তখন আগের মতোই ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাঁপটা বইতে থাকে, কিন্তু তারপরও প্রাসাদ তখনো সেই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পুরোমাত্রায় অনাক্রান্ত থেকে যায়। যেসব জাদুকরেরা এ ধরনের জাদু প্রদর্শন করে লোকেরা তাদের তিব্বত, কাশ্মীর নামে ডাকে, যা দু'টি পৌত্তলিক জাতির নাম। তারা এমন ইতর ধারণা পোষণ করে যে স্রষ্টার সহায়তায় তাদের এই সমস্ত কাজকারবার প্রভাবিত হতে পারে। তাই তারা নিজেদের ও যারা তাদের দেখছে তাদের সামনে মানসম্মান ত্যাগ করে নিজেদের নোংরা আর অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করে। সব সময়ই এরা নিজেদের মুখমণ্ডল অধৌত রাখে, আর চুলে কখনো চিরুনি করে না, এভাবে তারা পুরোপুরি জঘন্যভাবে জীবনযাপন করে।

এরা নেশাগ্রস্ত, আর এই অবস্থায় তারা পশুবৎ আর বীভৎস সব কাজ করে, যখন কোনো অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তারা সেই মরদেহ বয়ে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সেটার মাংস গোগ্রাসে ভক্ষণ করে। তবে যারা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাদের মাংস এরা কখনো খায় না।

উল্লেখিত বিস্ময়কর কাজ করা ছাড়াও এরা দক্ষতার দিক থেকে প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে আলাদা, একইভাবে এদের বেসি নামে অভিহিত করা হয়, যা তাদের ধর্মীয় গোত্র বা মার্গ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। পৈশাচিক বিদ্যায়

এরা খুবই দক্ষ, বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন থাকার পরও ধারণা করা হয় এরা তাদের মর্জি অনুসারে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। গ্রেট খান তার হল ঘরে খাবার খেতে বসার পর—এই বইতে ভিন্ন অধ্যায়ে এর সব কিছুই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে— হল ঘরের মাঝখানের টেবিলটা বারো ফুট উচ্চতায় তুলে ধরা হয়, আর এর কিছুটা দূরে একটি বৃহৎ আকারের একটি বুফে, যেখানে সব ধরনের পানীয়ের আয়োজন করা থাকে। সেখানে তারা তখন, তাদের অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সহায়তায় পিপে ভর্তি ওয়াইন, দুধ, অথবা যেকোনো ধরনের পানীয় দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাপ ভরতে থাকে। পরিচারকের কোনোরকম সহায়তা ছাড়াই আর দশ কদম দূর থেকেই কুবলাই খানের হাতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত পানীয় ভরা কাপ বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে! আর গ্লাসটা খালি হবার পর আবারও সেটা আপনা-আপনি ভেসে ভেসে তার আগের জায়গাতে ফিরে যায়; এবং সেসব দেখার জন্য সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণ করা অতিথিদের সামনেই এমন আজগুবি ঘটনা ঘটতে থাকে।*

এইসব বেসিরা, উৎসবের দিনে তাদের দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গ্রেট খানের প্রাসাদে আসে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলে : "জনক, এ কথা তো আপনার জানাই রয়েছে যে যদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে সম্মান আর বলি প্রদান করা না হয়, তাহলে প্রতিকূল ঋতুতে তিনি তার ক্ষোভ দ্বারা আমাদের পীড়া দিবেন, খরা দিয়ে শস্য কেড়ে নেবেন, আমাদের আর আমাদের পশুদের প্লেগ দ্বারা আক্রান্ত করবেন। এই কারণে আমরা আপনার কাছে কালো মাথাওয়ালা নির্দিষ্টসংখ্যক ভেড়া ভিক্ষে চাইছি, সেই সঙ্গে ধূপ-ধুনা আর সুগন্ধি কাষ্ঠ যাঞ্চা করছি, যাতে করে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকতার সহিত প্রথানুগ আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারি।"

তাদের এই সব কথা সরাসরি গ্রেট খানের সামনাসামনি বলার সুযোগ হয় না, কথাগুলো তারা বলে উচ্চপদস্থ কোনো অফিসারের কাছে, যিনি তাদের হয়ে সেসব কথা তার সামনে উপস্থাপন করেন। এ ধরনের আবেদন শ্রবণ করার পর কখনো তিনি তাদের সেসব বায়না পুরোপুরি পূরণ করতে পিছপা হন না। সেইমত, নির্দিষ্ট দিনে, তারা ভেড়াগুলো বলি দেন এবং দেব-দেবীর মূর্তির সামনে মদে ডুবিয়ে সেইসব ভেড়ার গোস্ত সেদ্ধ করে, পূজার সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।

---

* এসব সহ আরো অনেক যাদুবিদ্যা এখনও লাল লামারা চর্চা করে থাকে। হলদে লামারা এসবের বিরোধী। তবে তিব্বতের বড়-বড় আশ্রমে এধরনের একজন যাদুকর দেখতে পাওয়া যায়। এয়লের মতে এধরনের যাদুবিদ্যা চর্চাকারীকে তাদের এই রহস্যময় বিদ্যা ঐতিহ্য অনুসারে বিশেষ দীক্ষা প্রমাণের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে যায়। যার কোন কিছুই এরা লিখে রাখে না। এ ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু তথ্য প্রমাণও উপস্থাপন করে গেছেন।

এই দেশে অনেক বড় বড় আশ্রম আর ধর্মাশ্রম রয়েছে, সেগুলোর কোনো কোনোটা এতটাই প্রশস্ত যে তার আকার অনেকটা ছোট শহরের চেয়ে বড়। এর কোনো কোনোটাতে দুই হাজারের অধিক সন্ন্যাসীর বাস, যারা তাদের লোকেদের ধর্মীয় রীতি-প্রথা অনুসারে নিজ নিজ ধর্মের সেবায় নিয়োজিত আছেন। এরা রাজ্যের অন্য সব অধিবাসীদের চেয়ে ভালো পোশাক পরিধান করে, মাথার চুল আর দাড়ি কামিয়ে রাখে, আর সম্ভাব্য সব গাম্ভীর্যের সাথে বাদ্য গীতের মাধ্যমে আলোকসজ্জাসহকারে তাদের দেব-দেবীর সেই অনুষ্ঠান পালন করে। এই শ্রেণির কেউ কেউ বিয়েথাও করে।

এখানে আরো একটি ধর্মের প্রচলন রয়েছে, তাদের সদস্যদের নাম সেনসিন, যারা খুব কঠোরভাবে মিতাচারের সঙ্গে নির্মম নীতিপরায়ণতার চর্চা করে। এরা খাদ্য হিসেবে শুধু ভুসি ছাড়া অন্য কিছু খায় না, আর গরম জলে মিশিয়ে তা ভক্ষণ করে। তাদের একমাত্র খাবার হলো : ভুসি, আর এটা ছাড়া অন্য কিছু নয়; আর শুধু পানি পান করে। এই গোত্রের লোকেরা কখনো কখনো অগ্নির পূজা করে, আর বাকি সব কিছুকে ব্যতান্ত্রিক হিসেবে গণ্য করে, অন্যদের মতো এরা মূর্তি পূজা করে না। এই দুই গোত্রের রীতি-নীতির একটি মাত্র জাগতিক পার্থক্য বিদ্যমান, শেষের দলটি যারা কখনো বিয়ে করে না। অন্যদের মতো এরাও দাড়ি আর মাথা কামায়, শণের তৈরি কালো আর নীল রঙের পোশাক পরিধান করে। আর পরিধানের বস্ত্র রেশমের হলেও তার রং একই থাকে। এরা শক্ত তক্তপোষের ওপরে নিদ্রা যায়, আর বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের লোকেদের চেয়ে কষ্টকর জীবনযাপন করে।

এবার আমরা এই বিষয় ছেড়ে বিস্ময়কর জাঁকজমকপূর্ণ রাজার রাজা; রাজাধিরাজ তাতারদের সার্বভৌম সম্রাট কুবলাই খানের কথা বলব।

অধ্যায়-২

গ্রেট কুবলাই খান, তার রাজধানী, প্রাসাদ এবং সরকার। সেই সঙ্গে দক্ষিণ আর পশ্চিমের শহর আর প্রদেশসমূহের বর্ণনা

১
কুবলাই খানের প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড, বর্তমান সম্রাট এবং তার অভূতপূর্ব ক্ষমতা

এই অধ্যায়ে আমরা মার্কো পলোর সময়ে চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গ্রেট খানের মহৎ আর প্রশংসনীয় সব অর্জন তুলে ধরব, কুবলাই খানকে এর পরের লাইন থেকে আমাদের দেশের আদলে লর্ড অব দ্য লর্ড বা রাজার রাজা হিসেবে উল্লেখ করা হবে এবং সঙ্গতভাবেই তার এমন একটি উপাধির ন্যায়সঙ্গত দাবিদার হবার মতো অনেক ভালো ভালো কারণ রয়েছে, কেননা সংখ্যার দিক থেকে তার অধীনস্ত এলাকা আর এর বিস্তৃতি এবং সেখান থেকে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ অনেক বেশি, আর তিনি যে সকল এলাকা শাসন করছেন সমকালীন বিশ্বের আর কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র তার মত এমন অখণ্ড আনুগত্যের অধিকারী নন। সবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের এমন দাবির সমর্থনে এর সবই আমাদের লেখার মাঝে ক্রমশ প্রামাণ্যভাবে ফুটে উঠবে।

২
গ্রেট খানের চাচার বিদ্রোহ

ইতোমধ্যে জানা গেছে কুবলাই খান প্রথম চৈনিক সম্রাট চেঙ্গিস খানের বংশোদ্ভূত এবং তার আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী, আর তিনি তাতারদের ন্যায়সঙ্গত সম্রাট। তিনি ষষ্ঠম গ্রেট খান এবং ১২৫৬ সালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তার আধিপত্যের বিক্রমে, তার সদ্‌গুণাবলি এবং তার দূরদর্শিতা, ও বিরোধী পক্ষকে ভাইয়ের মতো কাছে টেনে নেবার মানসিকতায় অনেককেই বড় পদমর্যাদা আর পরিবারের সদস্যদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যদিয়ে এই সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের অনুবর্তন ছিল আইনানুগ এবং সঠিক।

বর্তমান বছর, ১২৯৮-তে তার রাজত্বের বেয়াল্লিশ বছর চলছে এবং এখন তার পুরোপুরি পঁচাশি বছর বয়স।* সিংহাসনে আরোহণের আগে তিনি তার পূর্বতনের অধীনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন এবং বীরত্বপূর্ণ যেকোনো অভিযানে অংশ নেবার চেষ্টা করতেন। কেবল কাজেকর্মেই তিনি অসমসাহসী ছিলেন না, বিচার-বিবেচনা আর সামরিক দক্ষতার দিক দিয়ে তাকে সবচেয়ে সক্ষম আর সফল সেনানায়ক হিসেবে গণ্য করা হতো, এর আগে তাতারদের নেতৃত্বে এমন কাউকে দেখা যায়নি। বলা যায়, এদিক দিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজের অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিলেন এবং অভিযান সম্পর্কে নিজের সন্তানদের আর তার অধিনায়কদের মনে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পেরেছিলেন, এবার এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

একজন প্রধানের নাম নায়েন, সবেমাত্র ত্রিশ বছর বয়স, কুবলাইয়ের সঙ্গে তার আত্মীয়ের সম্পর্ক, বংশানুক্রমিকভাবেই তিনি অনেক শহর আর প্রদেশের ওপর রাজত্ব করছিলেন। তাতে করে তিনি তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যর বিশাল একটা বাহিনীর অধিকারী হন। যদিও, তার পূর্বসূরিরা গ্রেট খানের অনুগত ছিলেন। নিজেকে এত বড় একটা সামরিক শক্তির কর্ণধার হিসেবে আবিষ্কার করার পর, নিজের টগবগে তারুণ্যের আত্ম-অহমিকায় প্রণোদিত হয়ে, সে তার আনুগত্য জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের সার্বভৌমত্ব দখলে নেবার পরিকল্পনা আঁটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিগতভাবে সে বৃহত্তর তুর্কির কাছাকাছি অপর এক ক্ষমতাধর প্রধান কাইডুর কাছে বার্তাবহ প্রেরণ করে। গ্রেট খানের ভাগ্নে হওয়া সত্ত্বেও আগেকার কোনো অসন্তোষের কারণে নায়েন তার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করত এবং অনেক দিন ধরে মনে মনে প্রতিশোধ নিতে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার দুষ্ট ইচ্ছা পুষে রেখেছিল।

কাইডু নায়েনের কাছে যে জবাব পাঠান তা ছিল খুবই সন্তোষজনক, আর সেই মতো সে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈনিকের বাহিনী প্রেরণ করে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

অতি শীঘ্র এই দুই রাজা তাদের বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করে, তবে তাদের এই প্রচেষ্টার কথা খুব একটা গোপন থাকে না, কুবলাই খানও সেটা জানতে পারেন।

৩

গ্রেট খান যেভাবে নায়েনের বিরুদ্ধে অগ্রসন হন

তাদের প্রস্তুতির এই খবর জানার পর গ্রেট খান নায়েন আর কাইডুর রাজ্যের সকল পথ অবরোধ করতে খুব একটা সময় নষ্ট করেন না, যাতে করে তাদের

---

* ১২৯২ সালে পলোরা জাহাজে করে চীন থেকে দেশের পথে রওনা হন, আর তাই মার্কো পলোর পক্ষে এ কথা জানা সম্ভব হয়নি যে কুবলাই খান ৭৮ বছর বয়সে ১২৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিরুদ্ধে তার ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই তারা জানতে না পারে। তারপর তিনি খুব দ্রুত সেনা সংগ্রহের আদেশ প্রদান করেন, মাত্র দশ দিনে পুরো সেনাবাহিনী গৃহিত পদক্ষেপ করে কানবালু [পিকিং] শহরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। নিজের কাছের লোকদের বিশেষ করে তার বাজরক্ষক আর ঘরের কাজের লোকসহ তিন লাখ ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়।

বিশ দিনের মাথায় তাদের সবাই তৈরি হয়ে যায়। ক্যাথির বিভিন্ন রাজ্যের চলমান নিরাপত্তা জোরদারের জন্য তিনি সেনা বিন্যাস করেন, এতে অপরিহার্যভাবে ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন সময়ের দরকার হয়। এই সময়ে শত্রু তার গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারে এবং এতে করে তারা আরো সংহতভাবে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে, যাতে করে তারা আরো ভালোভাবে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে।

তার উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নায়েনকে একা অবস্থায়, কাইডুর সাথে মিলিত হবার আগেই সত্বর তার ক্ষমতা সমূলে ধ্বংস করে দেয়া, এ ধরনের কৌশল সব সময়ই বিজয়ে সহায়ক।

এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে, গ্রেট খানের বাহিনী, সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতোই ক্যাথি আর মানজির সব প্রদেশেও উপস্থিত রয়েছে, এমন আরো অনেক অবাধ্য আর রাজবৈরী লোক রয়েছে, যারা সব সময়ই তার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত। এই কারণে এসকল প্রদেশের বৃহৎ শহর আর অসংখ্য লোকেদের নিরাপত্তার জন্য সেনা মোতায়েন রাখা দরকার, আর তাই শহর থেকে চার-পাঁচ মাইলে দূরে এভাবে তাদের মোতায়েন রাখা হয়, যাতে খুব সহজেই তারা ইচ্ছেমতো যখন-তখন সেখানে যাতায়াত করতে পারে। গ্রেট খানের এই সব সেনা চৌকির সৈন্য প্রতি দুই বছর অন্তর পরিবর্তন করা হতো এবং তাদের কমান্ডিং অফিসারের ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম প্রচলিত। ঝুঁকি এড়াবার এমন আগাম হুঁশিয়ারিমূলক ব্যবস্থার কারণে সেখানকার নাগরিকেরা পুরোপুরি তার অনুগত এবং তার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না। কেবল প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সম্রাটের রাজস্ব খাত থেকে সেনা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না, বরং এর পাশাপাশি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ঘোড়াসহ অন্যান্য গবাদিপশু আর তার দুধও এই কাজে ব্যবহৃত হয়, এসব পশুর উৎপাদিত দুধ পাশের শহরে বিক্রয় করা হয়। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে, ত্রিশ, চল্লিশ এমনকি ষাট দিনের দূরত্বে তাদের মোতায়েন রাখা হয়। যদি এসব সৈন্যের অর্ধেকও সংগ্রহ করা হয় তাহলে এর সংখ্যা বিস্ময়কর আর অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

উপরে বর্ণনামত তার সৈন্যবাহিনী গঠিত হবার পর, গ্রেট খান নায়েনের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন এবং রাত-দিন অব্যাহতভাবে পথ চলার পর পঁচিশ

দিনের মাথায় তিনি কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছেন। এতটা সতর্কতার সঙ্গে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হয় যে সেই রাজা আর তার অনুচরেরা পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না, এ সময় সব সড়ক আর পথঘাটে অতন্দ্র পাহারা বসানো থাকে, ফলে পালাবার চেষ্টা করলেই যে কাউকে বন্দি করা হয়।

৪

গ্রেট খানের সঙ্গে নায়েনের যুদ্ধ

নায়েনের সেনাবাহিনী সমতলের যেখানে অবস্থান নিয়েছিল তার ঠিক অন্য পাশে একটি পাহাড়ে পৌঁছাবার পর, কুবলাই তার সেনাদের যাত্রা বিরতি ঘোষণা করেন, তাদের দু'দিনের বিশ্রাম দেন। শেষের দিন ভোরে বিজয়ের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে, তারা আনন্দের সঙ্গে পাহাড়ে আরোহণ করে, নায়েনের সেনাদের সামনে নিজেদের উপস্থাপন করে, সে সময় তাদের পাহারা অনেক শিথিল ছিল, অগ্রবর্তী কোনো দল বা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য কেউই ছিল না, এমনকি অধিনায়ক নিজেও তার প্রিয় এক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁবুতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে সে নিজের সেনাদলকে সর্বতোভাবে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কাইডুর সঙ্গে মিলিত হবার পথ যাতে কোনো ক্রমেই অবরোধের মধ্যে না পড়ে সে জন্য বিলাপ করতে থাকে।

চারটা হাতির পিঠে বসানো একটা কাঠের প্রাসাদের ওপর কুবলাই খান অবস্থান নেন, সেই হাতিগুলোর শরীর আগুনে শক্তকরা পুরু চামড়ার বর্ম, আর তার ওপরে স্বর্ণ খচিত কাপড় দিয়ে ঢাকা। সেই প্রাসাদের ভেতরে অনেক তীরন্দাজ, আর এর মাথায় চাঁদতারা খচিত রাজকীয় দণ্ড শোভা পাচ্ছিল।

তাঁর এই সেনাবাহিনীতে ছিল ত্রিশ ব্যাটালিয়ন ঘোড়া, যার প্রতিটি ব্যাটালিয়নে ছিল দশ হাজারের অধিক জনবল, যাদের প্রত্যেকে তীর-ধনুকে সজ্জিত, তিনি এই সেনা দলকে তিনটি বড় ভাগে ভাগ করে ডানে-বামে এমনভাবে মোতায়েন করেন যাতে তা নায়েনের বাহিনীর পাঁজর গুঁড়িয়ে দিতে পারে। প্রতিটি ঘোড়ার ব্যাটালিয়নের সামনে তরবারি আর বর্শা হাতে পাঁচশত পদাতিক মোতায়েন করা হয়, যারা অশ্বারোহী সেনাদের সহযোগে লড়তে প্রস্তুত, আর এরা ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে অবস্থান বদল করে প্রতিপক্ষের অশ্বারোহী আর বর্শা বহনকারী সৈনিকদের উপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করতে সক্ষম।

যাবতীয় যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পরপর, অসংখ্য শিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র অবিরাম বাজতে শুরু করে, সেই সঙ্গে তাতারের রীতি অনুসারে যুদ্ধ শুরুর আগে রণসঙ্গীত গাওয়া হয়, করতাল আর ঢাকের সংকেতের মধ্যদিয়ে তা শুরু হয়, এই সঙ্গীত শুনতে খুবই চমৎকার।

গ্রেট খানের আদেশে বিশাল বিশাল ঢাক বাজতে শুরু করলে, ডান ও বাম অংশে সংকেত পৌঁছে যায়। এর পরপরই রক্তক্ষয়ী লড়াই শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছোড়া তীরে আকাশ-বাতাস মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে অসংখ্য শত্রুসেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চারদিকে শুধু মানুষ আর ঘোড়ার চিৎকার, আহাজারি আর কান্নার রোল, ভয়ানক সেই শব্দে যে কারো মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। তীর ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে, শত্রুপক্ষ বর্শা, তরবারি, আর লোহার গদা হাতে তাদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে জড়িয়ে যায়; আর এভাবে একের পর এক তাদের হাতে বলি হতে থাকে এবং মানুষ আর ঘোড়ার কুচি কুচি করা অংশের বিশাল একটা স্তূপ চারিদিকের মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে, তাতে করে এর ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়া দু'পক্ষের জন্যই একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সৌভাগ্য সেদিন দিনমান উভয় পক্ষের কাছে অনিরূপিতই থেকে যায়, এতে উভয় পক্ষই টলে ওঠে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিবদমান উভয় পক্ষের কাছে বিজয় দোদুল্যমান ঠেকতে থাকে; কারণ নায়েনের লোকেরা তাদের মনিবের প্রতি এতই অনুগত যে তারা শত্রুর হাত থেকে পালাবার বদলে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায়।

তারপরও, অবশেষে, একপর্যায়ে নায়েন বুঝতে পারে খুব কাছ থেকে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, তখন পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হলে তাকে বন্দি অবস্থায় কুবলাইয়ের সামনে হাজির করা হয়, তিনি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন।

৫
কীভাবে গ্রেট খান কর্তৃক নায়েনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়

দুটা কার্পেটের মধ্যে ভরে তার শরীর থেকে প্রাণবায়ু* বেরিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত নায়েনকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকানো হয়, এমন বিস্ময়করভাবে দণ্ড কার্যকর করার কারণ যাতে রাজবংশের কারো রক্তের সাক্ষী সূর্য এবং বাতাস পর্যন্ত হতে না পারে। যেসব সৈনিকেরা যুদ্ধের পরও বেঁচে ছিলেন তারা শীঘ্র তার কাছে আত্মসমর্পণ

---

* ১৬৮৮ সালে সিয়ারার রাজাকে বিশাল এক লোহার হামানদিস্তার ভেতরে পুরে কাঠের মুষলের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রাজকীয় রক্ত মাটিতে পড়া উচিত নয়, এমন বিশ্বাস থেকেই সিয়ামের লোকেরা রাজ অপরাধীর সাজা প্রদানে এমন রীতি অনুসরণ করে আসছে। এতে করে মাটির সঙ্গে মিশে স্বর্গীয় রক্তের দূষিত হওয়া রোধ হয়। ইংল্যান্ডের পশ্চিম সাসেক্স এর একটি অস্ট্রেলিয়ান গোত্রও উৎসবের দিনে রক্ত মাটিতে পড়তে দেয় না, সেখানকার লোকেরা মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এমন জায়গা স্থায়ীভাবে ঢেকে রাখে। ফ্রাজারের লেখা গোল্ডেন বাউ বইয়ের ট্যাবুয়েড থিংস অধ্যায় দেখুন।

করে এবং কুবলাইয়ের বশ্যতা স্বীকার করে শপথ নেয়। এদের সবাই খোরজা, কারলি, বার্সকল এবং সিটিংগুই নারের চারটি বিশাল প্রদেশের অধিবাসী।

নায়েন, ব্যক্তিগতভাবে বাপ্তাইজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও, কখনো তিনি জনসম্মুখে খ্রিস্টান ধর্ম চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেননি, এ কথা চিন্তা করে, সেই শপথ অনুষ্ঠানে, তার ব্যানারে ক্রুশ এঁকে দেয়া হয়, যুদ্ধ শেষে নায়েনের সেনাবাহিনীতে হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া প্রচুরসংখ্যক খ্রিস্টান ছিল। ইহুদি** আর মুসলিমরা সেই ক্রুশ আঁকা ব্যানার নামিয়ে ফেলে, এর মাধ্যমে তারা খ্রিস্টান অধিবাসীদের নিয়ে বিদ্রূপ করে, বলে, "তোমাদের পতাকা কোনটা সেটা আগে দেখো, আর যারা এর অনুসরণ করবে তাদেরকে হত্যা করা হবে!"

এতে করে খ্রিস্টানরা গ্রেট খানের কাছে অভিযোগ করতে বাধ্য হয়, তিনি আগের পতাকাটিই তাদের সামনে রাখার নির্দেশ দেন এবং এর জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন। "যদি খ্রিস্টের এই ক্রুশ," তিনি বলেন, "প্রার্থনার মাধ্যমে নায়েনের সুবিধা আদায়ের কথা প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে তার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর অবিচারের কারণেই সেটি হয়েছে, আর এধরনের কোনো অপরাধী এর মাধ্যমে সুরক্ষা পেতে পারে না। এর জন্য কেউ বলতে পারে না কারো প্রতি খ্রিস্টানদের সদা প্রভু অবিচার করেছেন, যিনি নিজেই তার শুভত্ব আর সুবিচারের একমাত্র উদাহরণ।"

৬
বিজয়ের পর গ্রেট খানের কানবালু শহরে প্রত্যাবর্তন এবং খ্রিস্টান-ইহুদিসহ অন্যান্য বিজিতদের প্রতি তার সম্মান

গ্রেট খান, বিজয়ের সংকেত পাবার পর, অত্যন্ত জাঁকজমক আর বিজয়োল্লাসের সঙ্গে রাজধানী শহর কানবালুতে [পিকিং] ফিরে আসেন। নভেম্বর মাসে তার এই ফেরার ঘটনা ঘটে এবং ফেব্রুয়ারি আর মার্চ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন, শেষের এই মাসে আমাদের ওখানে ইস্টারের উৎসব উদ্‌যাপন হয়। আমাদের এই ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা জানতে পারার পর তিনি সব খ্রিস্টানকে ইভানজেলিস্টের গসপেল রয়েছে এমন একটি পুস্তকসহ তার সামনে হাজির হবার নির্দেশ প্রদান করেন।

** ১১৬৩ সাল থেকে পারস্যের ইহুদিরা চীনে বসতি স্থাপন করে। ১২৭৯-তে কা'ই-ফেঙ্গ-এ তাদের পুরাতন সিনাগগ পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং ১৩৮৬-এ মিং রাজবংশের প্রথম সম্রাট সে দেশে ইহুদিদের একখণ্ড ভূমি উপহার দেন, এর পর থেকে সেখানে তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছে। হেনরি কর্ডিয়ারের লেখা লেস জিউস এন চীন, জিউস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং পার্লম্যানস-এর লেখা ইতিহাসবিষয়ক বই ওই দ্য লিউস ইন চায়না বইসমূহ দেখুন।

তার কথামতো সবাই আসলে, ধূপের সুগন্ধি ছড়িয়ে আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে সাগ্রহে তিনি তাতে চুমু খান এবং উপস্থিত সকল অভিজাতরাও এই একই কাজ করেন। বড়দিন আর ইস্টারের মতো খ্রিস্টানদের সব ধর্মীয় উৎসবের দিনেও গতানুগতিকভাবে এই একই কাজ করতে থাকেন; সেই সঙ্গে তিনি ইহুদি, মুসলমান আর পৌত্তলিকদের সব ধর্মীয় উৎসবও একইভাবে গুরুত্বসহকারে উদ্‌যাপন করতেন। এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন: "চারজন নবি রয়েছেন যারা মানবজাতির ভিন্ন চারটি দলের কাছে খুবই সম্মানিত ও পূজ্য। খ্রিস্টানরা প্রভু যিশুকে তাদের ত্রাতা বলে মানে; মুসলমানেরা মুহাম্মদকে; ইহুদিরা মুসাকে; আর পৌত্তলিকদের কাছে, তাদের দেব-দেবীর মাঝে সগো-মম্বার-কান সবচেয়ে প্রখ্যাত। আমি এই চারজনকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করি এবং তাদের মধ্যে যিনি স্বর্গের বিচারে শ্রেষ্ঠ তার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাই।" তবে সম্রাটের আচার-আচরণে এ কথা খুবই স্পষ্ট ছিল যে তিনি খ্রিস্টান ধর্মকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন, আর কোনো কিছুতেই তিনি এত বেশি পবিত্রতা আর পুণ্যের সন্ধান পাননি।

এতসবের পরও, যে কারণেই হোক, তিনি তাদের শোভাযাত্রার সময় সামনে ক্রুশ বহনের অনুমতি দেন, কেননা এতে করে যে কেউ নিজেকে খ্রিস্টের মহিমান্বিত মৃত্যুর ভাগিদার হিসেবে মর্যাদাবান একজন খ্রিস্টান-এর মতো করে উপস্থাপন করতে পারে। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, খ্রিস্টান বিশ্বাসের প্রতি তিনি যদি এতই দরদ দেখিয়েছেন তবে নিজে কেন নিশ্চিতভাবে তা গ্রহণ করেননি?

তার এমন কাজ না করার পেছনে কারণ হলো, তিনি নিকোলো আর মাফিও পলোকে পোপের কাছে তার দূত হিসেবে প্রেরণের সময় অল্প কিছু কথার মাধ্যমে পোপের কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। "কেন আমাকে", তিনি জানতে চেয়েছিলেন, "একজন খ্রিস্টান হতে হবে? আপনি নিজেও অবশ্যই এ কথা স্বীকার করবেন যে এই সব দেশের খ্রিস্টানেরা অজ্ঞ, তারা নিজেদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়, তাদের কেউই বিস্ময়কর কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখে না; আর এখানকার পৌত্তলিকেরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আমি যখন আমার সভাকক্ষের মাঝখানে বসে থাকি তখন আমার হাতে আপনা-আপনি ওয়াইনসহ অন্যান্য পানীয়পূর্ণ পাত্র চলে আসে, তাতে কোনো মানুষের স্পর্শের দরকার হয় না, আর আমি সেই পাত্র থেকে পানীয় পান করি। তাদের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা প্রাকৃতিক অনেক উপহারাদিসহ স্বর্গের যেকোনো অনুগ্রহ লাভে সক্ষম। আপনি জানেন যে তাদের মূর্তিসমূহের কথা বলার ক্ষমতা রয়েছে, আর তারা দরকারে ভূতভবিষ্যৎ সব কিছু আগেভাগে বলে দিতে পারে।

"আমার কি তাহলে খ্রিস্টের বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত হয়ে, একজন খ্রিস্টান হওয়া সাজে, আমার সভার অভিজাত আর অন্যান্য যারা এই ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েনি তারা তখন অবশ্যই আমার কাছে ব্যাপ্টিজম আর খ্রিস্টানিটি** গ্রহণের উপযুক্ত কারণ জানতে চাইবেন। 'কোন বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে', তারা জানতে চাইবে, 'এর যাজকেরা কী এমন বিস্ময়কর কাজ করতে পেরেছে? যেখানে পৌত্তলিকেরা তাদের সাধুতা আর তাদের দেব-দেবীর সহায়তায় ঘোষণা করে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।"

"এর জবাবে তখন তাদেরকে কী বলতে হবে সেসবও আমার জানা নেই এবং তাতে করে আমার সেই কর্মকাণ্ড তাদের কাছে তথা পৌত্তলিক সমাজের কাছে প্রচণ্ড এক ভুল হিসেবে গণ্য হবে, যারা তাদের জাদুর সাহায্যে এমন সব বিস্ময়কর কাজ করতে পারে তারা খুব সহজেই তখন আমাকেও হত্যা করবে। তবে আমি, আপনি ও আপনার যাজকত্বের কাছে আমার নামে এই অনুরোধ পেশ করছি, আপনাদের নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে দক্ষ এখানে এ রকম শ'খানেক লোক প্রেরণ করুন, যারা নিশ্চিতভাবে পৌত্তলিকদের মুখোমুখি হয়ে তাদের ক্ষমতাকে জাদু হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে এবং তাদের এইসব ক্ষমতাকে নিছক বলে তুলে ধরতে সক্ষম হবে, আর এটা দেখাতে পারবে যে তারা যেসব বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড করে তা অশুভ আত্মার সাহায্য নিয়েই করে, তাই তাদের উপস্থিতিতে তাদেরকে এ ধরনের অশুভ কাজ থেকে বিরত করতে বাধ্য করতে হবে। সেসব সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করার পরই কেবল আমি তাদের ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারি এবং আমি আপনা থেকেই বাপ্তাইজ হতে পারি। তখন আমার সব অমর্ত্যেরাও আমার উদাহরণ অনুসরণ করে বাপ্তাইজ হবে এবং তখন সাধারণেরাও তা অনুসরণ করবে। শেষে এই অঞ্চলের খ্রিস্টানদের সংখ্যা আপনার দেশের অধিবাসীদের সংখ্যার চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।"

এর থেকেই বোঝা সম্ভব পোপ যদি সময়মতো গোসপেল অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি প্রেরণে সক্ষম হতেন, তাহলে গ্রেট খান অবশ্যই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতেন,

---

* এই অনুচ্ছেদের বেশির ভাগ অংশই অনুবাদের ব্যবহৃত ইয়েলের ফরালি পাণ্ডুলিপিতে দিলনা। একথা সত্য যে অন্যান্য আরো সব জ্ঞানি ব্যাক্তিদের মতই তিনি ক্রিস্টানদের যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতেন। কিন্তু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যভহারই সবসময় এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি ঈশ্বর আরাধনাকে সভ্যতার উপজাত হিসেবে বিবেচনা করতেন। তার কাছে এটা ছিল প্রজাদের শিক্ষিত করে তোলা একটা উপায় মাত্র। লামাদের মতো খ্রিস্টানরাও যথেষ্ট প্রাজ্ঞ ছিল। তাই ঘৃণার কারণে নয় বরং একশত বিজ্ঞজন পাঠাবার ব্যর্থতার কারণে। আজকের চৈনিক সভ্যতা ভিন্ন ধাঁচের। রারটান্ড রাসেল তার চৎড়নষবস ড়ভ ঈযরহধ বইতে লিখেছেন, "আমি চীন গিয়েছিলাম তাদের মাসে শিক্ষা বিলি করতে কিন্তু তার বদলে প্রতিদিনই আমি বুঝতে পেরেছি যে বিষয়ে তাদের শেখাতে গিয়েছি সে সম্পর্কে আমি কতটা কম জানি আর তাই তাদের কাছ থেকে আমি অনেক বেশি শিখেছি।"

আর সে কারণেই এমন দাবি করা মোটেই অমূলক নয় যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তার বিশেষ একধরনের অনুরাগ ছিল।

এবার আমরা আমাদের আগের বিষয়ে ফিরে আসছি, এখন আমরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখানো স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত লোকেদের প্রতি তার সম্মান আরোপ আর তাদেরকে দেয়া পুরস্কারের কথা বলব।

৭

যুদ্ধফেরত বীরদের দেয়া পুরস্কারের ধরন এবং স্বর্ণের লিপিফলক

গ্রেট খান তাঁর উচ্চপদস্থদের মাঝ থেকে বারোজনকে নিয়োগ করেন, যাদের দায়িত্ব সেনাবাহিনী আর অফিসারদের মধ্যে থেকে বিশেষ করে যারা তার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত অভিযান ও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে তাঁর কাছে যথাযথ তথ্য উপস্থাপন করা। স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে তিনি তাদের সবাইকে কর্মক্ষেত্রে পদায়ন করেন, যারা একশতের অধিনায়ক ছিলেন তাদের হাজারের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করেন এবং সেই সঙ্গে আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে রুপার পাত্র, একইভাবে প্রথা-অনুসারে লিপিফলক অথবা কর্তৃপক্ষের আদেশপত্র প্রদান করেন।

যারা শতের কর্তৃত্বে ছিলেন তাদের রুপার পাত্র, যারা হাজারের কর্তৃত্বে ছিলেন তাদের স্বর্ণ বা রুপার গিল্টি করা ফলক এবং যিনি দশ হাজারের অধিনায়ক তাকে সিংহের মাথা সমন্বিত স্বর্ণের ফলক প্রদান করা হয়, এই ফলকের ওজন এক শত বিশ স্যাগি আর এ সিংহের মাথার ওজন দুই শত বিশ স্যাগি*। সেই ফলকের ওপর এই কথা লেখা, "মহান স্রষ্টার ক্ষমতাবলে এবং সেই মহান করুণা যার দ্বারা তিনি আমাদের সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, খান-এর নাম আশীর্বাদ পুষ্ট হোক; এবং যারাই তাকে অমান্য করেছে তাদের সবাইকে হত্যার মাধ্যমে ধ্বংসসাধন করা হয়েছে।" যেসব অফিসারেরা এই ফলকের অধিকারী তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এবং এই অভিলিখনে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য আর অধঃস্তনদের ওপর কর্তৃত্ব সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে।

লাখের প্রধান বা গ্র্যান্ড আর্মির কমান্ডার ইন চিফকে দেয়া হয় তিন শত স্যাগি ওজনের স্বর্ণফলক এবং এর নিচের দিকে একটা সিংহ খোদাই করা থাকে, সেই সঙ্গে চন্দ্র এবং সূর্য। চমকপ্রদ এই ফলক প্রদর্শন করে তিনি উচ্চ পদমর্যাদার সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করার সুফল ভোগ করতে পারেন। জনসাধারণের মাঝে গমনাগমনের সময় পদমর্যাদা এবং কর্তৃত্বের সূচক হিসেবে তার মাথার উপরে একটা ছাতা ধরা থাকে; এবং যখনই কোথাও বসেন সব সময়ই সেই চেয়ারটা হয় রুপোর।

একইভাবে গ্রেট খানের খেতাবের মাঝে গারফেলকনের প্রতিমূর্তি খোদিত এমন নির্দিষ্ট ধরনের একটি ফলকও রয়েছে যা প্রদর্শন করে, তারা যেকোনো

মহারাজন্যের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর গার্ড অব অনার পাবার ক্ষমতা দেখাতে পারেন। এমনকি সেটার সাহায্যে তারা প্রমোদ বিহারের জন্য রাজসিক আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে নিজের অধঃস্তন পদমর্যাদার যে কারো ঘোড়াকেই মানানসই বলে মনে করা হতো।

৮

গ্রেট খানের আকৃতি-প্রকৃতি আর চেহারার আদল তার চার বউ এবং উন-গাট প্রদেশ হতে তার জন্য বাৎসরিক যুবতী নির্বাচন

কুবলাই, যিনি গ্রেট খান বা মহারাজাধিরাজ হিসেবে সমধিক পরিচিত, তিনি খুব একটা লম্বা বা খাটোও নন, বলা চলে অনেকটা মাঝারি উচ্চতার। পা দুটা সুগঠিত এবং সেই মতো সমস্ত শরীর সঠিক অনুপাতের। গাত্রবর্ণ ফর্সা এবং মাঝেমধ্যে তা গোলাপের পাপড়ির ছোপের মতো লাল রঙে রাঙানো থাকত, যা তার প্রসন্ন চেহারাতে আরো বেশি মহানুভবতা যোগ করে। চোখ দুটা কালো আর সুদর্শন, নাক সুগঠিত এবং উন্নত।

প্রথম সারির পদমর্যাদায় তার চারজন বউয়ের সবাই আইনসিদ্ধভাবে সবার অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন এবং তাদের যে কারো গর্ভে জন্ম নেয়া বড় ছেলে গ্রেট খানের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। এই চার স্ত্রীর সবাই সমানভাবে সম্রাজ্ঞীর পদবি ধারণ করে, আলাদা আলাদা প্রাসাদে অবস্থান করতেন। তাদের সবাই সঙ্গে অনেক অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী সহচরী রাখতেন, এদের সংখ্যা মোটেই তিন শয়ের কম হবে না, সেই সঙ্গে ভৃত্য হিসেবে রাখতেন বিপুলসংখ্যক তরুণ এবং শোবার ঘরের যাবতীয় কাজের জন্য অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় খোজাও রাখা হতো; তাতে করে এমন এক একটি প্রাসাদে লোকের সংখ্যা গিয়ে ঠেকত দশ হাজারে।

যখনি সম্রাট তার কোনো একজন রানির সঙ্গ কামনা করতেন তখন হয় তাকে তার কাছে ডেকে পাঠাতেন নতুবা তিনি নিজেই তার প্রাসাদে গমন করতেন। এর পাশাপাশি, তার উপভোগের জন্য প্রচুর সংখ্যায় উপপত্নী সংগ্রহ করা হতো, উন-গাট নামের তাতার প্রদেশ হতে, সেখানকার নারীদের রূপ-লাবণ্যে আর ফর্সা গাত্রবর্ণের জন্য বিশেষভাবে সুখ্যাতি থাকায় এমনটা করা হতো বলে জানা যায়। প্রতি দু'বছর পরপর, অথবা প্রায়ই তার আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনে গ্রেট খান সেখানে তার অফিসারদের পাঠাতেন, যারা সেখান থেকে তার জন্য শত শত বা তারও বেশি রূপ-লাবণ্যে ভরপুর অত্যন্ত সুন্দরী যৌবনবতী তরুণী সংগ্রহ করতেন, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের রূপ-লাবণ্যের বিবেচনায় যোগাযোগ করা হতো।

সেই সব অফিসারদের কাজের ধরন ছিল এমন। তারা সেখানে গিয়ে পৌঁছার পর প্রদেশের সব তরুণীকে একত্রে জড়ো হবার জন্য আদেশ জারি করতেন এবং এদের সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য যোগ্য লোকের নিয়োগ দিতেন, জানা যায় এই সব নারীদের সৌন্দর্য পরিমাপে চুলের ধরন-ধারণ পরিমাণ, চোখের ভ্রূ মুখশ্রী, ঠোঁটসহ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবেচনায় নেয়া হতো, সেই সঙ্গে একটি অঙ্গের সঙ্গে অন্যটির প্রতিসাম্যতা খতিয়ে দেখে প্রত্যেকের সৌন্দর্যের কমবেশি মাত্রা অনুসারে ষোল, সতের, আঠারো বা বিশ অথবা এরও বেশি সংখ্যায় চিহ্নিত করে ক্যারেটের হিসেবে পরিমাপ করা হতো। গ্রেট খানের জন্য দরকার হতো বিশ বা একুশ ক্যারেটের সুন্দরী, কেননা এ ধরনের সুন্দরীদের বাছাই করার জন্য তাদের সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হতো, তাই বাকিদের মাঝ থেকে বাছাই করে তাদের সবাইকে তার প্রাসাদে হাজির করা হতো।

পৌঁছার পরপরই তাদের সবাইকে তার সম্মুখে হাজির করার পর, তিনি আলাদা একদল পর্যবেক্ষক দিয়ে ভিন্ন রীতিতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সবাইকে পরীক্ষা করতেন এবং এ সময় এদের মাঝ থেকে আবারও বাছাই করা হয়, এরপর এখান থেকে উচ্চতর মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার নিজের কক্ষের জন্য ত্রিশ বা চল্লিশজনকে বাছাই করা হয়। এদেরকে আলাদাভাবে প্রাসাদের কিছু বয়স্ক মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, যাদের দায়িত্ব হলো সারা রাত ধরে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করা, যাতে সঠিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় তাদের কারো কোনো গোপন ত্রুটি নেই, যেমন শান্তভাবে ঘুমায় কি না, নাক ডাকে কি না, নিঃশ্বাসে সুগন্ধ আছে কি না এবং শরীরের কোনো অংশে কোনো উৎকট ঘ্রাণ আছে কি না। এভাবে কঠোরভাবে খুঁটিয়ে দেখার পর, এদেরকে পাঁচটি দলে বিভক্ত করে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে পালা করে তিন রাত তিন দিন সম্রাটের অন্দর মহলে সব ধরনের কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, সে সময় তিনি তাদের সঙ্গে যা ইচ্ছে হতো তাই করতেন।

এই পালা শেষ হবার পর, অন্য একটি দলের মাধ্যমে তাদের বিশ্রাম মিলে এবং সবার পালা শেষ হবার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে; তখন সেই প্রথম পাঁচজন তাদের তত্ত্বাবধানের মূল্যায়ন করে। তবে যখন একটি দল অন্দর মহলে তাদের দায়িত্ব পালন করে তখন অন্য আরো একটি দল সেখানকার লাগোয়া বাইরের মহলে অপেক্ষায় থাকে। কোনো কাজে সম্রাটের দরকার পড়লে যেমন পানীয় বা খাবার-দাবার, তখন প্রাক্তনেরা সম্রাটের আদেশ শেষের জনদের জানিয়ে দেয়, যারা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করে। এভাবে এসব তরুণীরা সম্রাটের লোকেদের কাছ থেকে অপেক্ষমাণ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নিখুঁতভাবে পালনে সদা প্রস্তুত থাকে। বাকিরা, যাদের অপেক্ষাকৃত দর কম তাদের প্রাসাদের অন্যান্য কাজের লোকেদের সঙ্গে রাখা হয়; তারা তাদের

রান্নাবান্না, পোশাক-পরিচ্ছেদ তৈরিসহ অন্যান্য সুবিধাজনক কাজের দক্ষতা অর্জন করে; এবং প্রাসাদের যে কেউ বউ পাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে, গ্রেট খান সেই কুমারীদের মাঝ থেকে একটা অংশকে তাকে প্রদান করতেন। এভাবে তিনি সবার প্রতি তার মহানুভবতা প্রদর্শন করতেন।

এমন প্রশ্ন জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে সেই প্রদেশের লোকেরা তাদের মেয়েদের জোর করে কিনে নেবার কারণে সম্রাটের প্রতি আদৌ কি ক্ষুব্ধ হয়নি? অবশ্যই না; বরং তার বদলে, তারা একে সম্রাটের অনুগ্রহ এবং এর মধ্যদিয়ে তিনি তাদেরকে সম্মানিত করেছেন বলে মনে করত; এবং এমন সুন্দরী কন্যা সন্তানের জনকেরা তাদের সন্তানকে বাছাইয়ের জন্য স্বেচ্ছায় পাঠাতে পেরে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। "যদি", তারা বলতেন, "আমার সন্তান সঠিক গ্রহ-নক্ষত্রের ফেরে কপাল নিয়ে জন্মায় তাহলে অবশ্যই তাকে মহানুভবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সম্রাট তার ভাগ্যে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে পারবেন; আমার ক্ষমতায় যা একেবারেই কুলাবে না।" অন্যদিকে, যদি কন্যা আপনা থেকে অসদাচরণ করে থাকে, অথবা কোনোভাবে সেই সুযোগ হাতছাড়া করে তাহলে সে পতিত হবে, এর মাধ্যমে সে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে, এভাবে পিতা তার কন্যার গ্রহ-নক্ষত্রের রাজযোগে হতাশা আরোপ করতেন।

৯
গ্রেট খানের চার স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি যাদেরকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশের রাজা নিয়োগ করতেন এবং প্রথম সন্তান চেঙ্গিস

বৈধ চার স্ত্রীর গর্ভে গ্রেট খানের মোট বাইশ জন ছেলে জন্ম নেয়, তাদের সবচাইতে বড় জনের নাম চেঙ্গিস, উত্তরাধিকারসূত্রে তার সাম্রাজ্যের সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেবার বিষয়টি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল; আর তার এই মনোনয়ন গ্রেট খানের জীবদ্দশাতেই তার বাবার দ্বারা অনুমোদিত হয়। কিন্তু এর আগেই তিনি মারা যান এবং মরার আগে তিমুর নামের এক সন্তান রেখে যান। বাবার একজন যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে হয়। দেখতে-শুনতে তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন এবং সেই সঙ্গে জন্ম থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড মেধা আর পরাক্রমের অধিকারী; পরবর্তীতে তিনি বেশ কিছু সফল যুদ্ধ লড়ার স্বাক্ষর রাখেন।

এছাড়াও, উপপত্নীদের ঘরে সম্রাটের আরো পঁচিশ জন ছেলে ছিল, তাদের সবাই ছিলেন সহসী সৈনিক, পর্যায়ক্রমে তাদের সামরিক পেশায় নিয়োগ দেয়া হয়। এদেরকে তিনি উচ্চ পদমর্যাদায় পদায়ন করেন। তার বৈধ সন্তানদের মধ্যে সাতজনকে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ এবং রাজ্যের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, নিজেদের মেধা এবং বিচক্ষণতার সমন্বয়ে তারা সেসব স্থান শাসন করে, ঠিক

যেমনটা এমন একজন মহান গুণের অধিকারীর শিশুদের কাছে কাছে আশা করা হয় যে তাদের মাঝে তার মহান গুণের কোনোটাই তাতার জনসাধারণের স্বাভাবিক মূল্যায়নের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকবে না।

১০

কানবালু শহরের উপকণ্ঠে গ্রেট খানের প্রকাণ্ড এবং জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ

গ্রেট খান সাধারণত বছরের তিন মাস তথা ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি ক্যাথি প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মস্ত শহর কানবালুতে [পিকিং] অবস্থান করতেন। এখানে, এই নতুন শহরের দক্ষিণে তার প্রকাণ্ড প্রাসাদ অবস্থিত, এখানে সেই প্রাসাদের আকার-প্রকার স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা হচ্ছে।

গভীর পরিখা আর দেয়ালে পরিবেষ্টিত একটা বর্গাকার জায়গাতে প্রাসাদের অবস্থান; চারকোনা সেই স্থানের এক একটি প্রান্ত দৈর্ঘ্যে আট মাইল, প্রতিটি প্রান্তের হতে সমান দূরত্বে একটি করে প্রবেশ পথ অবস্থিত, যাতে করে চারিদিক থেকে লোকেরা সেখানে প্রবেশ করতে পারে। বেষ্টনীর ভেতরে চারদিক থেকে প্রস্থে এক মাইল উন্মুক্ত জায়গা, যেখানে সৈন্যেরা অবস্থান নেয়। এর ভেতরে ছয় মাইলজুড়ে চতুর্ভুজাকারে দ্বিতীয় একটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যার দক্ষিণে তিনটি প্রবেশ পথ এবং উত্তরেও রয়েছে তিনটি প্রবেশ পথ, যার মাঝেরটা আবার এদের বাকি দুটা থেকে বড়, সম্রাটের প্রবেশ বা বাহিরে যাবার প্রয়োজন ব্যতীত এটি সব সময় বন্ধ থাকত। সাধারণ চলাচলকারীদের জন্য প্রতি-পাশের বাকি প্রবেশ পথ দুটা সব সময় খোলা থাকত।

এই প্রতিটি দেয়ালের মাঝখানে একটি করে সুন্দর আর চওড়া দালান নির্মাণ করা হয় এবং ঘটনাক্রমে সেইসব সীমানা প্রাচীরের মাঝে এ ধরনের মোট আটটি দালান রয়েছে, যেখানে রাজকীয় সেনানী মজুদ রাখা হতো; এ ধরনের একটি দালানে একেক শ্রেণির মজুদ গ্রহণের জন্য মানানসই। সেহেতু, লাগাম, জিন, রেকাব এবং অশ্বারোহীদের জন্য অন্যান্য আসবাব ও উপকরণ রাখা হতো এবং দালানের অন্য একটি স্থানে; তীরন্দাজদের জন্য তীর, ধনুকসহ অন্যান্য উপকরণ মজুদ রাখা হতো, ঘরের তৃতীয় একটা ভাঁড়ারে রাখা হতো বর্ম, ধাতু ও চামড়ার তৈরি ঊর্ধ্বাঙ্গ রক্ষাকারী বর্মসহ অন্যান্য আচ্ছাদন। এবং বাকি সব কক্ষেও এ ধরনের আরো অনেক উপকরণ মজুত করা থাকত।

দেয়ালের এই সীমানার ভেতর আরো পুরু একটা বেষ্টনী রয়েছে আর সেটা পুরোপুরি পঁচিশ ফুট উঁচু। এই সব দুর্গের ওপরকার রক্ষী ছাউনি বা পাঁচিলের খাঁজ সবই সাদা রঙে রাঙানো। এটা চার মাইল প্রশস্ত একটা বর্গের আকারে বিস্তৃত, যার প্রতিটি প্রান্ত এক মাইল এবং এখানে ছয়টি দরজা রয়েছে। আগের বেষ্টনী

মতোই এতেও একই ধরনের মোট আটটি বিশালাকৃতির দালান রয়েছে, যার ভেতরকার সাজসজ্জা ঠিক আগেরই মতো, যা সম্রাটের উপযুক্ত ভাণ্ডার। প্রাচীরের মাঝখানের এই জায়গাটুকুসহ আশপাশের সব জায়গা নানা রকমের সুদৃশ্য গাছগাছালি দিয়ে মনোরমভাবে সাজানো, এর মাঝে আরো রয়েছে বিস্তৃত চারণভূমি, যাতে বিভিন্ন ধরনের পশু যেমন মৃগনাভি পাওয়া যায় এমন হরিণ, ছোট হরিণসহ আরো নানা জাতের হরিণ চড়ে বেড়ায়। দেয়ালগুলোর মাঝে কোনো দালান নেই, এ সমস্ত জায়গা এমন সব জিনিসের ভাণ্ডার। এর চারণভূমিগুলো গাছগাছালিতে ভরপুর। এখানকার বাঁধানো সড়কগুলো মাটি থেকে তিন ফুটের মতন উঁচু, তাতে করে এগুলোতে কাদা জমতে পারে না, বৃষ্টির পানিও না, অন্যদিকে বৃষ্টির বহমান জলে চারপাশের গাছগাছালি আরো তরতাজা আর দ্রুত বেড়ে ওঠে।

এইসব দেয়ালের একেবারে ভেতরে চার মাইল জায়গাজুড়ে গ্রেট খানের প্রাসাদ অবস্থিত, এত বিশাল আর বিস্তৃত প্রাসাদ আর কোথাও রয়েছে বলে জানা যায় না। কেবল একটি মাত্র শূন্যস্থান ছাড়া এর পুরোটাই উত্তর-দক্ষিণের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে অভিজাত আর সামরিক রক্ষীদের যাতায়াত। একতলাবিশিষ্ট এই প্রাসাদে অধিক কোনো তলা নেই, তবে এর ছাদ খুবই সুউচ্চ। যেই বাঁধানো বুনিয়াদ বা ভিতের ওপর এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা মাটি থেকে দশ বিঘত পরিমাণ উঁচু, আর এর চারদিকে রয়েছে দুই কদম প্রস্থের মার্বেলের দেয়াল। এই দেয়ালের সারি প্রাসাদের আকৃতি হিসেবে কাজ করে, সেখান দিয়ে হেঁটে গেলে বাকি অন্য কিছু ছাড়া কেবল সেই দেয়ালগুলোই চোখে পড়বে। সেই দেয়ালের বাইরের কিনারায় পিলারসহ একটি সুদৃশ্য ঝুল বারান্দা রয়েছে, লোকেদের এর কাছাকাছি যাবার অনুমতি রয়েছে। প্রকাণ্ড সেই দরবার হল আর এর এপার্টমেন্টসমূহের বহির্ভাগ ড্রাগন, যোদ্ধা, পশুপাখির ছবি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধের কাহিনিভিত্তিক সুদৃশ্য খোদাই নকশার গিল্টি দিয়ে সাজানো। ছাদের ভেতরের দিকে গিল্টিসহকারে এমনসব চিত্রকর্ম আঁকা রয়েছে অন্য আর কোনো কিছুতেই তার তুলনা হতে পারে না।

এই প্রাসাদের চারদিকের প্রত্যেক পাশে একটি করে বিশাল আকৃতির মার্বেলের সিঁড়ি রয়েছে, এই সিঁড়ি মাটি থেকে মার্বেলের দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে আর তা চারপাশ থেকে দালানটাকে ঘিরে রয়েছে এবং তা প্রাসাদের যাতায়াতের পথ তৈরি করে।

প্রধান দরবার কক্ষ বা গ্র্যান্ড হল খুবই প্রশস্ত আর দীর্ঘ, আর সেখানে একসঙ্গে বিশাল জনতার ভোজ অনুষ্ঠান সম্ভব। প্রাসাদে আলাদা আলাদা অসংখ্য কক্ষ রয়েছে, যার সবগুলো খুবই সুন্দর, আর এমন চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো যে যে কারো পক্ষেই এসবের কোনো ধরনের উন্নয়নসাধনের কোনো প্রকার বুদ্ধি দেয়া বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। ছাদের বাহির দিকে লাল, নীল,

সবুজ, বেগুনিসহ বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন রঙের নকশা করা আর তা এমন শক্তভাবে প্রলেপ দেয়া যে এমনিতেই বহু বছর টিকবে। এর জানালাসমূহের কাচগুলো এতটাই মজবুত আর মসৃণ যে দেখতে একেবারে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো।

প্রাসাদের পেছনের অংশের প্রকাণ্ড একটি দালানে রয়েছে বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট, সেখানে সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পদ বা তার স্বর্ণ, রৌপ্যের পিণ্ড আর হীরা-জহরত এবং মণি-মুক্তা আর তার স্বর্ণের পাত্র ও রৌপ্যের থালা-বাসন সঞ্চিত রাখা হয়। এখানেও তার রানি আর উপপত্নীদের জন্য আলাদা এপার্টমেন্ট রয়েছে আর বিশ্রামের সময় তিনি এখান থেকে সব ধরনের ব্যাঘাতমুক্ত অবস্থায় সুবিধামতো যেকোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

সম্রাট যেখানটাতে থাকেন প্রকাণ্ড সেই প্রাসাদের অপর পাশে, আরো একটি প্রাসাদ রয়েছে, সব দিক থেকেই তা হুবহু মূল প্রাসাদের মতো, সম্রাটের বড় ছেলে চেঙ্গিসের উপযুক্ত আবাসস্থল, সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার রাজকুমারের মতোই তার দরবারে বাবার অনুকরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত সব ধরনের জিনিসপত্র রয়েছে। প্রাসাদের খুব একটা দূরে নয়, উত্তর দিকে এবং সীমানা প্রাচীরের সামান্য ভেতরে, একটি কৃত্রিম পাহাড় রয়েছে, যার উচ্চতা পুরোপুরি একশ কদমের মতো আর গোড়ার দিকে এর বেড় মাত্র এক মাইল। এটি সবচেয়ে মনোরম চিরহরিৎ বৃক্ষ ছাওয়া; আর সম্রাট যখনই জানতে পারেন কোথাও চমৎকার একটি গাছ রয়েছে তখন সেটাকে তার সব শেকড়-বাকড় আর গোড়ার সব মাটিসুদ্ধ তুলে আনার হুকুম দেন, তা যতই বিশাল আর ভারী হোক না কেন, সেটাকে তিনি হাতির সাহায্যে বয়ে এনে নিজের সংগ্রহের শ্যামলিমার তালিকায় নতুন একটি নাম যোগ করেন। গাছগাছড়া ছাওয়া পাহাড়টি সব সময় সবুজ থাকায় একসময় সেটার নাম হয়ে যায় গ্রিন মাউন্টেইন।

এর চূড়ায় একটা শোভাবর্ধক ভবন রয়েছে, সেটাও পুরোপুরি সবুজ। সেখান থেকে একসঙ্গে দেখা মিলবে, নিচের পাহাড়, চারপাশের বৃক্ষ শোভিত দৃশ্য আর দালান, যা দেখতে খুবই মনোরম, পাশাপাশি তা একেবারে বিস্ময়কর বলেও মনে হতে বাধ্য। প্রাসাদের উত্তরভাগসহ শহরে প্রাঙ্গণের মাঝবরাবর খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সমানভাবে বৃহৎ আর গভীর একটা পরিখা খনন করা হয়েছে, এখান থেকেই মাটি সরবরাহ করে সেই পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মাছের পুকুরের মতন এই জলাধারটিকে ছোট্ট নদীর আদল দেয়া হয়েছে, তবে মূলত গবাদিপশুর গোসলের কাজে এর জল ব্যবহৃত হতো। সেখান থেকে একটা নালার মাধ্যমে এর জল সেই সবুজ পাহাড়ের পাদদেশ হয়ে সম্রাট আর তার বড় ছেলে চেঙ্গিসের ব্যক্তিগত প্রাসাদের মাঝখানে অবস্থিত অন্য আরো বিশাল ও গভীর একটি পরিখায় গিয়ে পৌঁছে। এখানকার মাটিও পাহাড়ের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়েছে। পরের এই জলাধারটি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বিশাল এক আধার। যেখান থেকে সম্রাটের টেবিলে পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনে যত খুশি মাছ সরবরাহ করা সম্ভব।

স্রোতস্বিনীটি বিপরীত দিকের একটি জলাধারে গিয়ে অবমুক্ত হয়েছে, আর তাই এখান থেকে যাতে মাছ বেরিয়ে যেতে না পারে সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এর জল প্রবেশ ও নির্গমন পথের উভয় পাশে লোহা বা পিতলের গরাদ বসানো রয়েছে। এটা রাজহাঁসসহ আরো সব জলচর পাখিদের বড় একটা মজুদও। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতে এটা জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতক্ষণ সেই মহান স্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এবার আমরা সংক্ষেপে তাইডু শহরের অবস্থান আর সেখানকার পরিস্থিতির কথা বলব।

১১

কানবালু শহরের উপকণ্ঠে নির্মিত নতুন শহর তাইডু, রাষ্ট্রদূতেদের আরাম-আয়েশে সেখানকার বিশেষ এক রীতি আর রাত্রিকালীন পুলিশ

ক্যাথি প্রদেশের বিশাল একটি নদীর কাছাকাছি কানবালু শহরটি অবস্থিত, প্রাচীনকালে এই শহর এর জাঁকজমক আর আভিজাত্যের জন্য খুবই বিখ্যাত ছিল। কানবালু শব্দের মানেও "সম্রাটের শহর" তবে মহিমান্বিত জ্যোতিষের কাছ থেকে এ কথা জানতে পারেন যে সাম্রাজ্যের ওপর তার পূর্ণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নদী তীরের অপর প্রান্তের রাজধানীর এক প্রাসাদে, সেখানেই উপরে বর্ণিত তার বর্তমান প্রাসাদটি দণ্ডায়মান রয়েছে। নতুন আর প্রাচীন এই রাজধানীর মাঝ দিয়ে কেবল একটি নদীর স্রোতধারা তাদের আলাদা করে রেখেছে। নতুন এই শহরের নাম রাখা হয় তাইডু, আর নির্মাণকালে সব ক্যাথিবাসী তথা ক্যাথি প্রদেশের স্থানীয় অধিবাসীদের তাদের প্রাচীন সেই শহর ছেড়ে অন্যত্র নতুন আবাসস্থলে সরে যেতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য যাদের আনুগত্য নিয়ে তার মনে কোনো রকম সন্দেহ ছিল না, বিশেষ করে নতুনদের সেখানেই থেকে যেতে দেয়া হয়। যদিও তাদের জন্য নির্দিষ্ট নতুন আবাসস্থল আগেকার সমসংখ্যক লোকের আশ্রয় দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল না, তবে জায়গাটা ছিল খুবই বিস্তৃত, যার বর্ণনা এখনে তুলে ধরা হবে।

নতুন এই শহরটা নিখুঁতভাবে বর্গাকার এবং চব্বিশ মাইল বিস্তৃত, যার প্রত্যেক পাশ ছয় মাইলের। চারপাশ থেকে এটা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা, যার ভিত দশ কদম পুরু, কিন্তু উপরের দিকে এই পুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে, সেখানে এর পরিমাণ মোটেই তিন কদমের বেশি নয়। এর রক্ষী ছাউনিগুলো সবই সাদা রঙের। নগর পরিকল্পনার পুরোটা জুড়েই নিয়মিত সরলরেখার ছড়াছড়ি, ফলে সঙ্গত কারণেই সড়কগুলোও খুবই সোজা, তাই যে কেউ কোনো দরজার ওপরকার দেয়ালের উপর উঠে সামনের দিকে তাকালে, তার বিপরীত দিকের শহরের ওপর পাশের দরজা দেখতে পাবেন। জনসাধারণর চলাচলের পথের দু'পাশে, সব ধরনের দোকানপাট আর তাঁবু চোখে পড়ে। শহরের সব ভূমি

বরাদ্দ যেখানে লোকেদের বসবাস তার সবই বর্গাকারে তৈরি। আর একেবারে রেখা বরাবর প্রতিটি অংশের মাঝে যথেষ্ট জায়গা রেখে তবেই দৃষ্টিনন্দন বাড়ি, তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গিনা আর বাগান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রতিটি বাড়ি পরিবারের কর্তার নামে বরাদ্দ দেয়া। পরবর্তীতে সেই সম্পত্তি নানাভাবে হাতবদল হয়ে আসছে। আর এভাবেই শহরের ভেতরটা বর্গাকারে গড়ে উঠেছে। দেখতে একেবারে দাবার ঘরের মতো এবং তা এমনভাবে পরিকল্পনা করে তৈরি করা যার নির্ভুল পরিমাপ আর সৌন্দর্যের সবটা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। বর্গের প্রতি পাশে তিনটি করে, শহরের দেয়ালজুড়ে মোট বারোটি দরজা রয়েছে, আর এই প্রতিটা দরজার ওপরে এবং দেয়ালের নির্দিষ্ট অংশজুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন একটি দালান; বর্গের প্রতি পাশে এ রকম মোট পাঁচটি দালান রয়েছে, এসব দালানের কামরাগুলো অনেক বড়, শহরের সেনা ছাউনি হিসেবে এর ভেতরে অস্ত্র মজুদ করে রাখা হয়। প্রতিটি ফটক পাহারায় হাজার রক্ষী নিয়োজিত থাকে। তবে এটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয় যে এমন একটি শক্তিশালী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য বৈরী শত্রুর দেখা কোথায় মিলতে পারে, তবে পাহারাদার হিসেবে এরা সার্বভৌমত্বের সম্মান আর মর্যাদার উপযোগী। তবে হয়তো সেই জ্যোতিষীরাই তার মন ক্যাথিয়ানদের বিরুদ্ধে এত বিষিয়ে তুলেছিল।

শহরের একেবারে মাঝখানে একটা উঁচু দালানের ওপরে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা ঝুলানো রয়েছে, প্রতি রাতে সেটা বেজে ওঠে এবং তৃতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠার পর অতি জরুরি কোনো কাজ ছাড়া যেমন কোনো নারীর প্রসব বেদনা অথবা কেউ প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে না পড়লে কেউ আর পথের ওপরে আসার সাহস দেখায় না। এ ধরনের কোনো জরুরি প্রয়োজনে পথে বের হলে সবাইকে সঙ্গে একটি বাতি বহন করতে হয়।

প্রতিটা ফটকের বাইরে একটা শহরতলি রয়েছে, সেগুলো উভয় পাশ দিয়ে কাছাকাছি পাশের ফটক পর্যন্ত অপরটির সঙ্গে মিলেছে, আর দৈর্ঘ্যে এর বিস্তৃতি তিন-চার মাইলের মতো, এই শহরতলিগুলোর অধিবাসীর সংখ্যা মূল শহরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি উপশহরের ভেতরে শহর থেকে মাইল খানেক দূরের হোটেল-রেস্তরাঁ আর কারাভাঁ-সরাইতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বণিকেরা এসে আশ্রয় নিত; আর সেখানে পুনর্বাসিত আলাদা আলাদা গোত্রের লোকেদের জন্য পৃথক দালান বরাদ্দ দেয়া ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একটা লম্ববারর্ডদের জন্য, অপরটা জার্মানদের আর তৃতীয়টা ফরাসিদের জন্য।

অনেক মহিলা টাকার বিনিময়ে দেহ-ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল, নতুন শহরসহ পুরাতন শহরতলিগুলোতেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ হাজারের মতো। এদের প্রতি শত এবং প্রতি হাজারের পেছনে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক অফিসার নিয়োগ করা ছিল, যারা একজন ক্যাপ্টেন-জেনারেলের

নির্দেশ মোতাবেক তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে এমন কর্তৃত্বের অধীনে আনা, যাতে যখনই গ্রেট খানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে দূতেদের আগমন ঘটবে, তখন প্রথা অনুসারে যাবতীয় খরচাদি সম্রাটই বহন করতেন, আর তাই আদেশ মোতাবেক তাদের সঙ্গে সবচাইতে সম্মানজনক আচরণ করা হতো। ক্যাপ্টেনের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যাতে রাতের বেলায় প্রত্যেক দূতাবাসের সবার জন্য এ ধরনের একজন করে দেহপসারিণী সরবরাহ ও একইভাবে বদলে দেয়া হয়। এ ধরনের সেবাকার্যকে সার্বভৌমের প্রতি তাদের করঋণ লাঘব হিসেবে গণ্য করা হয় বলে এর জন্য কোনো প্রকার সম্মানী প্রদান করা হয় না।

সারা রাত ত্রিশ, চল্লিশ জনের রক্ষীদল রাজপথজুড়ে পায়চারি করে, খুব পরিশ্রমের সঙ্গে খুঁজে খুঁজে তারা, রাতের তৃতীয় ঘণ্টাধ্বনির পর অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে এমন লোকের সন্ধান করে বেড়ায়। এ ধরনের কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই লোককে পাকড়াও করে বন্দি অবস্থায় সকালে দায়িত্বরত অফিসারের সামনে হাজির করার জন্য রাখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো ধরনের অপচারের প্রমাণ পাওয়া গেলে অপরাধীকে প্রচণ্ড বা ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য বেত্রাঘাত করা হয়, কখনো কখনো এই দণ্ড কার্যকরের সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। এভাবে জনগণের মাঝ থেকে অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হয়, রক্তপাত এড়াতে বিজ্ঞ জ্যোতিষীদের পরামর্শ অনুসারে এমনটা করা হয়ে থাকে।

টাইডু শহরের ভেতরকার বর্ণনা দেয়া হলো, এবার আমরা ক্যাথিয়ান বাসিন্দাদের বিদ্রোহের ঘটনা সম্বন্ধে জানব।

১২
গ্রেট খানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী

গ্রেট খানের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের মাঝে রয়েছে বারো হাজার অশ্বারোহী, সে কথা সবারই জানা। এদের সবাই কাসিতান নামে পরিচিত, যার মানে 'প্রভুর প্রতি অনুগত বীরযোদ্ধা'। তবে তেমন কোনো আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলেও পদমর্যাদার খাতিরে সব সময় তিনি রক্ষী পরিবেষ্টিত থাকেন।

এই বারো হাজার লোক চারজন ঊর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশে পরিচালিত হয়, যাদের প্রত্যেকে তিন হাজারের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং তিন হাজার সৈনিকের প্রতিটি ডিভিশন প্রাসাদে তিন দিন তিন রাত ধরে পালাক্রমে একনাগাড়ে পাহারায় নিয়োজিত থাকে। এদের একটির পালা শেষ হলে পর্যায়ক্রমে অন্যটির দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়। এভাবে চারটি ডিভিশনের পালা শেষ হবার পর আবার প্রথম ডিভিশনের পালা শুরু হয়।

সম্রাটের বিশেষ কোনো কাজে বাইরে যেতে না হলে বা উর্ধ্বতন অফিসারের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কাজে ছুটি ব্যতীত বাকি নয় হাজার রক্ষীর সবাইকে প্রাসাদেই অবস্থান করতে হয়।

১৩

যেভাবে গ্রেট খান তার প্রকাশ্য দরবার পরিচালনা করেন

রাজকীয় ক্ষমতাবলে তিনি যখন প্রকাশ্য দরবার পরিচালনা করেন তখন সেখানকার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গেরা এভাবে ক্রমানুসারে আসন গ্রহণ করেন। সার্বভৌমের টেবিল একটা উঁচু স্থানে রাখা হয়। আর সম্রাট নিজে দক্ষিণে মুখ করে উত্তর পাশে আসন গ্রহণ করেন; এবং তারপর তার বাঁ পাশে বসেন সম্রাজ্ঞীগণ। ডান পাশে পুত্রগণ, নাতি এবং রক্তের সম্পর্কের অন্যান্যেরা বসেন। এই চেয়ারগুলো কিছুটা নিচু করে তৈরি করা, যাতে অন্যান্য সবার মাথা সম্রাটের পায়ের তল বরাবর থাকে। অন্যান্য রাজকন্যা এবং অভিজাতেরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট অপেক্ষাকৃত আরো নিচু টেবিলে আসন গ্রহণ করেন। ছেলের বউ, নাত-বউ এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের স্ত্রীসহ মহিলাদের জন্য একই নিয়ম, তাদের সবার আসন গ্রেট খানের বাম পাশে, তবে টেবিলগুলো একইভাবে ক্রমান্বয়ে নিচু; এর পর বসেন অভিজাত ও সেনা অফিসারদের স্ত্রীগণ; এদের সবাই পদমর্যাদা ও মর্যাদার ক্রমানুসারে দরবারে পূর্বনির্ধারিত স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেন।

টেবিলগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে গ্রেট খান তার উঁচু সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় একত্রে সবাইকে দেখতে পান। তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এ ধরনের একটা অনুষ্ঠানে যত লোকের সমাগম হয় টেবিলগুলোতে তাদের সবার জায়গা হয়। অফিসারদের বেশিরভাগই, এমনকি অভিজাতদের অনেকেই হলের ভেতরকার কার্পেটের ওপরে বসে খাওয়া-দাওয়া সারেন; এবং বাইরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে থাকে, এদের বিভিন্ন জনের আগমনের কারণও আলাদা।

হল ঘরের মাঝখানে, যেখানে গ্রেট খান টেবিলের সামনে উপবেশন করেন, সেখানে চমৎকার একটি আসবাব রয়েছে, দেখতে ঠিক চারকোনাকার সিন্দুকের মতো, এর প্রতিটা প্রান্ত তিন কদম দৈর্ঘ্যের, তাতে অতি নিখুঁতভাবে গিল্টি করা বিভিন্ন পশুর ছবি খোদাই করা রয়েছে। খাঁটি সোনার একটা সুপরিসর আধারকে ধারণ করার জন্য এর ভেতরটা ফাঁপা, যা প্রচুর গ্যালন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন। এর চার প্রান্তে শূকরের মাথাওয়ালা ক্ষুদ্রাকার একটি পাত্র রয়েছে, যার একটি ঘোটকীর দুধে পূর্ণ, অন্যটিতে উটের দুধ এবং বাকি দুটাতে সুরাজাতীয় পানীয় রাখা হয়। এই বুফেতে সুরা পরিবেশনের জন্য সম্রাটের কাপ এবং সোরাহিগুলোও থাকে। এর কোনো কোনোটা অতি সুন্দরভাবে গিল্টি করা। এগুলোর আকৃতি এতই বড়

যে ওয়াইন বা অন্য যেকোনো প্রকার মদে পূর্ণ করার পর তা আট-দশজন লোকের পান করার জন্য যথেষ্ট।

টেবিলের প্রতি দুজন লোকের জন্য একধরনের হাতাসহ একটি করে সোরাহি রাখা থাকে, এর সাহায্যে কেবল সোরাহি থেকে ওয়াইন পরিবেশন করা হয় না, এটা দিয়ে সোরাহির মুখও খোলা হয়। পুরুষদের মতো মহিলারাও এতে অংশ নেন। সম্রাটের সামনে বাসনের সংখ্যা আর এর প্রাচুর্য সত্যিই অভাবনীয়।

পদবিধারী অফিসারগণ এখানে দায়িত্ব পালন করেন, যাদের কাজ ভোজের সময়কার অভ্যাগতদের দেখভাল এবং দরবারের আদব-কায়দা অনুসারে অপরিচিতদের সুবিধাজনক জায়গাতে স্থানসঙ্কুলানে সহায়তা প্রদান; আর এই খাবার সরবরাহকারীরা অনবরত হল ঘরের সর্বত্র গমনাগমন করে, অতিথিদের কেউ কোনো কিছু না পেয়ে থাকলে তাকে সেটা এগিয়ে দেন, অথবা তাদের কেউ ওয়াইন, দুধ, মাংস অথবা অন্য কিছু চাইলে তৎক্ষণাৎ তাকে সেটা এনে দেন।

গ্র্যান্ড হলের প্রতিটা দরজাতে, আর যেখান দিয়ে গ্রেট খান প্রবেশ করেন সেখানে দু'পাশে বিশালদেহী দুজন অফিসার তক্তা হাতে দণ্ডায়মান থাকে, যাতে পা দিয়ে লোকেরা গোবরাট স্পর্শ করাতে গেলে তা ঠেকানো যায় এবং তাদের সেখান থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করা যায়। যদি দৈবাৎ কেউ এমন অপরাধে অপরাধী হয়, তাহলে দ্বাররক্ষকদ্বয় তার কাপড় খুলে নেয়, যা কেবল টাকা দিয়েই ছাড়িয়ে নিতে হয়; অথবা, কাপড় ছাড়িয়ে না নিলে তাকে কর্তৃত্ব অনুসারে আঘাত করা হয়। তবে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে অপরিচিতদের না জানা থাকাটাই স্বাভাবিক, আর তাই এ ধরনের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য এবং সবাইকে সতর্ক করার জন্য আগে থেকেই সেখানে আলাদা লোক নিয়োগ করা থাকে। এ ধরনের পূর্ব সতর্কতার কারণ হলো গোবরাট স্পর্শ করাকে অশুভ সংকেত বলে মনে করা হয়। হল ছাড়ার সময়, কারো সঙ্গী মদের নেশায় ভারাক্রান্ত থাকলে, এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় না এবং তখন সেই আদেশ পালনেও কড়াকড়ি থাকে না।

সম্রাটের দেরাজ আর তাকওয়ালা টেবিলের পাশে যেসব অসংখ্য ভৃত্য দায়িত্ব পালন করে এবং যারা তাকে খাবারদাবার আর পানীয় পরিবেশন করে, তাদের সবাই সুন্দর সিল্কের কাপড় বা নেকাব দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখে, যাতে তার খাবার বা পানীয়ে তাদের নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগতে না পারে। তিনি পানীয়ের জন্য ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারত ভৃত্য এসে তা পরিবেশন করে, সে দেশের নিয়ম অনুসারে তিন কদম পেছনে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে কুর্নিশ করে। এবং উপস্থিত সবাই তখন একইভাবে তার সম্মুখে প্রণিপাত করেন। ঠিক সেই সময় উপস্থিত যন্ত্রীদের অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রসমূহ একত্রে বাজতে শুরু করে এবং তার পান করা শেষ হবার আগপর্যন্ত তা চলতে থাকে, আর তখন সবাই উঠে আগের মতো সোজা হয়ে বসে। মহাত্মনের পানের সময় এভাবেই শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রীতিসম্ভাষণ জানানো

হয়। রাজকীয় খাবার-দাবার নিয়ে বেশি কিছু বলা অপ্রয়োজনীয় মনে করছি, কেননা সেসবের প্রাচুর্য সম্বন্ধে কল্পনা করে নেয়া খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, টেবিলগুলো সরিয়ে নেবার পর, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকেরা দরবার কক্ষে প্রবেশ করে, আর তাদের সঙ্গে থাকে একদল ভাঁড় এবং নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাদক। এমনকি তুড়ি বাদ্য বাজিয়ে আর বাজিকরও থাকে, এদের সবাই গ্রেট খানের সম্মুখে প্রচণ্ড হাস্যকৌতুক উপহার দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের বাসনা পূরণ করার মাধ্যমে যার যার দক্ষতা প্রদর্শন করে।

১৪
গ্রেট খানের জন্মদিনে তার সাম্রাজ্যজুড়ে উদ্‌যাপিত উৎসব

সমগ্র তাতার এবং গ্রেট খানের অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে মহাত্মনের জন্মদিন তথা সেপ্টেম্বর মাসের আটাশতম দিন উৎসবের আমেজে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। এটাই তাদের সবচাইতে বৃহত্তর উৎসব, এই দিনটিকে বছরের প্রথম দিন হিসেবেও গ্রহণ করা হয়, যার বর্ণনা কিছুক্ষণ পর দেয়া হবে। বর্ষপূর্তির এই অনুষ্ঠানে গ্রেট খান মোহনীয় সুবর্ণ পোশাকে জনসম্মুখে উপস্থিত হন এবং সেই একই অনুষ্ঠানে বারো হাজার অভিজাত এবং সামরিক অফিসারেরাও রং এবং আদলে তার মতো পোশাক পরলেও, সেসবের উপকরণ একই রকমের মূল্যবান নয়। বরং সেগুলো সিল্কের এবং সোনালি রঙে রাঙানো থাকে। সেই সঙ্গে সোনা-রুপার সুতায় অপরূপ কারুকার্য মণ্ডিত কৃষ্ণ হরিণের চামড়ার কোমরবন্ধসহকারে ওয়েস্টকোট, আর একজোড়া বুটও। কিছু কিছু পোশাক মূল্যবান রত্ন আর মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত, যার দাম দশ হাজার বিজান্ট সোনার সমান, কেবল সেইসব অভিজাত ব্যক্তিদেরই এই পোশাক দেয়া হয় যারা কি না রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থেকে মহামান্যের কাছের লোক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। বছরের মোট তেরোটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের দিন এই পোশাক পরিধানের বিধান ধার্য করা আছে। সেসব পরার পর সত্যিকার অর্থেই তারা রাজকীয় চেহারায় আবির্ভূত হন। যখনই সম্রাট বিশেষ কোনো পোশাক পরিধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার অমার্ত্যবর্গেরাও সে সময় তার সঙ্গে মিল রেখে আগে থেকেই প্রস্তুত কিছুটা কমদামের একই ধরনের পোশাক পরেন। প্রতি বছর সেসব নতুন করে তৈরি করা হয় না, তার বদলে পরবর্তী দশ বছরের জন্য তৈরি করা হয়। এই কুচকাওয়াজ থেকে গ্রেট খানের জাঁকজমক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, বিশ্বের আর কোনো সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর সমতা বিধান সম্ভব নয়।

গ্রেট খানের জন্মদিনের সেই উৎসবের দিনে, তাতারদের অধিকৃত সমস্ত এলাকা এবং একইভাবে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজ্য আর প্রদেশসমূহের

জনগণ, প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে, তাকে মূল্যবান সব উপহারসামগ্রী পাঠায়। ক্ষুদ্র সব রাজ্যে শাসনের দাবিদারদের অনেকেও উপহার নিয়ে আসে। সেদিন এ ধরনের কাজের দায়িত্বরত বারোজন পারিষদকে সম্রাট একে একে তার নির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে করে এসব রাজ্যসমূহ আর তাদের সরকার সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে।

এই দিনে দেশের সকল খ্রিস্টান, পৌত্তলিক এবং মুসলমানসহ অন্যান্য সকল ধর্মের লোকেরা তাদের স্ব স্ব ঈশ্বর এবং প্রতিমার কাছে সার্বভৌমের সুরক্ষা, দীর্ঘ জীবন, সুস্থতা আর উন্নতি কামনা করে প্রার্থনা করে। এভাবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে সম্রাটের জন্মদিন উদ্‌যাপন করা হয়।

এবার আমরা নতুন বছর উদ্‌যাপনের হোয়াইট ফিস্ট নামের অন্য আরো একটা উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করছি।

১৫
নতুন বছরে হোয়াইট ফিস্ট আর সেদিনের উপহার

এটা একেবারেই নিশ্চিত যে তাতারদের নতুন বছর শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসে এবং সেই দিন গ্রেট খানের প্রথা অনুসারে তার শাসনাধীন এলাকার লোকেরা সাদা পোশাক পরে। তাদের ধারণা এটা সৌভাগ্যের প্রতীক। সারা বছর তাদের প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকবে আর আনন্দ-ফুর্তি এবং আরাম-আয়েশে দিন কাটবে এই আশায় তারা এই দিনে সাদা পোশাক পরে।

এই দিনে গ্রেট খানের অধীনস্ত সব রাজ্য আর প্রদেশের অধিবাসীদের যারা জমিজমা আর বিভিন্ন আইনগত অধিকার ভোগ করছে তাদের সবাই তার কাছে অসংখ্য সাদা কাপড়ের থানের সঙ্গে সোনা, রুপা, আর দামি পাথরের গহনাসহ মূল্যবান সব উপহার সামগ্রী পাঠায়, এই অভিপ্রায়ে যাতে তাদের সম্রাট সারা বছর অবিচ্ছিন্নভাবে সুখভোগসহ তার খরচাদি বহনের মতো সম্পদের অধিকারী হতে পারেন। এই একই উদ্দেশ্যে অভিজাত, রাজন্যবর্গ আর সাম্রাজ্যের উচ্চপদাধিকারীদের সবাই সাদা থান কাপড়সহ যার যার বাড়ি থেকে সাধ্যমতো উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন, উৎসবের আনন্দে একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন এবং বলেন, "আসছে বছরে আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক এবং সকল উদ্যোগ আপনার ইচ্ছে অনুসারে সফল হোক।" এই উৎসবের সময় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সাদা ঘোড়া উপহার হিসেবে গ্রেট খানকে দেয়া হয়। আর সেগুলোর কোনোটা পুরোপুরি ধবল না হলেও অন্তত প্রচলিত কোনো রঙের হতে হবে। এই দেশে সাদা ঘোড়া খুব একটা বিরল নয়।

গ্রেট খানকে উপহার দেবার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানদের আরো একটি প্রথা হলো, নয়-এর গুণিতক আকারে উপহার সামগ্রী পাঠানো, তা সেই উপহার যাই থাকুক

না কেন। তাই কোনো প্রদেশ থেকে যখন উপহার হিসেবে ঘোড়া পাঠানো হয় তখন নয়-এর গুণিতক হিসেবে বা একাশিটি ঘোড়া পাঠানো হয়। এবং স্বর্ণ বা কাপড়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রীতি অনুসরণ করা হয়। এই উৎসবে সম্রাট কম করে হলেও এক লাখের ওপরে ঘোড়া উপহার হিসেবে পেয়ে থাকেন।

এই দিনে তার সব হাতি শোভাযাত্রায় অংশ নেয়, যার সংখ্যা পাঁচ হাজার, রেশম আর স্বর্ণের কারুকাজ করা নানা ধরনের পশু-পাখির চমৎকার সব নকশা আঁকা কাপড়ে ঢেকে তাদের জনসমক্ষে হাজির করা হয়। এগুলোর প্রতিটির কাঁধে বাসন-কোসনসহ দরবারের ব্যবহার উপযোগী অন্যান্য সামগ্রী বোঝাই দুটি করে বড় আকারের পেটিকা থাকে। এদের পেছনে থাকে একসারি উট, এরাও আগের মতোই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আসবাবপত্রে বোঝাই থাকে। পুরো দলটাকে উপযুক্তভাবে দাঁড় করাবার পর, মনোজ্ঞ জাঁকজমকপূর্ণ রূপে এদেরকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হয়।

উৎসবের সকালবেলা সকল রাজন্যবর্গ, অভিজাত পদাধিকারী, বীরব্রত সামন্ত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক, পক্ষীবিশারদ, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও জমিদার এবং সেনাবাহিনীর অফিসারদের সবাই দরবারে সম্রাটের সামনে জমায়েত হন। তখন তাদের সবার সম্মুখে টেবিল পাতা হয়। সেখানে যাদের বসার জায়গা হয় না তারা সম্রাটকে একনজর দেখার আশায় কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পদাধিকার অনুসারে এভাবে সেই সমাগম বিন্যস্ত করা হয়। প্রথম সারির সব আসন সংরক্ষিত থাকে সম্রাটের পুত্র, পৌত্র আর রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য। এর পরের সারিতে বসেন প্রাদেশিক রাজন্যবর্গ এবং সাম্রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, এইভাবে পদাধিকার অনুসারে ক্রমান্বয়ে অন্যান্যদের জন্য আসন বিন্যাস করা থাকে। সবাই তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করার পর, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঁচু স্বরে বলে ওঠেন : "মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন" তখনই সঙ্গে সঙ্গে সবাই কপাল মেঝে স্পর্শ করবার আগপর্যন্ত শরীর বাঁকাতে থাকে। এবং এভাবে সবাই পরপর চারবার ভক্তি প্রদর্শন করে। এটা শেষ হবার পর, ধর্মগুরু একটা বেদির দিকে অগ্রসর হয়ে, আরো গভীর শ্রদ্ধাভরে ভক্তি প্রদর্শন করেন। সেই বেদির ওপরে একটা লাল রঙের লিপিফলকের ওপর গ্রেট খানের নাম খোদাই করা। তার কাছাকাছি একটা জ্বলন্ত ধূপের মশাল দাঁড় করিয়ে রাখা। সেই ধূপে ধর্মগুরু সমাগতদের পক্ষে বেদির ওপরকার লিপিফলক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সুরভিত করে তুলেন, তখন উপস্থিত অভ্যাগতদের সবাই তাকে অনুসরণ করে বশ্যতার বিনয়ে নিজেদের লিপিফলকের প্রতি সমর্পণ করেন।

এই আচার সম্পন্ন হবার পর সবাই যার যার স্থানে ফিরে যান এবং এরপর প্রত্যেকে তাদের উপহার সামগ্রী প্রদান করেন; যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

উপহার সামগ্রী প্রদর্শনের সময় গ্রেট খান সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন। এরপর ভোজের উদ্দেশ্যে টেবিল সাজানো হয় এবং আগের অংশে বর্ণনামতো নারী-পুরুষ সবাই ক্রমানুসারে সমবেত হন। রাতের খাবারের পর সঙ্গীতজ্ঞ আর নাট্য পরিবেশকেরা দরবারের আমোদ-ফুর্তির জন্য তাদের প্রদর্শনী শুরু করেন, যার কথাও আগেই বলা হয়েছে। তবে এই অনুষ্ঠানে একটি সিংহ উপস্থিত থাকে, সেটা এতটাই পোষা যে সম্রাটের পায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অনুষ্ঠান শেষে সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়।

১৬
অনুষ্ঠানে সম্রাট বারো হাজার ব্যারনকে স্বর্ণের পোশাক দান করেন

এবার সবার জানা দরকার, সম্রাটের লোকেদের মধ্যে আলাদা করে কেশিক্যান উপাধিওয়ালা গুরুত্বপূর্ণ বারো হাজার লোক রয়েছেন। এবং এই বারো হাজার জন ব্যারনকে তিনি তেরো ধরনের পোশাক প্রদান করেন, যার প্রতিটিই আলাদা ধরনের। এ ধরনের একটি সেটে বারো হাজার পোশাকের সব রং একই হয়ে থাকে এবং তেরোটি সেটের প্রতিটির রং একেবারেই আলাদা। এই পোশাকগুলো মণি-মুক্তাসহ আরো অনেক মূল্যবান উপকরণে জাঁকজমকভাবে শোভিত।

এই ব্যারনদের সঙ্গে মিল রেখে সম্রাটের নিজেরও রয়েছে তেরো সেট পোশাক; রঙের দিক দিয়ে সেগুলো আরো বেশি চমৎকার, সমৃদ্ধ আর দামি। আর সামনাসামনি দেখার পর সেগুলোর মূল্য সম্পর্কে ধারণা পেতে যে কারো যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

১৭
শীতের মাসগুলোতে শিকারের আয়োজন

শীত ঋতুতে গ্রেট খান ক্যাথির রাজধানীতে অবস্থান করেন, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়া বিরাজ করে। এ সময় তিনি প্রাসাদ থেকে চল্লিশ দিনের দূরত্ব পর্যন্ত শিকার উৎসব আয়োজনের আদেশ জারি করেন।

এতে জেলার গভর্নরদের বড় ধরনের সব খেলার জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হয়, যেমন বন্য শূকর, মর্দা হরিণ, বেঁটে হরিণ এবং ভাল্লুক এই সব বুনো জানোয়ার এভাবে সংগ্রহ করা হয় : যেখানে এই পশু পাওয়া যায় প্রদেশের জমির মালিকেরা সেই জায়গাগুলো চারদিক থেকে বেড়া দিয়ে সেগুলো হত্যা করে, এগুলোর কিছুসংখ্যক মারা হয় কুকুর লেলিয়ে দিয়ে, তবে বেশিরভাগই হত্যা করা হয় তীর ছুঁড়ে। এ ধরনের জায়গাগুলো প্রথমে সম্রাটের ব্যবহারের জন্য রাখা হয়,

এরপর রাজধানীর তেরো ক্রোশের মধ্যে যাদের বাস তারা দলবেঁধে এসে শিকার করে নিয়ে যায়। তবে চল্লিশ ক্রোশের বেশি দূর থেকে আসা লোকেরা পথের দূরত্বের কারণে কেবল চামড়াসহ অন্যান্য উপাদান সংগ্রহ করে, এসব উপকরণ সম্রাটের সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহার হয়।

১৮
শিকারে ব্যবহৃত বিভিন্ন পশু-পাখি

হরিণ ধরার জন্য গ্রেট খানের রয়েছে প্রচুরসংখ্যক চিতাবাঘ আর বনবিড়াল, সেই সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য সিংহ, যা ব্যাবিলনের সিংহের চেয়ে আকারে বড়, এগুলোর চামড়া উন্নত ধরনের আর রঙের দিক দিয়েও চমৎকার। শরীরের দু'পাশে রয়েছে সাদা-কালো আর লালচে ডোরা। শিকারের সময় বুনো শূকর, বুনো ষাঁড়, গাধা, ভালুক, মর্দা হরিণ, বেঁটে হরিণসহ অন্যান্য পশু মারতে এরা খুবই দক্ষ। এগুলোর দৃষ্টিশক্তিও প্রখর, যখনই শিকারের পিছু ধাওয়া করার জন্য কোনো সিংহকে ছেড়ে দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সেটা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিকারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই কারণে শিকারের সময় সম্রাট এগুলোকে সঙ্গে নেন। খাঁচায় পুরে গাড়িতে করে এদের পরিবহন করা হয়, এদের সঙ্গে ছোট্ট একধরনের কুকুরও বেঁধে রাখা হয়, এই কাজে এরা খুবই জনপ্রিয়। এর কারণ এরা এতটাই হিংস্র আর প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন যে এভাবে খাঁচায় বন্দি করে নেয়া না হলে সঠিকভাবে এদের কাজে লাগানো সম্ভব নয়। শিকারের গন্ধ এড়িয়ে চলার জন্য এদের বাতাসের বিপরীত দিকে নেয়া হয়, কেননা শিকারের গন্ধ পেলেই এরা দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দেয়, তখন এদের নিয়ে খেলার সুযোগ থাকে না।

সম্রাটের ঈগলও রয়েছে, যেগুলো নেকড়ে পাকড়াওয়ের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, আর আকার-আকৃতি এবং শক্তি এত বেশি যে এদের নখর থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব।*

১৯
গ্রেট খানের অভিযাত্রী দলের প্রধান দুই ভাই

সম্রাটের অধীনে কর্মরত ব্যারনদের মাঝে দুই ভাই আছে, তাদের একজনের নাম বায়ান এবং অপরজনের নাম মিনগান, তাতার ভাষায় এদের চিনুচি বলা হয়, যার মানে, 'কুকুররক্ষক'। তাদের কাজ হলো হাউন্ড আর ম্যাসটিফসহ নানা জাতের কুকুরের দেখভাল করা। এদের প্রত্যেকের অধীনে দশ হাজার লোকের একটা দল

---

* সে সময় পূর্ব তুর্কিস্তানে প্রশিক্ষিত ঈগল ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

কাজ করে; ধাওয়াকালীন সম্রাটের সঙ্গ দেবার সময়, এদের এক ভাইয়ের অধীনস্তেরা লাল রঙের পোশাক পরিধান করে, অন্যজনের লোকেরা পরে নীল রঙের পোশাক।

মাঠে তাদের সঙ্গে কম করে হলেও পাঁচ হাজারের বিভিন্ন প্রজাতির কুকুর থাকে। ভাইদের একজন তার দলবল নিয়ে সম্রাটের ডান দিকে এবং অন্যজন বাম দিকে অবস্থান নিয়ে, বিশাল একটা জায়গা ঘিরে ফেলার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকে নিয়মিত অগ্রসর হতে থাকে। এ রকম একটা জায়গা একদিনের হাঁটা পথের সমান বিস্তৃত। এ কারণে কোনো পশুই তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় না। সম্রাট যখন সেই বৃত্তের ভেতরে শিকারের পিছু ধাওয়ায় মত্ত থাকেন, তখন শিকারি আর হিংস্র কুকুরের কাজকারবারের সেই নয়নাভিরাম দৃশ্য খুবই উপভোগ্য। এ সময় তাদেরকে বন্য শূকর, ভাল্লুক, আর অন্যান্য আরো অনেক পশুর পেছনে ধাওয়া করতে দেখা যায়।

এই দুই ভাই অক্টোবরের শুরু থেকে মার্চের শেষ অবধি প্রতিদিন প্রাসাদে জোগান সরবরাহের কাজে ব্যস্ত থাকে, শিকার করা হাজারখানেক বড় পশু, কোয়েল এবং মাছও তাদের কাছ থেকেই পাবার আশা করা হয়। এসব জিনিস তাদের প্রচুর পরিমাণে বা যতটা পাওয়া যায় সরবরাহ করতে হয়, এর এক একটা মাছ তিনজন মানুষের খাবারের উপযোগী, পশুর আকৃতিও অনুরূপ।

২০
গেরফেলকন আর বাজ নিয়ে গ্রেট খানের শিকার যাত্রা

স্বভাবত সম্রাট মহানগরেই অবস্থান করেন। মার্চের শেষ নাগাদ তিনি সেখান থেকে বের হন। এ সময় তিনি উত্তর-পূর্বে অগ্রসর হন। পথে দুই দিনের সমুদ্র যাত্রা। সে সময় তার সঙ্গে পুরো দশ হাজার বাজপালক থাকে, যাদের সঙ্গে গেরফেলকন, পেরিজিন ফেলকন এবং বাজ আর অসংখ্য শকুন থাকে। নদী তীরজুড়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করার জন্য এগুলোকে সঙ্গে নেয়া হয়। এটা বুঝে নিতে হবে যে এসব লোকেদের সবাইকে তিনি একসঙ্গে এক স্থানে রাখেন না, তার বদলে এক শত লোকের বা তারও বেশিসংখ্যায় বিভিন্ন দলে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে চষে বেড়াতে দেয়া হয়। তবে সবচাইতে বড় অংশটা সম্রাটের সঙ্গেই অবস্থান করে। তার সঙ্গে টৈসকল নামের দশ হাজার লোক থাকে, যাদের কাজ হলো চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এরা ছোট ছোট কয়েকটা অংশে বিভক্ত হয়ে কাছাকাছি দুই-তিনটা ঘাঁটিতে অবস্থান করে। এভাবে তারা চারদিকের উল্লেখযোগ্য একটা জায়গা ঘিরে রাখে। এদের সবার কাছে একটা করে হুইসেল আর ঝুঁটিওয়ালা বাজ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রয়োজনে তারা বাজকে ডাক দিয়ে সেটাকে নিরাপদে রাখতে পারে। কেবল উড়ন্ত বাজকেই এ ধরনের হুকুম

দেয়া হয়, আর যারা সেই বাজ ছাড়ে তাদের সেটাকে আর অনুসরণ করার দরকার পড়ে না, কেননা, অনিরাপদ কোথাও চলে যাওয়া বাজের ওপর খুব মনোযোগসহকারে নজর রাখা বা হঠাৎ তাদের ফিরিয়ে আনার কাজটা অন্যদের।

সম্রাটের বা যেকোনো উচ্চপদস্থ অভিজাত লোকের পাখির পায়ে রুপোর একটা লেবেল আঁটা থাকে, তাতে তার মালিকের নাম এমনকি সেটার রক্ষকের নাম পর্যন্ত খোদাই করা থাকে। সতর্কতার অংশ হিসেবে, যেকোনো বাজকে নিরাপদ করার পরপরই মালিকের নাম দেখে নিয়ে সেটাকে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি এমন হয় যে, মালিকের নাম জানার পরও ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হবার কারণে উদ্ধারকারী তার কাছে বাজটি ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে পাখিটাকে তখন বালারগুচি নামের অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যার পদবির মানে হলো তিনি 'নির্দাবি সম্পত্তির অভিভাবক'। যদি কোনো ঘোড়া, তরবারি, পাখি, অথবা যেকোনো জিনিস পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়, আর সেটার প্রকৃত মালিকের খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহলে সন্ধান পাওয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ তা সেই অফিসারের কাছে নিয়ে যান। তিনি এটা গ্রহণ করে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করেন। অন্যদিকে, যদি কোনো লোক হারিয়ে যাওয়া কোনো জিনিসের খোঁজ পাবার পরও তা যথাযথ ভাণ্ডারে গচ্ছিত না রাখেন, তাহলে তাকে চুরির দায়ে শাস্তি পেতে হয়। যাদের কোনো কিছু হারানো যায় তাদেরকে এই অফিসারের কাছে আবেদন করতে হয়, যার কাছ থেকে তারা সেটা ফিরে পেতে পারে। ক্যাম্পে সবসময়ই তার অবস্থান সবচাইতে উঁচু স্থানে থাকে, আর সেই জায়গাটাকে পতাকা টানিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়, যাতে করে খুব সহজে যে কেউ তাকে খুঁজে পেতে পারে। এ ধরনের নিয়মের কারণে বলতে গেলে কোনো জিনিসেরই একেবারে হারিয়ে যাবার সুযোগ থাকে না।

এভাবে সম্রাটের সাগর তীর বরাবর অগ্রসর হবার সময়, শিকারের অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটে, আর সত্যি করে বলতে গেলে বিশ্বের আর কোনো স্থানে প্রমোদ ভ্রমণের সময় এত আনন্দ হয় না। শিকারে ধেয়ে যাবার সময় গিরিপথের সংকীর্ণতার দরুন যাত্রা পথের কোথাও কোথাও গ্রেট খানকে একটা বা দুটা হাতি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, প্রচুর সংখ্যার চাইতে অল্পসংখ্যকই তখন সুবিধাজনক। অন্যান্য পরিস্থিতিতে তিনি চারটি হাতি নিয়ে অগ্রসর হন, যাদের পিঠে চমৎকার কারুকার্য করা কাঠের শিবির স্থাপিত থাকে, এর ভেতরটা স্বর্ণের বস্ত্রে মোড়া, আর বাইরের দিক সিংহের চামড়াতে আবৃত করা থাকে, শিকারের প্রমোদ ভ্রমণের সময়টাতে গেঁটেবাতের প্রকোপমুক্ত থাকতেই এমনটা করা হয়, কেননা তিনি এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

শিবিরের ভেতরে সর্বদা তিনি সেরা বারোটি গেরফেলকন সঙ্গে রাখেন, তাদের সঙ্গে রাখেন বারোজন অফিসার। এগুলোর মধ্যে সবচাইতে প্রিয় গেরফেলকন তাকে সঙ্গ আর আনন্দদান করে। তার পাশে সঙ্গী ঘোড়সওয়ারেরা সামনে পড়া সারস আর

অন্যান্য পাখি সম্বন্ধে তাকে অবহিত করার পর, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্দা উঁচিয়ে বাইরে তাকান। এবং শিকারের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে গেরফেলকন উড়িয়ে দেন, যা সারসের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে ধস্তাধস্তি করে সেটাকে পরাজিত করে। শিবিরে শুয়ে শুয়ে সেই দৃশ্য দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন। সেই সঙ্গে তার সাথের অফিসারেরাও মজা পান। কিছু সময় ধরে এ ধরনের আনন্দের পর তিনি কাচার মাডুন নামক জায়গার উদ্দেশে রওনা হন, সেখানে সঙ্গে থাকা মহিলা, ছেলে এমনকি ব্যারনদের আর বাজরক্ষকদের জন্য শিবির আর তাঁবু টানানো হয়; সংখ্যায় যার পরিমাণ দশ হাজারেরও বেশি, আর সেসব দেখতেও খুবই চমৎকার। সম্রাটের তাঁবু, যেখানে তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন, তা এতই দীর্ঘ আর প্রশস্ত যে এর নিচে একাধারে দশ হাজার সৈনিক সমবেত হতে পারবে, সেখানেই উর্ধ্বতন অফিসারসহ বিভিন্ন পদস্থদের শোবার ঘর। দক্ষিণ দিক দিয়ে এর প্রবেশ পথ এবং এর পুবে আরো একটা তাঁবু টানিয়ে, সুপরিসর একটি সরাইখানা স্থাপন করা হয়। এখানে তিনি তার বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অভিজাতদের সঙ্গে থাকেন। এবং যখনই কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করেন তাদের সেখানে ডেকে পাঠান। এর পেছনের দিকে চমৎকার একটা কক্ষে তিনি ঘুমান; আর বিভিন্ন শ্রেণির লোকেদের জন্য সেখানে আরো অনেক তাঁবু আর বাসস্থান নির্মাণ করা হয়, কিন্তু সেসবের কোনোটারই বড় সেই তাঁবুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না।

এবার এই সব সভা কক্ষ আর ঘরের নির্মাণশৈলী আর সাজাবার রীতি সম্পর্কে বলা যাক। এগুলোর প্রতিটি তিনটি করে কাঠের থামের সাহায্যে তৈরি করা হয়, যার প্রত্যেকটাই আবার খুব ভালো করে খোদাই নকশা এবং গিল্টি করা থাকে। তাঁবুগুলো বাইরের দিকে সাদা-কালো আর লাল ডোরা আঁকা সিংহের চামড়ায় আবৃত করা থাকে, আর এমনভাবে একসাথে যুক্ত করা থাকে যাতে বৃষ্টি বা বাতাস ঢুকতে না পারে। ভেতরের দিকে আরমিন—গ্রীষ্মে এর লোম থাকে বাদামি আর শীতে সাদা রং ধারণ করে—আর স্যাবলের চামড়া দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়, যা সবচাইতে মূল্যবান লোমওয়ালা চামড়া, এর সাহায্যে নিখুঁতভাবে কোনো পোশাক বানানো হলে কম করে হলেও তার দাম পড়বে দুই হাজার স্বর্ণ বেজান্টের মতো, এর অন্যথা হলে দাম হবে হাজারের কাছাকাছি। তাতারদের কাছে এটা পশমের রানি। তাদের ভাষায় এই পশুর নাম রোন্ডস, এর আকৃতি নেউলের সমান। এই দুই পশমি পশু চামড়ার সাহায্যে খুব দক্ষতার সঙ্গে রুচিশীলভাবে সভাকক্ষ আর শয়নকক্ষসমূহ আলাদা আলাদা করে চমৎকারভাবে মুড়ে দেয়া হয়। তাঁবুর মজবুত দড়িগুলোর সবই রেশমের তৈরি।

সম্রাটের সুবিশাল তাঁবুর কাছে মহিলাদের তাঁবু অবস্থিত, সেটাও দেখতে খুবই চমৎকার আর জমকালো। তাদেরও সবার একই ধরনের গেরফেলকন, বাজ এবং অন্যান্য পশু-পাখি রয়েছে, এগুলোর সাহায্যে তারাও আমোদ-প্রমোদে অংশ নিয়ে থাকে। ছাউনি এলাকাতে লোকসমাগমের পরিমাণ অবিশ্বাস্য ধরনের এবং

একজন দর্শকের পক্ষে নিজেকে জনবহুল একটা মহানগরের ভেতরে কল্পনা করা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে এখানে লোকের সমাগম। গ্রেট খান তাঁর পুরো পরিবার আর ঘরগৃহস্থালিসহ এখানে উপস্থিত থাকেন; তাঁর ডাক্তারগণ, জ্যোতিষীগণ, বাজরক্ষকগণ এবং সব ধরনের অফিসারেরাও তাঁর সঙ্গে এখানে উপস্থিত থাকেন।

দেশের এই অংশে তিনি বসন্তের আগ পর্যন্ত অবস্থান করেন, এই সময়ে তিনি মাঝেমধ্যেই হ্রদ আর নদীপথে প্রমোদ ভ্রমণে বের হয়ে সেখান থেকে সারস, রাজহাঁস, হেরনসহ আরো বিভিন্ন প্রজাতির পাখি সংগ্রহ করেন। তার সঙ্গের লোকজনেরাও বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর জন্য প্রচুর পরিমাণে শিকার সংগ্রহ করে। এভাবে, সারা ঋতুজুড়ে আমোদ-প্রমোদ আর বিনোদনের মাধ্যমে তিনি এতটাই আনন্দে সময় কাটান যে চোখে না দেখলে সেসব কারো পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়; শিকারের উৎকর্ষ আর বিস্তৃতিও বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

সম্রাটের এলাকার অভ্যন্তরে শিকারের উদ্দেশ্যে শকুন, বাজ, বা যেকোনো প্রকার পাখি বা শিকারি কুকুরের ব্যবহার সকল ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষকসহ যে কারো জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এমনকি সম্রাটের শিবিরের চারপাশের এলাকাজুড়ে অভিজাত বা সামন্তযোদ্ধাদের পর্যন্ত পশু-পাখি শিকারের অনুমতি নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দূরত্বের পরিমাণ পাঁচ মাইল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ মাইলের মতো এবং সম্ভবত তৃতীয় কোনো ক্ষেত্রে এর পরিমাণ পনের মাইল, তবে তালিকাভুক্তরা এ ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। এই সীমার বাইরে যে কারো পক্ষে শিকার বৈধ। তারপরও, মার্চ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে গ্রেট খানের কর্তৃত্বাধীন এলাকার ভেতরে যেকোনো স্থানে হেরন, বেঁটে হরিণসহ এ ধরনের যেকোনো প্রাণী, বুনো শূকর বা এ ধরনের যেকোনো জানোয়ার, বা বড় আকৃতির যেকোনো ধরনের পাখি শিকার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে এদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যই এমন আইন করা হয়েছে, আর আইনের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করার বিধান থাকায় সব ধরনের শিকারের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়েছে।

স্বাভাবিক আবহাওয়া অতিক্রান্ত হবার পর, সম্রাট যে পথ দিয়ে বের হয়েছিলেন সে পথেই আবারও রাজধানীতে ফিরে আসেন; যাত্রাপথের সর্বত্রই তাঁর শিকার অব্যাহত থাকে।

২১
গ্রেট খানের সারা বছর

রাজধানীতে ফিরে আসার পর, তাঁর জমকালো সুরম্য প্রাসাদে টানা তিন দিনের এক ভোজের আয়োজন করা হয়। এ সময়ে তিনি তাঁর কাছের লোকেদের

আপ্যায়ন করেন। এই তিন দিনের আনন্দ-ফুর্তির চিত্রও সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর। এরপর তিনি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে তার নির্মিত শহরের দিকে যাত্রা করেন, যার কথা আমি আগেই বলেছি এবং এই শহরের নাম শাংটু, সেখানে তাঁর গ্র্যান্ড পার্ক আর বেতের প্রাসাদ রয়েছে এবং সেখানেই তিনি গেরফেলকন পোষেন।

গরম থেকে বাঁচতে গ্রীষ্মকালটা তিনি এখানেই অতিবাহিত করেন। কেননা জায়গাটা অপেক্ষাকৃত শীতল। এখানে তিনি মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত কাটিয়ে তারপর আবারও রাজধানীতে ফিরে গিয়ে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকেন, সে সময় নতুন বছরের প্রকাণ্ড সেই ভোজের আয়োজন করেন।

মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে সমুদ্রপথে প্রসিদ্ধ শিকার অভিযাত্রায় বের হন। তাই এভাবে সারা বছরের ছয় মাস মাত্র রাজধানীতে অবস্থান করেন, তিন মাস শিকার করে বেড়ান এবং তিন মাস উষ্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে বেতের প্রাসাদে অবস্থান করেন। এভাবে বছরজুড়ে তিনি প্রচণ্ড আনন্দ-ফুর্তিতে সময় অতিবাহিত করেন। তবে এখানে তার ব্যক্তিগত আনন্দের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আরো ছোট ছোট ভ্রমণে বের হবার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

২২
কানবালু নগরের অধিবাসী আর ব্যবসা-বাণিজ্য

কানবালু নগর তার বিপুল জনতা আর অসংখ্য ঘরবাড়িতে ঠাসা। নগর ছাড়াও এর চারপাশের বারোটা দরজার কাছে আরো বারোটা শহরতলি রয়েছে, কল্পনায় মনের উপলব্ধির চাইতেও তা অনেক বিশাল। এই শহরতলিগুলো মূল নগরের চাইতেও জনবহুল, আর এসকল স্থান থেকেই বণিকসহ অন্যান্যেরা রাজধানীর ব্যবসাপাতির নেতৃত্ব দেন, আর তাদের বেশিরভাগই এসব জায়গাতেই থাকেন। যখনই সম্রাট দরবারে বসেন, তখন চারদিক থেকে লোকেরা দলে দলে তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু পণ্য সংগ্রহ করতে ছুটে আসে।

এই শহরতলিগুলোতেও মূল নগরের আদলে চমৎকার আর দৃষ্টিনন্দন দালানকোঠা রয়েছে, এখানকার সব কিছুর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম কেবল গ্রেট খানের জমকালো প্রাসাদ। নগর প্রাঙ্গণে সমাহিত কারার ক্ষেত্রে কোনো মড়াকে ভোগান্তি পোহাতে হয় না; আর পৌত্তলিক যাদের মড়া পোড়াবার রীতি, তাদের শহরতলির বাইরে নির্দিষ্ট জায়গাতে তা বয়ে নিয়ে যেতে হয়। এখানে সব ধরনের সরকারি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। টাকার জন্য যেসব নারীরা পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে বেঁচে থাকে, এরা গোপনে নগরে তাদের পেশা পরিচালনা করে, তবে তাদের শহরতলিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়, যে কথা আগেই বলা হয়েছে, সেখানে তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের মতো। তবে এই সংখ্যা সেখানকার বণিক

আর অন্যান্য পর্যটকদের প্রয়োজনের তুলনায় খুব একটা বেশি নয়, এই সব লোকেরা অনবরত দরবারের কাজে নিয়মিত এখানে যাতায়াত করে থাকে।

এই নগরের সব কিছুই বিশ্বের যেকোনো স্থানের তুলনায় বিরল আর মূল্যবান; আর বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে সেটা আরো বেশি করে খাটে, যা মহামূল্যবান হীরে-জহরত, মণি-মুক্তা আর মাদক এবং মসলায় সমৃদ্ধ। ক্যাথিসহ সম্রাটের অন্যান্য সব প্রদেশে থেকে মূল্যবান সব কিছু এখানে নিয়ে আসা হয়, চাহিদা অনুসারে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য আনা-নেয়ার সুবাদে বণিকেরা প্রাসাদের কাছাকাছি এলাকাতে তাদের আবাসস্থল গড়ে তুলতে প্ররোচিত হন। এখানে পণ্যদ্রব্যের বিকিকিনি আর আনাগোনার পরিমাণ যেকোনো জায়গার চাইতে বেশি; কেবল কাঁচা রেশম বোঝাই হাজারখানেক ঘোড়ার গাড়ি প্রতিদিন এখানে প্রবেশ করে; আর স্বর্ণের কাপড় ও বিভিন্ন প্রকার রেশমের তৈরি উপকরণ প্রচুর পরিমাণে আসে।

রাজধানীর কাছাকাছি প্রাচীর ঘেরা আরো অন্যান্য অনেক ছোট ছোট শহর রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীদের বেশিরভাগই জীবন-জীবিকা প্রাসাদের ওপর নির্ভরশীল, নিজেদের প্রয়োজনে এরা তাদের উৎপাদিত পণ্য সেখানে বিক্রয় করে থাকে।

২৩
বেইলো এচম্যাথের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে করা গোপন পরিকল্পনা

এবার একটু পরেই নিয়োগদান করা এমন বারোজন ব্যক্তির কথা জানতে পারবেন যারা জমি, দপ্তর বন্টনসহ নিজেদের একক সিদ্ধান্তে সব ধরনের কাজ করার কর্তৃত্ব রাখেন। এমনই একজন মুসলিম লোকের নাম এচম্যাথ, অত্যন্ত ধূর্ত আর ক্ষমতাধর একজন লোক, যে কারো চাইতে গ্রেট খানের ওপর তার কর্তৃত্ব আর প্রভাব ছিল অনেক বেশি; এবং খান তাকে এমন অবস্থানে আসীন করেছিলেন যে ধারণা করা হতো তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন। তবে সত্যটা, তার মৃত্যুর পরে প্রকাশ পায়, জানা যায় জাদুটোনার মাধ্যমে এচম্যাথ খানকে নিজের প্রতি প্রচণ্ডভাবে আবেগতাড়িত করে রেখেছিলেন, যে কারণে সে যা যা বলত সব কিছুতেই তিনি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতেন, আর এভাবেই এচম্যাথ যা চাইতেন তা-ই তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারতেন।

এই লোক সব ধরনের সরকারি দপ্তরের ওপর কর্তৃত্ব রাখতেন এবং সব ধরনের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বিধান করতে পারতেন; এবং ঘৃণা করতেন এমন যে কাউকে তিনি আইনের আশ্রয়ে বা আইনের কোনো প্রকার পরোয়া ছাড়াই বিনা বিচারে হত্যা করতে পারতেন, এ ধরনের কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব

হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্রাটের কাছে যেতেন এবং বলতেন : "অমুকের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত, কেননা সে আপনার রাজকীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে এটা বা ওটা করেছে।" তখন মহিমান্বিত বলে উঠতেন : "আপনি যা সঠিক মনে করছেন তাই করুন" এবং তখন তিনি সরাসরি সেই লোকের গর্দান নিয়ে নিতেন।

লোকটার ক্ষমতা দিন দিন বল্গাহারা হয়ে উঠছে, আর তার প্রতি সম্রাটের আস্থা কতটা সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে যে সে যা বলছে তিনি তা-ই বিশ্বাস করছেন, এই অবস্থায় কেউই তার বিরোধিতা করার সাহস করছে না, একপর্যায়ে লোকে এটা খুব ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারে। বলতে গেলে কেউই এমন উচ্চ পদের অধিকারী বা ক্ষমতাধর নয় যে তার রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তার দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হলে সম্রাট সেটাকে ঘোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেন, ফলে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার আর কোনো উপায়ই তার থাকে না, কেননা কেউই সম্রাটের বিরুদ্ধে যেমন দাঁড়াবার সাহস দেখাতে পারে না, তেমনি এচম্যাথেরও কেউ বিরুদ্ধাচরণ করে না। আর তাই সে একে একে বহুসংখ্যক লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

আবার এমন কোনো সুন্দরী নারী বাকি ছিল না যাকে সে স্ত্রী হিসেবে কামনা করতে পারে, কিন্তু তারপরও সে অবিবাহিত নারীদের তার বউ হবার জন্য চাপ প্রয়োগ করত, অন্যথা রাজি হতে বাধ্য করত। যখনই সে জানতে পারত যে কারো ঘরে একটি সুন্দরী কন্যা রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার গুন্ডা বাহিনী সেই মেয়ের বাবার কাছে গিয়ে বলত: "কী বললে তুমি? তোমার ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে; এখনি বেইলো এচম্যাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও আর তাহলে তোমাকে তিন বছরের জন্য সরকারের অমুক পদে বা অমুক অফিসের দায়িত্বে বহাল করা হবে।" আর তখনই সেই লোক তার মেয়েকে তাদের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হতো। তখন এচম্যাথ সম্রাটের কাছে গিয়ে বলত : "সরকারের এই পদটি এত দিন ধরে শূন্য রয়েছে। অমুকের পুত্র অমুক এই পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি।" তখন জবাবে সম্রাট বলতেন : "আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করুন"; আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির বাবাকে সরকারের সেই পদে নিয়োগদান করা হতো। পিতা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা মন্ত্রীর ভয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হতো, এভাবে একপর্যায়ে সমস্ত সুন্দরী নারীরা বউ বা উপপত্নী হিসেবে তার কব্জায় চলে আসে। লোকটার পঁচিশজন ছেলেও রয়েছে, যারা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। তাদের অনেকেই বাবার সম্মান রক্ষার্থে তার মতোই গর্হিত অপরাধে জড়িত হয় এবং অসংখ্য ঘৃণ্য দুর্বৃত্তমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এভাবে এচম্যাথ অঢেল সম্পদেরও মালিক বনে যান, কেননা চাকরিপ্রার্থীদের সবার কাছ থেকে তিনি মোটা অংকের ঘুষ নিতেন।

এভাবে লোকটা টানা বাইশ বছর ধরে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে। অবশেষে দেশের জনগণ ক্যাথির লোকেদের বুদ্ধিমত্তায় তার ঘোর দুর্বৃত্তপনা আর সেখানকার জনগণের বিরুদ্ধে সংঘটিত অরুচিকর অপরাধের প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের বউ-ছেলেপেলে আর নিজেদের লোকেরা লোকটাকে হত্যা করে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা আঁটে। তাদের মাঝে চেনচু নামের এক ক্যাথিয়ান ছিল, সে হাজারের কমান্ডার, যার মা, মেয়ে আর বউ এচম্যাখ কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে। এবার সেই লোক, তার প্রতি পুরোমাত্রায় অতিষ্ঠ হয়ে তার মন্ত্রিত্ব ঘুচাবার জন্য অপর এক ক্যাথিয়ান হাজারের কমান্ডার ভানচুর সঙ্গে আলোচনায় বসে। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যখন গ্রেট খান কানবালুতে অনুপস্থিত থাকবেন তখনই কাজটা সারতে হবে। এখানে তিন মাস থাকার পর তিনি শাংটুতে তিন মাস অবস্থান করবেন; এবং সে সময় তার ছেলে চিনকিন স্বাভাবিকভাবেই শিকারে বের হবে, আর তখন রাজধানীর দায়িত্বে থাকবেন এচম্যাখ; কেবল জরুরি প্রয়োজনে খানের নির্দেশের জন্য শাংটুতে বার্তা পাঠাবেন।

তাই ভানচু এবং চেনচু সিদ্ধান্ত নেন তারা ক্যাথিয়ান নেতৃস্থানীয় লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করবে এবং তারপর অন্যান্য শহরে থাকা তাদের বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে সেখানে জনমত গড়ে তুলবে, এরপর নির্দিষ্ট দিনে পাহাড়ের ওপর থেকে আলোক-সংকেতের মাধ্যমে সব দাড়িওয়ালা লোকেদের হত্যা করতে শুরু করবে এবং অন্যান্য শহরগুলোও সেই আগুনের-সংকেত দেখার পর একই কাজ করবে। দাড়িওয়ালা লোকেদের নির্বিচারে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবার কারণ ক্যাথিয়ানদের সাধারণত কোনো দাড়ি নেই, কেবল তাতার, মুসলমান আর খ্রিস্টানদেরই দাড়ি রয়েছে। আর সবার জেনে রাখা দরকার যে তাদের ওপর যেসব মুসলিম আর তাতার গভর্নর নিয়োগ দেয়া হয়েছিল তারা তাদের সঙ্গে দাসের মতো ব্যবহার করত। ফলে এদের নিয়োগ দেবার বিষয়টা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। আর এ কারণেই সকল ক্যাথিয়ান গ্রেট খানের শাসনের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ কথা সবারই জানা যে গ্রেট খান পৈতৃক সূত্রে ক্যাথি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেননি, তিনি সেখানকার সিংহাসনে বসেছেন দখলদারিত্ব আর কর্তৃত্বপরায়ণতার মাধ্যমে; এবং তাই স্থানীয়দের প্রতি তার কোনো প্রকার আস্থা ছিল না। তাই তিনি সেখানকার সব কর্তৃত্ব তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার সেবায় অনুগত আর বিশ্বস্ত ক্যাথির ভিনদেশি তাতার, মুসলিম আর খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন।

আগে থেকে ঠিক করে রাখা দিনে ভানচু এবং চানচু রাতের বেলা প্রাসাদে প্রবেশ করে, ভানচু বসে বসে তার সামনে থাকা লাকড়ি দিয়ে বেশ কয়েক খণ্ড আগুন জ্বালায়। তারপর হঠাৎ-ই যেন গ্রেট খানের ছেলে ফিরে এসেছেন এমন ভান করে বেইলো এচম্যাখকে আগেকার নগর থেকে ডেকে পাঠিয়ে বার্তাবহ

প্রেরণ করেন। এ কথা শোনার পর এচম্যাথ খুবই অবাক হন, কিন্তু তারপরও দ্রুত রওনা হন, কেননা রাজপুত্রকে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেতেন। গেটের কাছে পৌঁছার পর তার সঙ্গে কগাটাই নামের তাতারের দেখা হয়। লোকটা বারো হাজারের ক্যাপ্টেন, তার সেই সেনাদের মাধ্যমেই রাজধানীর সেনানিবাস প্রস্তুত হয়েছে; তিনি তার কাছে জানতে চান তার কি খুব বেশি দেরি হয়ে গেল? "চিনকিন তো এই মাত্রই এলো।" কগাটাই এ কথা শুনে বলেন, "সেটা কি করে সম্ভব? একাকী তিনি কেমন করে আসতে পারেন যার কোনো কিছুই আমার জানা নেই?" তাই সে নির্দিষ্টসংখ্যক সৈনিক সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুসরণ করতে থাকেন। ক্যাথিয়ানদের ধারণা একবার যদি তারা এচম্যাথকে শেষ করে দিতে পারে তাহলে কোনো কিছুই তাদের ভড়কাতে পারবে না। এচম্যাথ প্রাসাদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, সেই আলোকসজ্জা দেখতে পান, চিনকিন ভেবে তিনি ভানচুর সামনে প্রণত হন আর মুক্ত তরবারি হাতে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা চেনচু তখনই সোজাসুজি তার গর্দান কর্তন করে।

প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে থাকা তাতার ক্যাপ্টেন কগাটাই এই দৃশ্য দেখার পরপরই চিৎকার করে ওঠেন "বিশ্বাসঘাতকতা!" এ কথা বলেই সে ভানচুর দিকে একটা তীর ছুড়ে, তাতে সে যেভাবে বসে ছিল সেই অবস্থাতেই মরে পড়ে থাকে। একই সঙ্গে তিনি তার লোকেদের চেনচুকে আটক করতে ডাকেন এবং নগরজুড়ে এই ঘোষণা প্রচার করে দেন যেন কাউকে সড়কের ওপর দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। ক্যাথিয়ানেরা বুঝতে পারে তাতাররা তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গেছে, আর তাদের এখন আর কোনো নেতা নেই, কেননা ভেনচু মারা গেছেন আর চেনচু ধরা পড়েছে। তাই তারা তখন পর্যন্ত যার যার বাড়িতেই অবস্থান করতে থাকে এবং কথামতো অন্যান্য শহরে সংকেত পাঠাতে ব্যর্থ হয়।

পুরো বিষয়টা উল্লেখ করে তৎক্ষণাৎ কগাটি গ্রেট খানের নিকট পত্রসহ বার্তাবহ প্রেরণ করেন এবং খান তাকে পুরো বিষয়টা বিশদ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের আদেশ দিয়ে জবাব পাঠান। পরদিন সকালে কগাটি ক্যাথিয়ানদের মাঝে অনুসন্ধান করে ষড়যন্ত্রে জড়িতদের নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজনকে খুঁজে বের করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অন্যান্য শহরেও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করতে পারে এটা বুঝতে পারার পর সেখানেও ঠিক একই প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়।*

কানবালুতে ফিরে আসার পর ঠিক কী কারণে এমন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে সেটা বুঝে ওঠার জন্য গ্রেট খান খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। এরপর অনেক

---

* এই অংশটুকু ফরাসি পাণ্ডুলিপিতে নেই তবে আগেকার একটা ইতালিয়ান সংস্করণে এটা পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, রেমুসিও টেক্সট নামের ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি থেকে এটা নেয়া হয়েছে।

অনুসন্ধান করে তিনি এচম্যাথ আর তার ছেলেদের গর্হিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হন। এটাও প্রমাণ হয় যে সে আর তার সাত ছেলে নারীদের বধূ হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়াও ধরে এনে বলাৎকার করতে ক্ষমতা প্রয়োগে কোনো ত্রুটি করেনি। এরপর গ্রেট খান পুরাতন রাজধানী থেকে এচম্যাথের অঢেল সমস্ত সম্পদ নতুন রাজধানীর ধনভাণ্ডারে এনে জমা করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি এচম্যাথের মরদেহ কবর থেকে তুলে কুকুর দিয়ে খাওয়াবার জন্য রাস্তায় ছুড়ে ফেলারও নির্দেশ দেন; আর তার যে সকল সন্তানেরা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করার আদেশ দেন।**

এমন পরিস্থিতি খানকে সারাসিন গোত্রের প্রতি তার আগেকার অতি জঘন্য ধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা সব ধরনের অপরাধী কর্মকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত, হ্যাঁ, এমনকি খুন করতে পর্যন্ত তারা পিছপা হয় না, তবে সেটা নিজ ধর্মের গণ্ডির ভেতরে নয়। তিনি দেখতে পান তার পূর্ব ধারণা অনুসারেই এচম্যাথ আর তার সন্তানেরা কোনো প্রকার পাপবোধ ছাড়াই এতসব জঘন্য অপরাধ করেছে, এর জন্য খান বিভীষিকাময় এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তাই তিনি সারাসিনদের ডেকে তাদের অনেক নিয়ম-নীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংগঠিত করেন, এত দিন ধর্মীয় কারণে তারা সেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারত। তিনি তাদের বিয়ে নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রদান করে তা তাতার আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেন। এবং গলা কর্তন করে খাবার জন্য মাংস সংগ্রহের বদলে তাতারদের মতো পেট কেটে তা করতে আদেশ করেন।

এসব ঘটনা ঘটার সময় মার্কো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

২৪
গ্রেট খান কর্তৃক কাগজের টাকার প্রচলন

কানবালু নগরে গ্রেট খানের টাকশাল অবস্থিত। সত্যি বলতে গেলে আলকেমির গোপন রহস্য ছিল তার নখদর্পণে। আর তাই তিনি নিচের বর্ণনা অনুসারে টাকা তৈরির কৌশল সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন।

** এই গল্পটা হুবহু চৈনিক বিবরণীতেও পাওয়া যায়; তবে সেখানে আরো বিস্তৃত আকারে এর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে মার্কো পলোর অকপট সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। "সম্রাট চেংঘান-নো থেকে শাংটুতে প্রত্যাবর্তন করেন। এচম্যাথকে ঠিক কী কারণে ভেংচু হত্যা করতে প্রবৃত্ত হন তার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য তার সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রণা পরিষদের প্রশাসক মার্কো। সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে আর এচম্যাথের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মার্কো খুব স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন, যার ফলে তিনি সম্রাটের আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। সম্রাটের চর্মচক্ষু খুলে যায়, ফলে তিনি ভেংচুর অসীম সাহসিকতার প্রশংসা করেন।"

রেশম পোকাকে যে গাছের পাতা খেতে দেয়া হয় সেই তুঁতগাছের ছাল ছাড়িয়ে, এরপর ছাল আর কাঠের মাঝখানে যে খোসা থাকে সেটা সংগ্রহ হয়। সেসব ভিজিয়ে রেখে পরে পালপে পরিণত হবার আগ পর্যন্ত মর্টারে অনবরত চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়, এটা থেকে তুলা তৈরি উপকরণের মতোই কাগজ পাওয়া যায়, তবে এই কাগজ দেখতে একেবারেই কালো। ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হবার পর, তিনি সেসব বিভিন্ন আকারের টাকার টুকরো হিসেবে কাটার জন্য পাঠান, প্রায় বর্গের মতো, তবে প্রস্থের চাইতে দৈর্ঘ্য সামান্য বেশি। এসবের সবথেকে ছোটটা আধ টর্নিসের সমমানের। পরেরটা ভেনিসিয়ান রৌপ্য মুদ্রা এক গ্রোট সমমানের; বাকিগুলো দুই, পাঁচ আর দশ গ্রোট মানের; অন্যগুলো এক, দুই, তিন এবং দশ বেজান্ট স্বর্ণ মুদ্রার সমান। কাগজি এইসব মুদ্রা স্বর্ণ আর রৌপ্যের মতোই মূল্যবান; কারণ এ ধরনের প্রতিটি নোটের গায়ে বিশেষভাবে নিয়োগকৃত অফিসারদের নামাঙ্কিত করা থাকে, সঙ্গে তাদের সিলও মারা হয়। নেতৃস্থানীয় অফিসারদের সবাই নিয়মিত সিঁদুরে চুবিয়ে তাতে তাদের কাছে গচ্ছিত রাজকীয় সিল মারেন। এভাবে প্রচলিত নোটের যথার্থতা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় এবং এই টাকা জাল করা গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হবার পর, কাগজের এই টাকা কুবলাই খানের রাজত্বের সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়; যেকোনো ধরনের বিকিকিনির বিনিময়ে কেউই সেই টাকা নিতে অস্বীকার করার সাহস দেখায় না। সাম্রাজ্যের সকল স্থানে দ্বিধাহীনভাবে যে কেউ এই টাকা গ্রহণ করে, কেননা, যখন ইচ্ছে তখনই তারা এর বিনিময়ে প্রয়োজনমতো আবারও মণি, মুক্তা, স্বর্ণ আর রুপা খরিদ করতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এর সাহায্যে সব কিছুই পাওয়া সম্ভব।*

বছরে বেশ কয়েকবার বিশাল বিশাল গাড়িতে করে বণিকেরা এসে হাজির হন। তারা স্বর্ণসহ উপরে উল্লেখ করা সব ধরনের উপকরণ গ্রেট খানের সামনে রাখেন। তখন তিনি প্রশিক্ষিত আর দক্ষ বারোজন লোককে ডেকে পাঠান। এই উদ্দেশ্যে বাছাই করা এই সব লোকেদের তিনি সেসব খুব ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে সেসবের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দেন। সেই অঙ্কটা এমন হতে হবে যেন তারা যথেষ্ট লাভ করতে পারে, কেননা তিনি ব্যবসায় যুক্তিসম্মত লাভের অনুমোদন করতেন। মূল্য নির্ধারণের পর সঙ্গে সঙ্গে তা এই কাগজের নোটে পরিশোধ করা হতো। এই নিয়ে বণিকদেরও কোনো আপত্তি ছিল না, কারণ, বরাবরের মতোই তারা দেখে আসছে, প্রদত্ত অর্থ তাদের উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম; এমনকি তাদের দেশে এই টাকার প্রচলন না থাকলেও তা দিয়ে অন্য কোনো পণ্য কিনে নিজেদের বাজারে বিক্রয় করা সম্ভব।

যখন কোনো লোকের কাছে এমন কোনো কাগজের নোট পাওয়া যায়, দীর্ঘদিন ধরে যা অতি ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে, তারা সেটা নিয়ে টাকশালে জমা করে, সেখানে মাত্র তিন ভাগের বিনিময়ে নতুন নোট দেয়া হয়। কাপ,

কোমরবন্ধের মতো জিনিসপত্র তৈরি করার দরকার বোধ করলে যে কেউ সমপরিমাণ নোটসহ স্বর্ণ বা রুপার পিণ্ডের জন্য টাকশালে আবেদন করতে পারে।

সম্রাটের সেনাসদস্যদের প্রত্যেককে এই কাগজের নোটে বেতন পরিশোধ করা হয়, যা তাদের কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মতোই মূল্যবান। এই বিচারে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, কুবলাই খানের ধনভাণ্ডার বিশ্বের যেকোনো সার্বভৌম রাজ্যের চাইতে অধিক সমৃদ্ধ।

২৫
সম্রাটের সামরিক ও বেসামরিক কাজে বারোজন ব্যারন

গ্রেট খান উচ্চপদস্থ অভিজাত হিসেবে বারোজনকে মনোনয়ন দান করেন এবং এইসব গণ্যমান্যেরা স্ব স্ব বাহিনীর সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে এক চৌকি থেকে অন্য চৌকিতে সেনা স্থানান্তর; তাদের কমান্ড অফিসার পরিবর্তন; প্রয়োজন অনুসারে কোথাও সেনা মোতায়েন; এবং যেকোনো নির্দিষ্ট কাজের গুরুত্ব অনুসারে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ। এছাড়াও, পরবর্তীতে পদোন্নতি আর পদভ্রষ্ট করার জন্য, যুদ্ধে পরাক্রম আর বীরত্বের স্বাক্ষর রাখা অফিসারদের সঙ্গে কাপুরুষোচিত আচরণকারীদের চিহ্নিত করে রাখাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। তাই, যদি হাজারের কমান্ডারকে কোনো ধরনের অশোভন আচরণ করতে দেখা যায়, এই ট্রাইব্যুনাল, তাকে সেই পদবির অনুপযুক্ত বিবেচনা করে শতের কমান্ডার হিসেবে পদভ্রংশ করেন; অথবা পদোন্নতি দেয়া সম্ভব এমন কোনো সদগুণাবলি দেখতে পাওয়া গেলে তাকে দশ হাজারের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেন। তবে এর সবই সম্রাটকে জানিয়ে তার অনুমোদনসাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়, তার কাছে অফিসারদের দোষ-গুণ সম্বন্ধে বিবরণী পেশ করা হয়। আর তখন তিনি কাকে পদোন্নতি দিতে হবে বা কাকে পদচ্যুত করতে হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। অন্যান্য মেধাবীদের অনুপ্রাণিত করতে তাদের জন্যেও তিনি বড় ধরনের পুরস্কার বা খেতাব ঘোষণা করে রেখেছেন। যাদের দ্বারা এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত সেইসব অভিজাতদের থাই নামে অভিহিত করা হয়, যার মানে সর্বোচ্চ আদালত, সার্বভৌমের অধীনে আর কেউই এতটা কর্তৃত্ব আর ক্ষমতার অধিকারী নন।

এর পাশাপাশি আরো একটা ট্রাইব্যুনাল রয়েছে, আগেরটার মতোই এতেও বারোজন অভিজাত অন্তর্ভুক্ত, এরা সাম্রাজ্যের চৌত্রিশটি প্রদেশের সরকার ব্যবস্থার সব ধরনের কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধায়নে নিয়োজিত। কানবালুর বিশাল আর জমকালো প্রাসাদ থেকে তারা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাদের জন্য সেখানে অসংখ্য কক্ষ আর সভাকক্ষ বরাদ্দ দেয়া আছে। প্রত্যেক প্রদেশের নেতৃত্বে একজন করে আইন-কর্মকর্তা রয়েছেন, সেই সঙ্গে আছে বেশ কয়েকজন

করে কেরানি, এদের সবার জন্য প্রাসাদে কক্ষ নির্দিষ্ট রয়েছে, ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা অনুসারে এখান থেকে মালিকানাধীন প্রদেশসমূহের যাবতীয় ও প্রয়োজনীয় কাজকারবার পরিচালনা করা হয়। বেশ কয়েকটা প্রদেশের সরকারের জনবল বাছাইয়ে এই ট্রাইব্যুনালের কর্তৃত্ব রয়েছে, বাছাইকৃতদের হাতে নিয়োগপত্র আর পদ অনুসারে স্বর্ণ বা রৌপ্যফলক সরবরাহ করার অনুমোদন চেয়ে গ্রেট খানের নিকট তাদের নাম পেশ করা হয়। ভূমি এবং আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এই উভয় ধরনের কর আদায় ও নিয়ন্ত্রণের কাজটি তারাই তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সব বিভাগের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতেই। এই ট্রাইব্যুনালের নাম সিং, যার মানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আদালত, আর আগেরটার মতো এটাও তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য কেবলমাত্র গ্রেট খানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। তবে আগের থাই নামের ট্রাইব্যুনাল যা কেবল সামরিক প্রশাসনিক কাজকারবার পরিচালনা করে পদ আর সম্মানের দিক থেকে তাকে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনালের চাইতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।

২৬
সড়ক-মহাসড়কের সর্বত্র ঘোড়ার ডাকের জন্য নির্মিত স্থান

কানবালু নগর থেকে অসংখ্য সড়ক আর মহাসড়ক প্রদেশের বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। এর প্রতিটি, বলতে গেলে, সব সড়ক আর মহাসড়কে পঁচিশ ত্রিশ মাইল পর পর পর্যটকদের থাকার জন্য ঘরসহ স্টেশন রয়েছে। এগুলোকে ইয়াম বা ডাকঘর নামে ডাকা হয়। সুপরিসর ও সুন্দর এইসব দালানে আসবাবসহ বেশ কিছু পরিপাটি কক্ষ রয়েছে, ঝুলন্ত রেশমের পর্দাসহ এসব স্থানে পদস্থদের উপযোগী সব কিছুই রয়েছে। এমনকি প্রয়োজনে এসব স্টেশন যাতে রাজাও সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে পারেন, সে জন্য শহর আর প্রাচীর ঘেরা জায়গাগুলো থেকে সব ধরনের জিনিসপত্র এখানে এনে জড়ো করে রাখা হয়; আর এদের বেশ কয়েকটিতে নিয়মিত প্রাসাদ থেকে রসদপাতিও সরবরাহ করা হয়।

সম্রাটের নিয়োজিত সকল বার্তাবাহক আর রাষ্ট্রদূতদের অবাধ যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে এইসব স্টেশনে সব সময় চারশত সুস্থ ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়। পরিশ্রান্ত আর দুর্বলগুলোর বদলে এখান থেকে তাদের সুস্থ-সবল ঘোড়া সরবরাহ করা হয়। এমনকি সড়ক-মহাসড়ক থেকে অনেক দূরের প্রত্যন্ত পার্বত্য জেলাগুলোতে, যেখানে আদতেই কোনো গ্রাম নেই, আর শহরগুলোও একটি অপরটি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সম্রাট সেখানেও এই একই রকমের দালান বানিয়ে, প্রয়োজনের সব কিছু দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুস্থ-সবল ঘোড়ার সরবরাহ প্রস্তুত রেখেছেন।

জমি চাষ এবং ডাকের কাজে থাকার জন্য তিনি এখানে লোক পাঠান; আর এ কারণেই জায়গাগুলোতে বিশাল বিশাল গ্রাম গড়ে উঠেছে। পাকাপোক্ত এই ব্যবস্থার কারণে, রাজদরবার থেকে রাষ্ট্রদূত আর অন্যান্য দূতেরা, সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে স্বল্প আয়েসে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ পান। এ ধরনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রেট খান সভ্যসমাজের অন্যান্য রাজা আর সম্রাটদের মাঝে একধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন।

তার রাজত্বে ডাক বিভাগের কাজে কম করে হলেও দু'লাখ ঘোড়া আর উপযোগী আসবাবসহ এ ধরনের দশ হাজার দালান নিয়োজিত রয়েছে। সত্যিকার অর্থেই এটা খুব চমৎকার আর কার্যকর একটা ব্যবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। যদি এমন প্রশ্ন করা হয়, এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের জনগণের মাঝ থেকে এত বেশি জনবল যোগান দেয়া কীভাবে সম্ভব হয় আর কেমন করেই বা তারা সেটার ভার বহন করতে পারে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হবে, পৌত্তলিক এবং তাদের মতো সারাসিনরাও পরিস্থিতি অনুসারে ছয়, আট বা দশজন করে নারী বিয়ে করে, যাদের ঘরে বিপুলসংখ্যক সন্তান জন্ম নেয়। অস্ত্রসহ বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য এদের কারো কারো ত্রিশের বেশি সক্ষম ছেলে রয়েছে; অন্যদিকে পশ্চিমাদের বন্ধ্যা প্রমাণ হবার পরও একটা নারীর সঙ্গেই পুরুষকে সারা জীবন পার করতে হয়, যার মানে পরিবার বড় করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এ কারণেই আমাদের জনসংখ্যা তাদের থেকে অনেক কম।

খাবারের বেলাতে, সেটার কোনো কমতি পড়ে না, কেননা এইসব লোকেরা, বিশেষ করে তাতার, খ্রিস্টান এবং দক্ষিণ চীনের মানজি প্রদেশের লোকেদের বেশিরভাগই ভাত, পেনিকাম, যব খেয়ে জীবনধারণ করে; এখানকার জমিতে বছরে তিনবার প্রচুর শস্য ফলে। তবে গম ততটা ভালো হয় না, আর এখানকার লোকেরা রুটিও খায় না, কেবল সেমাই আর পিঠা তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। একটু আগে উল্লেখ করা শস্যগুলো তারা দুধ বা মাংস দিয়ে ঝোল রাঁধে। তাদের কোনো চাষের জমিই পতিত পড়ে থাকে না; আর বিভিন্ন ধরনের গবাদিপশু দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে আর সেগুলোকে যখন মাঠে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন কম করে হলেও সাত-আটটার বেশি ঘোড়া দিয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এর সবই এখানকার এত বেশি জনসংখ্যার কারণ, আর এ ধরনের পরিস্থিতিই তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রচুর উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা করে থাকে।

ডাকঘরগুলোর মাঝামাঝি প্রতি তিন মাইল অন্তর ছোট ছোট গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোতে প্রায় চল্লিশটির মতো কুটির রয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাজে পায়ে হেঁটে যেসব দূত যাতায়াত করে তারা এখানে বিশ্রাম নেয়। দূর থেকে তাদের আগমন জানান দেবার জন্য এরা কোমরে ছোট ছোট ঘণ্টা লাগানো বেল্ট পরে। আর এ রকম পায়ে হাঁটা স্টেশন থেকে তিন মাইলের মতো দৌড়ে অপরটার

কাছাকাছি আসার আগে থেকেই তারা শোরগোল করে আগমনের কথা জানান দেন, আর তখনই নতুন তরতাজা একজন কুরিয়ার পৌঁছাবার সাথে সাথেই তার ঝোলা নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি থাকেন। তাই সাধারণত দূরবর্তী অঞ্চল থেকে যেসব খবর সম্রাটের কাছে পৌঁছাতে দশ থেকে বারো দিনের বেশি সময় লাগার কথা, সেটা তিনি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আগেভাগেই দুই দিন দুই রাতের মধ্যে পেয়ে যান। দূরত্ব দশ দিনের হলেও, ফলের ঋতুতে প্রায়ই এমন ঘটতে দেখা যায় যে কানবালু থেকে সকালে পাঠানো বার্তা সেদিনই বিকেলের মধ্যে শাংটুতে গ্রেট খানের কাছে পৌঁছে যায়।

তিন মাইলের এই স্টেশনগুলোর প্রতিটিতে একজন করে কেরানি রয়েছে, যার কাজ হলো কুরিয়ারদের যাওয়া-আসার সময় টুকে রাখা; সব ডাকঘরেই এটা করা হয়। এর পাশাপাশি এইসব স্টেশনের কাজকারবার দেখভাল আর দায়িত্বে অবহেলাকারী অলস কুরিয়ারদের শাস্তি দিবার জন্য স্টেশনগুলোতে অফিসারদের মাসিক পরিদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। এইসব কুরিয়ারেরা কেবল কর অবকাশই ভোগ করে না, তারা সম্রাটের কাছ থেকে অনেক বেশি ভাতাও পেয়ে থাকে।

এ ধরনের সেবা কাজে নিয়োজিত কুটিরসমূহের পেছনে সরাসরি কোনো ব্যয় করা হয় না, শহর আর গ্রামের প্রতিবেশীরা স্বেচ্ছায় এগুলো সজ্জিত আর রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর অধিবাসীদের কারা একাই এইসব ঘোড়া সরবরাহে সক্ষম সম্রাটের পক্ষ থেকে শহরগুলোর গভর্নরদের প্রতি তা ভালো করে জেনে রাখার নির্দেশ রয়েছে। মফস্বল শহর আর গ্রামেও ঠিক একই কাজ করা হয়; এবং প্রয়োজন আর চাহিদা অনুসারে তারা সেসব যোগান দিতে বাধ্য; স্টেশনের দু'পাশের লোকেরা আনুপাতিক হারে তাতে অংশ নেয়। পরে ঘোড়াগুলোর দেখভালের খরচ সম্রাটকে দেয় শহরের কর থেকে বাদ দেয়া হয়।

তবে, এটা বুঝে নিতে হবে যে, সেই চারশত ঘোড়ার সবগুলোই একসঙ্গে স্টেশনের কাজে নিয়োজিত থাকে না, কেবল দুই শত ঘোড়াই মাসজুড়ে তাতে অবস্থান করে। এ সময় বাকি অর্ধেক ঘোড়াকে ঘাস খেতে মাঠে চড়াবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়; এবং পরের মাসের শুরুতেই, তাদের কাজে আনা হয়, এই সময় আবার আগেরগুলোকে মোটাতাজা করার কাজ চলে; এভাবে প্রতিটা ঘোড়া একে অপরকে বিশ্রাম দেয়।

এই সব পায়ে গমন করা কুরিয়ার বা ঘোড়া-যাত্রী দূতেদের যাত্রাপথে নদী বা হ্রদের জায়গাগুলোতে কাছাকাছি শহরগুলো এদের পারাপারের জন্য সব সময় তিন-চারটা নৌকা তৈরি রাখতে বাধ্য; আর কয়েক দিনের দূরত্বের যেসব মরু পথে কোনো বসতি থাকা সম্ভব নয় সেসব পাড়ি দেয়ার জন্য সীমান্তবর্তী শহরগুলো সম্রাটের কাছে গমনাগমন করা দূত আর রাষ্ট্রদূতদের উপযোগী রসদসহ ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে বাধ্য। মহাসড়কের কাছাকাছি অবস্থিত ডাক

স্টেশনগুলো সাজানো-গুছানো ও যোগান সরবরাহের আংশিক সম্রাটের খরচে আর বাকিটা সেখানকার শহর আর জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়।

দেশের যেকোনো জায়গা থেকে স্থানীয় চিফের বিদ্রোহ বা অন্য যেকোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্রাটের কাছে পৌঁছাবার দরকার হলে এইসব বার্তাবহেরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিনে দুই শত বা আড়াই শত মাইলেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। এ রকম যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা কাজ ও বার্তার গুরুত্ব অনুসারে জরুরি সংকেত হিসেবে সঙ্গে গেরফেলকনের মাথা খোদিত ফলক বহন করে। আর তখন শরীরে বর্ম আর মাথায় কাপড় বেঁধে একই স্থান থেকে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে প্রচণ্ড গতিতে একসঙ্গে দুজন দূত রওনা হয়। পঁচিশ মাইল দূরের পরবর্তী পোস্টে পৌঁছাবার আগ পর্যন্ত তারা আর থামে না, সেখানে পৌঁছাবার পর কোনো ধরনের বিশ্রাম না নিয়েই তৎক্ষণাৎ তরতাজা আর কর্মক্ষম দুটা ঘোড়ায় চড়ে বসে, আর দিন শেষ হবার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক পর্যায়ে একইভাবে ঘোড়া বদলাতে থাকে, এভাবে তারা পুরো আড়াই শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে।

আরো ভীষণ কোনো জরুরি প্রয়োজনের সময় তারা রাতের বেলাতেও তাদের এ ধরনের যাত্রা অব্যাহত রাখে, আর সেটা অমাবস্যার সময় হলে পরের স্টেশন পর্যন্ত তাদের আগে বাতি হাতে একজন সঙ্গ দেয়; বাতি হাতে দৌড়ানো লোকের পক্ষে একই তালে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলে, তাতে দিনের সমান গতি অর্জন সম্ভব হয় না। পীড়ন সহ্য করার অসম্ভব ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন দূতদের মূল্যায়নও করা হয় অনেক বেশি।

এবার আমরা এই বিষয়ে কথা বলা শেষ করছি, আর আমি এখন আপনাদের সামনে হিতসাধনের এমন এক মহান দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি যা গ্রেট খান প্রতি দু'বছর পরপর সম্পাদন করে থাকেন।

২৭
আপৎকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সম্রাটের পাঠানো ত্রাণ

প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে গ্রেট খান তার বাৎসরিক আদায় সংগ্রহে সরকারি কমিশন প্রেরণ করেন। তবে ঝড়, অতিবৃষ্টির মতো প্রতিকূল আবহাওয়া বা পঙ্গপালসহ যেকোনো ধরনের পতঙ্গের আক্রমণ, অথবা প্লেগসহ যেকোনো ধরনের মহামারির কারণে তাঁর অধিকৃত এলাকার কোথাও ফসলহানি হলে; এবং এ ধরনের যেকোনো পরিস্থিতিতে সেখানকার নিয়মিত বাৎসরিক আদায় স্থগিত করে, সরকারি শস্যভাণ্ডার থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের খাওয়া, পরা আর নতুন ফসল বোনার প্রয়োজনীয় শস্য আর বীজ সরবরাহ করা হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, অতি-ফলনের সময়, তিনি এ ধরনের শস্য প্রচুর পরিমাণে কিনে রাখেন, যা বেশ কয়েকটি প্রদেশের শস্যভাণ্ডারে মজুদ করা হয়

এবং তিন-চার বছরের মধ্যে যাতে নষ্ট হতে না পারে সে জন্য খুব যত্নসহকারে তার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ হলো, আপৎকালীন যোগানের জন্য এই শস্যভাণ্ডারগুলো যেন সব সময় পরিপূর্ণ রাখা হয়; এবং অধিক ফসল ফলে এমন ঋতুতে তিনি টাকার বিনিময়ে প্রচলিত বাজারদরের চারগুণ দামে শস্য সংগ্রহ করিয়ে রাখতেন। একইভাবে যেকোনো জেলাতে পশুর মড়ক দেখা দিলে অন্যান্য প্রদেশ থেকে তাদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। সত্যিকার অর্থেই, তাঁর সকল চিন্তা-চেতনা হলো জরুরি উপকরণ দিয়ে শাসিত এলাকার জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা করে নিজ পরিশ্রমে তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং উন্নতিসাধনের পথ উন্মুক্ত করা। তবে এখানে গ্রেট খানের বিচিত্র একটা নিয়মের কথাও বলে রাখছি, কোথাও বিজলিচমকে ভেড়া বা গৃহপালিত অন্য যেকোনো ধরনের পশুপালের ক্ষতি হলে, তাতে যত জনের সম্পত্তি বা যত বড় পশুপালের ক্ষতি হোক না কেন, সেখান থেকে তিনি টানা তিন বছর পর্যন্ত বাড়তি পশুর এক-দশমাংশ আদায় বিরত রাখতেন; এবং কোনো বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর বাজ পড়লে তাকেও অশুভ বিবেচনা করে সেখান থেকে কর আদায় বিরত রাখেন। স্রষ্টা, তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সেইসব জিনিসের মালিকদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর তাই স্বর্গীয় রোষযুক্ত সম্পত্তি তিনি আপন ধনভাণ্ডারে ঢুকতে দিতে পারেন না।

২৮

সড়কের দু'পাশে রোপণ করা গাছ আর তার যত্ন

গ্রেট খান অন্য আরো একটা নিয়ম চালু করে গেছেন, যা সমানভাবে দৃষ্টিনন্দন আর কাজের। সড়কের দু'ধারে তিনি লম্বা আর মোটা হতে পারে এ ধরনের গাছ রোপণ করান, দু'কদম পরপর লাগানো এ ধরনের গাছ গ্রীষ্মে ছায়া দেয় আর শীতে চারদিক বরফে ছেয়ে থাকার সময়টাতে সবাইকে পথের নিশানা চিনতে সহায়তা করে। উপরন্তু এর মাধ্যমে পর্যটকেরা অনেক নিরাপদে ঝুঁকিমুক্ত ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। উপযোগী মাটি রয়েছে এমন সব প্রধান সড়ক এভাবে বৃক্ষায়ন করা হয়েছে; কিন্তু পথের যেখানে মরুভূমির বালি আর পাহাড়ি কঙ্করময় এলাকা, যেখানে গাছ জন্মানো একেবারেই অসম্ভব, সেখানে তিনি পথের নিশানা হিসেবে পাথরের থাম পুতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি র‍্যাঙ্কযুক্ত এমন অনেক অফিসারও নিয়োগ দিয়েছেন, যাদের কাজ হলো এর সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না এবং সড়কের সব জায়গা চলাচলের উপযুক্ত কি না সব সময় তা নজরদারির মধ্যে রাখা। এছাড়াও তাদের আরো একটি

মতলবের কথা জানা যায়; জ্যোতিষীরা গ্রেট খানকে বলেছেন যারা অধিক পরিমাণে গাছ লাগান স্রষ্টা তাদের দীর্ঘ জীবন দান করার মধ্য দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

২৯
ক্যাথি প্রদেশের ওয়াইন

ক্যাথি প্রদেশের বেশিরভাগ লোকেরা ভাতের সঙ্গে নানা ধরনের মসলা আর ওষুধ মিশিয়ে প্রস্তুত একধরনের ওয়াইন পান করে। এই পানীয়, বা ওয়াইন, যে নামেই একে ডাকা হোক না কেন, এটা এতটাই স্বাদ আর গন্ধযুক্ত যে এর চাইতে আর ভালো কিছু এখানকার লোকেরা কল্পনাই করতে পারে না। এই পানীয় খুবই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, আর স্বাদে আনন্দদায়ক, আর খাবার পর খুব গরম অনুভূত হয়। এসব গুণের কারণে যে কেউ এটা পান করার পর অন্য যেকোনো ওয়াইনের চেয়ে খুব দ্রুত মাতাল হন।

৩০
জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ক্যাথির কালো পাথর

এই প্রদেশজুড়ে ছোট ছোট একধরনের কালো পাথর পাওয়া যায়, সেখানকার পাহাড়ে গিয়ে তারা পাথরের মাঝে খনন করে এসব তুলে আনেন। আগুন ধরালে তা কয়লার চেয়ে ভালোভাবে পোড়ে আর এর আগুন কাঠের চেয়ে বেশি সময় ধরে জ্বলে; এতে রাতে আগুন দিলে সকালে উঠেও জ্বলতে দেখা যায়। তবে সামান্য তাপে এগুলোতে আগুন ধরানো সম্ভব নয়, এর জন্য দরকার যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ।*

এটা সত্য যে এখানকার কোথাও কাঠের অভাব নেই, কিন্তু অধিবাসীদের সংখ্যা এত বেশি আর তাদের রান্না ও গোসলে অনবরত লাকড়ির চুলা জ্বালাবার দরকার পড়ে যে তাতে চাহিদা অনুসারে কাঠ পাওয়া মুশকিল। এখানে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে সক্ষমতা থাকার পরও গ্রীষ্মে সপ্তাহে অন্তত তিনবার এবং শীতে প্রতিদিন উষ্ণ জলে গোসল করে নি। পদস্থ বা ধনীদের সবার ঘরেই নিজস্ব ব্যবহারের জন্য এ ধরনের একটি করে চুলা রয়েছে; এবং এভাবে ব্যবহার করতে থাকলে অনতিবিলম্বে কাঠের মজুদ অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হতে বাধ্য; অন্যদিকে এই পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর যার দামও খুব কম।

---

* লিউ-এর রচিত চৈনিক সাহিত্যে প্রথম কয়লার উল্লেখ পাওয়া যায়, ১২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন আইস-চারকল বা বরফ-কয়লা।

৩১
গ্রেট খানের কাছ থেকে দরিদ্রেরা বিস্ময়কর আর প্রশংসনীয় বদান্যতা ভোগ করে

এটা আগেই বলা হয়েছে যে সম্রাট দেশের বিভিন্ন জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য বিলি করে থাকেন। এবার কানবালু নগরের দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য আর আগাম সতর্কতার কথা জানা যাক। যখনই তিনি এমন কোনো পরিবারের কথা জানতে পারেন যা কোনো কারণে গরিব হয়ে পড়েছে, বা বৈকল্যের কারণে এর কর্তা সদস্যদের জন্য কাজ করে খাবার জুটাতে অক্ষম: এ ধরনের পরিস্থিতিতে পরিবারটিকে তিনি সারা বছরের দরকারের সব কিছু দান করেন। এর জন্য প্রথানুগ সময়ে তাদের সম্রাটের নির্দিষ্ট বিভাগের দাপ্তরিক অফিসারের সামনে উপস্থিত হতে হয়। সম্রাটের খরচাদির হিসেব রাখা এইসব অফিসারেরা প্রাসাদেই বসবাস করেন। তাদের কাছে বিগত বছরের জিনিসপত্রের হিসেব লিখিত আকারে দেয়ার পর, চলতি বছরেও এ ধরনের সবার জন্য ঠিক একই পরিমাণ বরাদ্দ সরবরাহ করা হয়।

একইভাবে সম্রাট দরিদ্রদের জন্য কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি উৎপাদিত উল, রেশম আর শাণের (শণ থেকে প্রস্তুত) এক-দশমাংশের আদায় থেকেই তা দিয়ে থাকেন। এইসব উপকরণ থেকে বিভিন্ন ধরনের কাপড় বোনা হয়, এর জন্য একটা ঘর তুলে দেয়া হয়, যেখানে সব কারিগরেরা সপ্তাহে এক দিন সম্রাটের হয়ে কাজ করতে বাধ্য। শীত ও গ্রীষ্মের চাহিদামতো গরিবদের জন্য সেখান থেকে বস্ত্র তৈরি করা হয়। সেনাবাহিনীর জন্যেও তিনি পোশাক প্রস্তুত করান। প্রতিটি শহর আর নগরে উলের যেসব অসংখ্য বয়নাগার রয়েছে সেখান থেকে দশমাংশ আদায়ের মাধ্যমে তা জোগাড় করা হয়।

৩২
ত্রাণের জন্য অসংখ্য লোকের আবেদন

এ কথা জানা থাকা দরকার যে তাতাররা, তাদের সত্যিকারের প্রথা মেনে চলে বলে, তারা পৌত্তলিক ধর্মে দীক্ষিত হয় না, ভিক্ষাবৃত্তিও করে না, আর যখনই কোনো গরিব মিসকিন তাদের কাছে ভিক্ষার জন্য যায়, সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে এ কথা বলতে বলতে তাড়িয়ে দেয়, "যে স্রষ্টা তোমাকে পাঠিয়েছেন এই খরা নিয়ে নালিশ করার জন্যে তার কাছে যাও; তিনি তোমাকেও ভালোবাসেন, যতটা আমাকে বাসেন, অবশ্যই তিনি তোমাকেও দিবেন।"

কিন্তু যখনই পৌত্তলিক পণ্ডিত বিশেষ করে ব্যাকসিস যাদের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারা সম্রাটকে বোঝায় যে, গরিবদের দান করা খুবই ভালো কাজ

এবং তা তাদের দেবতার কাছে খুব সহজে পৌঁছে যায়, তিনি তাদের ইচ্ছের কথা বুঝতে পারেন এবং তারপর থেকে খাবার চাইতে আসলে ক্ষুধার্ত আর দরিদ্রদের কাউকেই আর ফেরানো হয় না। এমন কোনো দিন নেই যেদিন বিলি করা হয় না, প্রতিদিন বারো হাজার পাত্র বোঝাই ধান, চাল, যব, আর পেনিকাম বিলানো হয়। আর এভাবেই গ্রেট খান গরিবদের প্রতি বিস্ময়কর আর প্রশংসনীয় বদান্যতা দেখান, সেইসব লোকেদের সকলেই তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে।

৩৩
কানবালু নগরের জ্যোতিষেরা

কানবালু নগরের খ্রিস্টান, সারাসিন, আর ক্যাথিয়ানদের মাঝে কম করে হলেও পাঁচ হাজারের মতো জ্যোতিষী আর গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা রয়েছে। গরিবদের মতোই এদের পরিবারের জন্যেও ঠিক একইভাবে সম্রাট খাবার-দাবার আর কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে থাকেন, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, আর এদের সবাই অবিরামভাবে তাদের কলাবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রাখেন।

সঙ্গে থাকা এস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে, তারা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তখনকার বা পুরো বছরের বেশ কিছু ভালো-মন্দ ঘটনা বলে দেন। মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুখণ্ড নিরূপণ আর তাদের সম্ভাব্য অবস্থান* নির্ণয় করার জন্য প্রত্যেক গোত্রের জ্যোতিষীদের তাদের নিজস্ব ছক অনুসারে বাৎসরিক পরীক্ষা নেয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন রাশিতে অবস্থিত গ্রহের গতিপথ দেখে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এবং বিস্ময়করভাবে প্রত্যেক মাসের কথা আগাম বলে দিতে পারেন। যেমন—কেন, মাসের কবে ঝড় হবে, বাজ পড়বে, ভূমিকম্প হবে; কবে থেকে বজ্রঝড়সহ অতিবৃষ্টি শুরু হবে; কবে রাজ্যজুড়ে যুদ্ধ, রোগ-শোক, মৃত্যু, রাহাজানি আর বিদ্রোহ দেখা দিবে।

এ রকম কিছু একটা নিজেদের এস্ট্রোল্যাবের সাহায্যে খুঁজে পাবার পরপরই তারা ঘোষণা করে দেন যে অচিরেই এমনটা অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে; সেই সঙ্গে এও বলেন, স্রষ্টা, তাঁর শুভ ইচ্ছা অনুসারে, তারা যা হিসেব কষেছেন তার থেকে কমবেশি কিছু একটা করবেন। নির্দিষ্ট বর্গের ভেতরে তারা তাদের সেই বছরের গণনা লিখে রাখেন, যার নাম টাকুইন এবং এর প্রতিটি তারা এক গ্রোটের বিনিময়ে সেইসব লোকেদের কাছে বিক্রয় করেন, যারা তাতে উঁকি দিয়ে

---

* বসর বিদ্রোহের পর (১৯০১) কুবলাই খানের জন্য তৈরি ব্রোঞ্জের এমন দুটি সুন্দর এস্ট্রোনোমিকাল যন্ত্র ভুল করে বার্লিনে নিয়ে আসা হয়। "আমি জানতে পেরেছি ভার্সালিসের চুক্তির মাধ্যমে তারা এমন একটি বস্তু উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। তাই, সম্ভবত এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাভালাভের দিকটি হলো এটি বিশ্বকে নিরাপদ করতে পেরেছে।" দ্য প্রবলেম অব চায়না বার্ট্রান্ড রাসেল।

নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে আগ্রহী। সাধারণভাবে যার গণনা সবচেয়ে সঠিক হয় তাকে এর গুরু বলে বিবেচনা করা হয় আর ঘটনাক্রমে সবার থেকে বেশি সম্মান করা হয়।

যখনই কোনো লোক মহৎ কোনো কর্ম সম্পাদনের বাসনায়, বাণিজ্য পথে দূরে কোথাও যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিতে যায়, অথবা অন্য যেকোনো কাজের শুরুতে সেই কাজের সাফল্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলে, তিনি এ ধরনের কোনো জ্যোতিষের কাছে গিয়ে তার সাহায্য কামনা করেন এবং তাকে জানান যে তিনি এ ধরনের অভিযানে বের হচ্ছেন, তিনি যেন তার অনুকূল গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা নির্ণয় করে দেন। তখন সেই জ্যোতিষ তার জন্ম তারিখ জেনে নেন, কেননা এ ধরনের জবাবের জন্য তাকে সেই লোকের জন্মের সন-তারিখ, বার আর ঘণ্টা জানতে হয়; আর তখন তিনি এ সম্পর্কে জেনে, সে সময়কার গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান বিবেচনা করে গণনা করেন। সব কিছু হিসেব-নিকেষ শেষ হলে জানা যায় সেই অভিযান আদৌ সফল না ব্যর্থ হবে।

জানা যায় তাতাররা বারো বছরের চক্র থেকে তাদের সময় গণনা করে; যার প্রথম বছরের নাম সিংহ; দ্বিতীয় বছরের নাম ষাঁড়; তৃতীয় বছরের নাম ড্রাগন; চতুর্থ বছরের নাম কুকুর; এবং এভাবে পুরো বারো বছরের প্রতিটির আলাদা করে নামকরণ করা হয়েছে।** তাই যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় সে কোন বছরে জন্মেছে, জবাবে সে বলে সিংহের বছরে, অমুক দিনের অমুক ঘণ্টা আর মিনিটে; এর সব কিছুই তার পিতামাতা একটি ডায়রিতে টুকে রাখেন। এই বারো বছরের আবর্তনের পর আবার তা প্রথম থেকে শুরু হয় এবং ঠিক একইভাবে তা অবিরামভাবে চলতে থাকে।

৩৪
আত্মা সম্পর্কে তাতারদের ধারণা ও ধর্মসহ আরো কিছু রীতি

আগেই জানা গেছে, এইসব পৌত্তলিকেরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে, প্রত্যেকে তাদের বাড়ির প্রাচীরে কোনো উঁচু স্থানে এক ফলক স্থাপন করে, যার ওপর তারা একটা নাম লিখে রাখে, যার দ্বারা তাদের স্বর্গ আর পাতালের ঈশ্বরকে বোঝায়। এর প্রতি প্রতিদিন তারা ধূপ-ধুনা জ্বালিয়ে পূজা দেয়। হাত উঁচিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করে তিনবার মেঝেতে প্রণত হয়ে মাথা তুলে, দেহ-মনের সুস্বাস্থ্য কামনা করে; তার কাছে ছাড়া তারা অন্য কারো কাছে আর কিছু চায় না। এর নিচে মেঝেতে নাটিগাই নামের তাদের একটি মূর্তি রাখা হয়, একে তারা পৃথিবীর সব কিছুর বা মাটি থেকে উৎপন্ন সব জিনিসের দেবতা বলে মনে করে। তারা একে

** এই চক্রটি হবে এভাবে : ১. ইঁদুর; ২. ষাঁড়; ৩. বাঘ; ৪. খরগোস; ৫. ড্রাগন; ৬. সর্প; ৭. ঘোড়া; ৮. ভেড়া; ৯. গরিলা; ১০. মোরগ; ১১. কুকুর; ১২. শূকর।

একটি বউ আর সন্তান উপহার দেয় আর একইভাবে ধূপ-ধুনা দিয়ে হাত উঁচিয়ে করজোড়ে প্রার্থনাসহকারে পূজা করে। তার কাছে তারা প্রতি ঋতুর আবহাওয়া, প্রচুর শস্য, ক্ষেত্র বিশেষে পরিবার-পরিজন এবং অন্য সবার মোঙ্গল কামনা করে।

একইভাবে তাদের বিশ্বাস আত্মা অমর। কোনো মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য এক শরীরে প্রবেশ করে এবং আগের মতোই সে জীবনভর সৎ বা অসৎকর্মে নিয়োজিত থাকে, তার ভবিষ্যৎ দিন দিন ভালো বা মন্দে ভরে ওঠে। কোনো অসহায় লোক হলে, আর আচরণে ভদ্র আর ভালো হলে, সে কোনো ভদ্র ঘরে ভদ্রমহিলার গর্ভে পুনরায় জন্ম নেয়, এর পর উচ্চপদস্থ কোনো নারীর গর্ভে ভদ্রলোক হিসেবে জন্মে; এভাবে অবিরামভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত সে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু এর বদলে ভদ্র ঘরে জন্মেও যদি সে সৎকর্ম না করে তাহলে পরের জন্মে সে একজন ভাঁড় হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, তারপর কুকুর হয়, এভাবে প্রতি জন্মে অবিরাম অধঃপতিত হতে হতে নিচ থেকে আরো নিচে পৌঁছাতে থাকে।

তাদের কথা বলার রীতি খুবই নম্র আর ভদ্র; একে অপরকে তারা খুব ভদ্রতার সঙ্গে প্রসন্ন বদনে অভিবাদন জানায়, হালকা করে নির্দিষ্ট বিরতির পর নিঃশ্বাস নেয় এবং বিশেষভাবে পরিষ্কার করা খাবার খায়। পিতামাতার প্রতি তারা গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করে। কোনো সন্তান বাবা-মার অবাধ্য হলে তাদের অবমাননা করলে পিতামাতার সহযোগিতায় তাদের সরকারি ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয়, যার বিশেষ দায়িত্ব হলো অবাধ্য সেই সন্তানের চরম শাস্তি নিশ্চিত করা।

বিভিন্ন অপরাধে অপরাধীদের পাকড়াও করে কারাগারে নিক্ষেপ করে, শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় রাখা হয়। এভাবে তিন বছর রাখার পর সম্রাটের সাধারণ ক্ষমার সময় ছেড়ে দেয়া হয় এবং তার আগে চিহ্নিত করে রাখার জন্য গালে চিহ্ন এঁকে দেয়া হয়।

বর্তমান গ্রেট খান সকল ধরনের জুয়া-জোচ্চুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যাতে বিশ্বের যেকোনো জায়গার চাইতে এই দেশের লোকেরা সবচেয়ে বেশি আসক্ত। তাদের এ ধরনের চর্চা থেকে বিরত রাখার যুক্তি হিসেবে তিনি : "আমি আমার তরবারির সাহায্যে তোমাদের পদানত করেছি আর ঘটনাক্রমে তোমরা যা কিছুর মালিক তার সব কিছুতেই আমার অধিকার রয়েছে; তাই তোমরা জুয়া-জোচ্চুরি করলে সেটা আমার সম্পত্তি নিয়েই খেলা করার শামিল।" তবু এরপরও তিনি অযৌক্তিকভাবে কারো অধিকার হরণ করেননি।

সব ধরনের লোকেদের মাঝে নিয়ম-নীতি অনুসরণের প্রবণতা দেখা যায়, সম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার পর বিনা অনুমতিতে কেউ সেই স্থান ত্যাগ করে না। সম্রাট আছেন এমন আধ মাইলের ভেতরে কেউ প্রবেশ করার পর নম্র-শান্তভাবে সে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। আর সে সময় কোনো সাড়া-শব্দ

করে না, এমনকি তিনি শুনতে পান এতটা তীব্রভাবে কেউ কথা বলে না। দর্শক সভাকক্ষে উপস্থিত থাকার সময় পদস্থদের সবাই সঙ্গে একটা করে ছোট পাত্র রাখেন, যেটাতে তিনি সেখানে থাকাকালে থুতু ফেলেন, কেউই মেঝেতে থুতু ফেলার সাহস দেখায় না; আর তা যদি ফেলেই, তাহলে তাকে সেই আচ্ছাদন বদলে প্রণাম জানাতে হয়। এদের সবাই সাদা চামড়ার উঁচু পাশওয়ালা সুন্দর জুতা পরে আর দরবারে প্রবেশের আগে তারা সেই সব জুতা খুলে সঙ্গে আসা চাকরের কাছে রেখে আসে। সোনা আর রেশমে বোনা অসম্ভব সুন্দর সব বর্ণিল কার্পেটে যাতে মাটি লাগতে না পারে সে জন্যই এ ধরনের নিয়ম চালু রয়েছে।

৩৫
পুলিসানগান নদীর ওপরকার সেতু আর ক্যাথির ভিতর-দৃশ্য

কানবালু নগর আর ক্যাথি প্রদেশের সরকার ও পুলিশ, সেই সঙ্গে গ্রেট খানের জাঁকজমকের কথা বলা শেষ করে এবার আমারা সম্রাজ্যের অন্য অংশগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। তাতে করে আপনি জানতে পারবেন গ্রেট খান মার্কো পলোকে তার রাষ্ট্রদূত হিসেবে পশ্চিমে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় কানবালু ছেড়ে, পশ্চিম দিকে তাকে দীর্ঘ এক মাস পথ চলতে হয়; যাওয়া-আসার পথে ভ্রমণের সময় তিনি যা যা দেখেছেন এবার আমরা আপনাদের কাছে সেসবের বর্ণনা তুলে ধরছি।

রাজধানী ছেড়ে দশ মাইলের মতো দূরে চলে আসার পর পথে একটা নদী পড়বে, তার নাম পুলিসানগান, এটা সাগরে গিয়ে মিশেছে, আর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পণ্যদ্রব্য বোঝাই অসংখ্য জলযান সেই পথ দিয়ে বাণিজ্য করতে আসে। এই নদীর ওপরে চমৎকার একটি পাথরের পুল রয়েছে, সম্ভবত এর সমকক্ষ বিশ্বের আর কোথাও নেই। এটা লম্বায় তিন শত কদম, আর পাশে আট কদম; তাই কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই ঘোড়ায় চড়া দশজন লোক পাশাপাশি একসঙ্গে এটা পার হতে পারে। এতে পানি থেকে উঠে আসা পঁচিশটা স্তম্ভের ওপরে চব্বিশটা খিলান রয়েছে, যার সবগুলোই অত্যন্ত দক্ষতার মাধ্যমে সর্পিল পাথরের তৈরি।

এর প্রতিপাশে এবং সেই সঙ্গে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, মার্বেল খণ্ডের পাঁচিল রয়েছে আর এই পাঁচিলের পিলারগুলো সুনিপুণভাবে সাজানো। সেতুর ঢালের দিক থেকে এর চূড়া সামান্য প্রশস্ত, কিন্তু ঢাল শেষ হয়ে যাবার পর থেকে এটা একেবারে সমান আর সমান্তরাল। ব্রিজের উপরের ধাপে প্রকাণ্ড একটা থাম উপরে মার্বেলের একটা কচ্ছপে গিয়ে ঠেকেছে আর এর গোড়ার কাছাকাছি বিশাল একটা সিংহ মূর্তি রয়েছে, যার ওপরে আরো একটা সিংহের মূর্তি রাখা। এর প্রায় দেড় কদম দূরে ব্রিজের ঢালের দিকে সিংহ মূর্তিসহ আরো একটা কলাম

রয়েছে; এবং ব্রিজের দৈর্ঘ্যজুড়ে পরপর সমদূরত্বে এ ধরনের পিলার রয়েছে, আর পাশাপাশি পিলারের প্রান্তে ঘাট কেটে জুড়ে দেয়া হয়েছে মার্বেলের স্ল্যাব, অপরূপ সব মূর্তি খোদাই করা মার্বেলের এই খণ্ড দিয়ে ভরাট করে দেয়া হয়েছে পাশাপাশি পিলারের মাঝের জায়গাগুলো। এই পাঁচিল পথচারীদের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে।

৩৬
গৌজা নগর

এই সেতু পেরিয়ে, দালান, আঙুর বাগান, ক্ষেতখামার আর উর্বর জমি পেরিয়ে পশ্চিম দিকে আরো ত্রিশ মাইলের মতো অগ্রসর হলে আপনি বিশাল একটা সুদৃশ্য শহরে এসে হাজির হবেন, এর নাম গৌজা [চো-চু], সেখানে পৌত্তলিকদের অনেক সঙ্ঘ রয়েছে। এর অধিবাসীরা সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য আর হাতের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এরা স্বর্ণ আর গৌজি নামের উন্নত ধরনের কাপড় প্রস্তুত করে। এখানে পর্যটকদের থাকার জন্য অসংখ্য পান্থশালা রয়েছে। এখান থেকে মাইল খানেক দূরে পথ দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে; এর একটা পশ্চিমে এবং অন্যটা দক্ষিণ দিকে গেছে, পশ্চিমের সড়কটা ক্যাথি প্রদেশ হয়ে এসেছে, আর অন্যটা এসেছে মানজি প্রদেশ হয়ে। গৌজা হয়ে ক্যাথির ওপর দিয়ে টাইনফু রাজ্য দশ দিনের পথ; সেই পথে অনেক শহর, দুর্গনগর রয়েছে, সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযোগী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পণ্য উৎপাদিত হয়, আর সেখানে অনেক আঙুর আর চাষের জমিও আপনার নজরে আসবে। এখানকার আঙুর ক্যাথির ঘরে ঘরে পরিবেশিত হয়, কারণ সেখানে আঙুর জন্মে না। এখানে প্রচুর তুঁত গাছও জন্মে, যার পাতা হতে এখানকার অধিবাসীরা অঢেল রেশম উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এখানকার বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে ঠাসা ঘনবসতিগুলো কোথাও কোথাও শহরের সঙ্গে মিশে গেছে। বণিকেরা সেখানে সারা বছর ধরে অবস্থান করে, এক শহর হতে অন্য শহরে মালামাল বয়ে নিয়ে যায়, যেন এর সব জায়গাতেই কেনাকাটার মেলা বসেছে।

৩৭
টাইফু রাজ্য

একটু আগে যা বলা হলো, পাঁচ দিন চলার পর আবারও সেই দশ দিনের ভ্রমণ শেষে, আরো একটা প্রকাণ্ড আর সুদৃশ্য নগর রয়েছে, এর নাম আচ-বালুচ, এর প্রান্ত পর্যন্ত সম্রাটের শিকারের ভূমি বিস্তৃত, যার ভেতরে কেবল তাঁর আপন পুত্র

আর বাজ-তালিকাভুক্তদের ছাড়া অন্য কারো শিকারের বিধান নেই। এই সীমানার বাইরে পদস্থদের সবাই স্বাধীনভাবে শিকারের অধিকার রাখে।

বেশ কয়েকবার গ্রেট খান শিকার করতে এখানে এসেছিলেন। এখানকার বুনো জানোয়ার বিশেষ করে খরগোশের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে তখন তারা এখানকার সব ভুট্টা ক্ষেত একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। সম্রাটের কানে এ কথা পৌঁছার পর তিনি দলবল নিয়ে এখানে এসে প্রচুর শিকার নিয়ে ফিরে যান।

এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পন্ন হয়। এবং সুবিধাজনক অবস্থানে অবস্থিত হওয়াতে, এখানকার প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরনের পণ্য, বিশেষ করে অস্ত্রসহ অন্যান্য সামরিক উপকরণ সম্রাটের সেনাবাহিনীর কাজে ব্যবহার করা হয়। এখানকার আঙুর বাগানগুলোতেও প্রচুর আঙুর ফলে। অন্যান্য ফলফলাদিও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সেই সঙ্গে জন্মে তুঁত গাছ, যার ফলে রেশম পতঙ্গ থেকে রেশমও উৎপাদিত হয়।

টাইফু ছেড়ে, আরো পশ্চিমে সাত দিনে পথ গেলে, চমৎকার এক দেশের দেখা মিলে, যেখানে অনেক শহর আর দুর্গনগর রয়েছে, সেখানকার প্রস্তুতকারক আর ব্যবসায়ীরা খুবই সফল, আর যথেষ্ট লাভের আশায় সেখানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বণিক, পর্যটকদের সমাগম হয়। এই শহরের নাম পেইনফু, এটা খুবই বড় আর গুরুত্বপূর্ণ একটা শহর। আগের মতোই এখানেও অসংখ্য ব্যবসায়ী আর কারিগর রয়েছে। এখানেও প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হয়। জায়গাটি নিয়ে এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করছি না, তবে কিছুটা পশ্চিমের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত কাচাংফুজ শহর আর সেখানকার থাইগিন প্রাসাদ নিয়ে কিছু না বললেই নয়।

৩৮
থাইগিন প্রাসাদ

পেইনফু থেকে পশ্চিমে থাইগিন নামের বিশাল একটা দৃষ্টিনন্দন দুর্গ রয়েছে, লোকে বলে এটা অনেক আগে স্বর্ণরাজা নামের এক রাজা নির্মাণ করেছিলেন। এই দুর্গের প্রাচীর খুবই চওড়া, আর জায়গাটা খুবই দৃষ্টিনন্দন, যার সভাকক্ষের দেয়ালগুলো তখনকার বিখ্যাত সব রাজাদের চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো, প্রাচীনকালে যেসব রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন, তারা এখানে জাঁকজমকপূর্ণ একটা প্রদর্শনী গড়ে তুলেছিলেন।

ইতিহাসের বিশেষ ঘটনার জন্য এই রাজার কথা আজ লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন খুবই ক্ষমতাধর একজন রাজপুত্র, আর সব সময়ই তিনি নারীর অসম্ভব সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তার প্রাসাদে এ ধরনের

অসংখ্য নারীদের দ্বারা তিনি আপ্যায়িত হতেন। বিশ্রামের দরকার হলে তিনি সেই প্রাসাদে যেতেন, কুমারীরা তখন এগিয়ে এসে তাকে বাহন থেকে নামাতেন, সেটা ছোট হওয়াতে তারা খুব সহজেই কাজটা করতে পারত। এরা নিজেদের কাজের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল আর তাকে আনন্দ দিতে পারে এমন সব ধরনের কাজ করত। তার সরকারের ভেতরে তিনি সমকক্ষ বলিষ্ঠ কাউকে কামনা করতেন না, আর তিনি মর্যাদা এবং ন্যায়ের সঙ্গে দেশ শাসন করতেন।

এখনকার জনগণের মতে, এই প্রাসাদটির অবস্থান ছিল খুবই দুর্ভেদ্য এবং শক্তিশালী। তারপরও তিনি প্রেস্টার জনের অনুগত ছিলেন; কিন্তু আত্মাভিমানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আর প্রেস্টার জন তা জানতে পেরে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, কেননা দুর্ভেদ্যতার কারণে তার পক্ষে সেটা আক্রমণ করা অসম্ভব ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। পরে থাকে রাজার উচ্চপদস্থদের সতের জন অশ্বারোহী বীর তার সামনে উপস্থিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং স্বর্ণরাজাকে পদানত করে তার সামনে জীবিত হাজির করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এদের সবাইকেই বড় ধরনের একটি করে পুরস্কৃতিশ্রুতির বিনিময়ে এ ধরনের কাজে রাজি করানো হয়।

কথামতো তারা সেখান থেকে এসে রাজার সঙ্গে দেখা করে আর বলে তারা দূর দেশ থেকে রাজার সেবায় বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। পরে তারা এতটা পরিশ্রম আর সক্ষমতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে যে খুব শীঘ্র সবাই তাদের নতুন প্রভুর প্রচণ্ড অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হন।

এক দিন রাজা শিকারের পিছু ধাওয়া করে নদী পেরিয়ে অন্য পারে চলে যান। এতে তিনি তার দলের অন্যদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বাকিরা তখন অপর পারে অবস্থান করছিল। তখন সেই অশ্বারোহীরা তাদের পরিকল্পনা কাজে লাগাবার সুযোগ পান। তরবারি বের করে তারা রাজাকে ঘিরে ধরেন এবং জোর করে তাকে প্রেস্টার জনের এলাকাতে নিয়ে যান। এই অবস্থায় তার পক্ষে সেখানকার জনগণের সাহায্য নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

৩৯
কয়েদি স্বর্ণরাজার প্রতি প্রেস্টার জনের আচরণ

তারা প্রেস্টার জনের দরবারে পৌঁছাবার পর, তিনি তার কয়েদিকে বিশ্রী পোশাক পরাবার নির্দেশ দেন এবং চূড়ান্ত অবমাননার জন্য, তাকে গবাদিপশু দেখাশোনার কাজ করবার আদেশ প্রদান করেন।

এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতে তাকে টানা দু'বছর কাটিয়ে দিতে হয়। অব্যাহত নজরদারির কারণে সে সময় তার পক্ষে পালিয়ে আসা সম্ভব হয় না। এই সময় অতিবাহিত হবার পর প্রেস্টার জন আবারও তাকে তার সামনে হাজির

করেন। সে সময় তার আচরণ দেখে মনে হয় তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। কিন্তু সেটা না করে তার যাবতীয় দুর্ভোগ আর ঔদ্ধত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে ক্ষমা করেন এবং আবারও তাকে রাজকীয় বেশে সাজাবার নির্দেশ দেন এবং সম্মানজনক প্রতিরক্ষা-সহচরের পাহারা সমেত তাকে তার এলাকায় পৌঁছে দেয়া হয়। এরপর থেকে সব সময়ই তিনি প্রেস্টার জনের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। এই কাহিনিই আমাকে স্বর্ণরাজার প্রতি আকৃষ্ট করে।

৪০

কারা-মোরান নামের বিরাট মহানদী

থাইগিন দুর্গ ছেড়ে বিশ মাইলের মতো দূরে আসার পর, পথে একটা নদী পড়ে, যার নাম কারা-মোরান [হলদে নদী], যা প্রস্থ আর গভীরতা এই উভয় দিক দিয়েই খুবই প্রসারিত। আর তাই এর উপর দিয়ে স্থায়ী কোনো সেতু গড়ে ওঠেনি। এর জলধারা সাগরে গিয়ে মিশেছে। এর অববাহিকাতে অনেক শহর আর প্রাসাদ গড়ে উঠেছে, যেখানে অসংখ্য বণিকের বাস, যারা প্রচুর পরিমাণে পণ্য লেনদেনের সঙ্গে জড়িত। এখানকার সীমান্তবর্তী দেশে আদা উৎপাদিত হয়, সেই সঙ্গে প্রচুর রেশমও।

এখানে প্রচুর সংখ্যায় বড় আকারের পাখি পাওয়া যায়, বিশেষ করে লেজওয়ালা রঙিন পাখি, এগুলো ভেনিসিয়ান ছাগলের তিনগুণ দামে বিক্রি হয়। একইভাবে একধরনে লম্বা আকৃতির বেত প্রচুর জন্মে, যার দৈর্ঘ্য বিশাল, এখানকার অধিবাসীরা এসব দিয়ে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করে।

নদী পার হয়ে তিন দিনের পথ গেলে একটা শহর পড়বে, তার নাম কা-চেন-ফু, যার অধিবাসীদের সবাই পৌত্তলিক। এদের বেশিরভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের আর নানা ধরনের পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। এখানে প্রচুর পরিমাণে আদা, রেশম এবং অনেক ওষুধ উৎপন্ন হয়, যার বেশিরভাগ সম্বন্ধে বাকি বিশ্বের কোনো ধারণাই নেই। এখানকার লোকেরা স্বর্ণের কাপড়সহ সব ধরনের রেশমের কাপড় বোনে। এবার আমরা মহান এবং বিখ্যাত শহর কেন-জেন-ফু-এর কথা বলব, এই রাজ্যেরও এই একই নাম।

৪১

কেন-জেন-ফু নগর

কা-চেন-ফু ছেড়ে এসে পশ্চিমে টানা আট দিন পথ চলার পর, একের পর এক শহর আর বাণিজ্যিক নগরের দেখা মিলে, সেই পথে অনেক বাগান আর আবাদি

জমি দেখতে পাওয়া যায়, যার সু-প্রচুর তুঁত গাছ সেখানকার রেশম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এখানকার বেশিরভাগ লোক মূর্তি পূজা করলেও, নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান, তুর্কি আর সারাসিনদেরও দেখা মিলবে।

শিকারের জন্য এখানে প্রচুর বুনো জানোয়ারের সন্ধান মিলে, সেই সঙ্গে নানা জাতের পাখিও ধরা সম্ভব।

আট দিনের ভ্রমণ শেষে আপনি কেন-জেন-ফু নগরে এসে পৌঁছবেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এটা মস্ত একটা নগর, বিখ্যাত এই নগরে অনেক রাজত্বের পত্তন ঘটেছে, সেই সব রাজত্বের মসনদে অনেক রাজা-বাদশা আরোহণ করেছেন, ক্ষমতা আর অস্ত্রের জোরে যাদের সবাই খুবই বলীয়ান ছিলেন। বর্তমানে এটা গ্রেট খানের পুত্র মাংগালু কর্তৃক শাসিত, যার উপর তার পিতা এর সার্বভৌমত্বের দায়ভার অর্পণ করেছেন।

উৎপাদিত পণ্যের জন্য এটা বাণিজ্য উপযোগী একটা এলাকা। এখানে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম উৎপাদিত হয় এবং স্বর্ণের কাপড় আর সব ধরনের রেশম বস্ত্র এখানে বয়ন হয়। এখানকার লোকেরাও সেনাবাহিনীর ব্যবহার উপযোগী সব ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করে। এখান থেকে সহনীয় দামে মজুদ উপযোগী রসদ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভব। এখানকার লোকেরাও পৌত্তলিক, তবে বেশ কিছু খ্রিস্টান, তুর্কি এবং সারাসিনেরও দেখা পাওয়া যায়।

শহর থেকে পাঁচ মাইল অদূরে সমতলের ওপর মাংগালু খানের এক জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ রয়েছে, এর চারপাশ দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঝরনা আর ছোট নদীর ধারা, এর ভেতরকার রক্ষী ছাউনিসহ উঁচু প্রাচীর ঘেরা পাঁচ মাইলের মতো জায়গা জুড়ে রয়েছে বিস্তৃত মনোরম উদ্যান, সেখানে শিকারের জন্য বুনো পশু-পাখি উভয় ধরনের জন্তু রাখা আছে। এরই ঠিক মাঝখানে রয়েছে সেই সুরম্য প্রাসাদ, প্রতিসাম্যতা আর সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যা সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। এর ভেতরে স্বর্ণ আর নীলিমা খচিত দেয়ালজুড়ে চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো শ্বেতপাথরের অসংখ্য সভাকক্ষ আর শয়নকক্ষ রয়েছে। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাংগালুও খুব শক্ত হাতে তার রাজ্য শাসন করেন এবং সমানভাবে তিনি তার জনগণকেও ভালোবাসেন। তিনিও বাজবাজি আর শিকার উপভোগ করতে পছন্দ করেন।

৪২

ক্যাথি আর মানজির সীমানা

মাংগালুর আবাসস্থল হতে পশ্চিম দিকে টানা তিন দিনের পথ যাবার সময় অনেক শহর আর দালান চোখে পড়বে, এদের অধিবাসীরা ব্যবসা আর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, আর এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হয়।

তিন দিনের এই যাত্রা শেষ হলে আপনি পাহাড় আর উপত্যকা ঘেরা একটা জায়গাতে এসে পৌঁছবেন, সেটা কুন-কিন প্রদেশের ভেতরে অবস্থিত।

এখানকার লোকেদের সবাই পৌত্তলিক আর কৃষিজীবী। তবে ভূমির বেশিরভাগ অংশ গাছগাছালিতে আবৃত থাকায় তারা শিকারও করে। এখানে বহু ধরনের বুনো জন্তু-জানোয়ারের সন্ধান মিলবে। যেমন—বাঘ, ভালুক, বনবিড়াল, বামন হরিণ, বুনো শূকর, এন্টিলোপ বা কৃষ্ণসার মৃগ এবং অন্যান্য আরো অনেক পশু এখানে প্রচুর সংখ্যক রয়েছে। এই অঞ্চল টানা বারো দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত, আর সেই দীর্ঘ পথের প্রায় পুরোটাই বন-বনানী, পাহাড় আর উপত্যকাতে ভরপুর। তবে পথে ছোট ছোট অনেক শহরও দেখতে পাওয়া যাবে, যেখানে পর্যটকেরা নিজেদের থাকার জন্য মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই খুঁজে নিতে পারবেন।

৪৩
মানজি প্রদেশের কথা

পশ্চিম দিকে টানা বিশ দিনের এই ভ্রমণ শেষে, আপনি আচ-বালুচ মানজি নামের একটা জায়গাতে এসে হাজির হবেন, সবার কাছে যা ধবল নগর হিসেবে পরিচিত। এই ধবল নগর মানজি এলাকাতে অবস্থিত, এখানকার ভূমি সমতল আর খুবই জনাকীর্ণ। এখানকার লোকেরা ব্যবসা আর হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে আদা উৎপন্ন হয়, অধিক লাভের আশায় বণিকেরা তা ক্যাথির সব প্রদেশে নিয়ে যায়। এখানে ধান, গমসহ অন্যান্য শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, তাই সহনীয় দামে পাওয়া সম্ভব হয়।

এখানকার সমতল গাছগাছালিতে ছাওয়া, তবে পাহাড় থেকে নেমে আসার পর দুটি পর্যায় নজরে আসবে, এর একটি উপত্যকা আর অন্যটি বন। আরো পশ্চিমে বারো দিন অগ্রসর হতে থাকলে সেই পথজুড়ে জনবসতিপূর্ণ লোকালয় নজরে আসবে, যার অধিবাসীরা পৌত্তলিক আর কৃষিজীবী, একইসঙ্গে এরা শিকারেও অভ্যস্ত। এখানেও প্রচুর বুনো জানোয়ারের আবাস, সেই সঙ্গে অসংখ্য কস্তুরীমৃগের বাস।

৪৪
সিন-ডিন-ফু প্রদেশ আর প্রকাণ্ড নদী কিয়াং

সেই পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে বারো দিনের পথ পেরিয়ে আসার পর, আপনি মানজির প্রান্তে এক সমতলে এসে উপস্থিত হবেন, সেই জলার নাম সিন-ডিন-ফু, এখানকার রাজধানীরও এই একই নাম। আগে এখানে অনেক ক্ষমতাধর রাজা

রাজত্ব করে গেছেন। এই শহরের সীমানা বিশ মাইলজুড়ে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এখানকার প্রাক্তন রাজার তিন ছেলে ছিল; তিনি আশা করেছিলেন তার মৃত্যুর পর এই তিন পুত্রের প্রত্যেকেই আলাদাভাবে রাজত্ব করবে। আর তাই তিনি শহরটিকে প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে সমান তিন ভাগ করে দেন, যদিও এর পুরোটা একটা মাত্র সীমানা দিয়ে ঘেরা।

একপর্যায়ে সেই ভাইদের সবাই রাজা বনে যান এবং দেশের নিজ নিজ অংশে রাজত্ব করতে থাকেন, তাদের বাবার রেখে যাওয়া সেই এলাকা ছিল খুবই বিস্তৃত আর প্রাচুর্যে ভরপুর। কিন্তু গ্রেট খানের আগ্রাসনের সময় তিনি সেই তিন রাজাকেও পদানত করেন এবং তাদের উত্তরাধিকারের দায়ভার নিজের করে নেন।

দূরবর্তী পাহাড়গুলো থেকে বয়ে যাওয়া ঝরনাধারা দ্বারা শহরটি উপযুক্তভাবে বিধৌত, আর তা একে বিভিন্ন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এর কোনো কোনো নদী আধ মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত, অন্যগুলো শত কদম সমান আর এগুলো অত্যন্ত গভীর। এই নদীগুলোর ওপর দিয়ে শহরের দিকে বিশাল একটা সেতু রয়েছে। এই সেতুর প্রতিপাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর মার্বেলের এক সারি করে পিলার রয়েছে, যা সেই সেতুর কাঠের ছাদের ভার বহন করেছে। কাঠের সেই ছাদ লাল রঙে রাঙিয়ে ওপরের দিকে টাইলসে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। যার পুরোটাজুড়ে রয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কামরা আর দোকানপাট। এখানে সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। এর একটা দালান অন্য সবগুলোর থেকে বড়, এখান থেকে অফিসারেরা কর সংগ্রহ ও সেতু পার হওয়া লোকেদের কাছ থেকে টোল আদায় করেন। জানা যায়, এই ব্রিজ থেকে প্রতিদিন সম্রাট শত বিজান্ট স্বর্ণ পেয়ে থাকেন।

এই নদীগুলো শহরকে বিধৌত করে বিশাল এক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যার নাম কিয়াং [ইয়াং-জু-কিয়াং], সাগরে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত এটা ভাটির দিকে আরো শত দিনের পথ অতিক্রম করেছে।

এই নদীর অববাহিকা আর এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলজুড়ে আরো অসংখ্য শহর, নগর, আর দুর্গ গড়ে উঠেছে এবং এর অসংখ্য শাখা-প্রশাখার জলপথ ধরে বণিকেরা এই শহর থেকে প্রচুর পণ্যদ্রব্য আনা-নেয়া করে। এই প্রদেশের লোকেরা পৌত্তলিক। এখান থেকে সমতল আর উপত্যকার পথ বেয়ে টানা পাঁচ দিনের পথ চলার সময় অসংখ্য সুদৃশ্য দালান, প্রাসাদ, আর ছোট ছোট শহর দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা কৃষিজীবী। এখানকার শহরে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদিত হয়, বিশেষ করে সূক্ষ্ম বস্ত্র আর খোলসের তৈরি জিনিসপত্রের জন্য এই স্থান খুবই প্রসিদ্ধ। আগের জেলার মতো এই দেশেও সিংহ, ভালুকসহ অন্যান্য বুনো জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। এই পাঁচ দিনের ভ্রমণ শেষে আপনি তিব্বত নামের জনমানবশূন্য এক দেশে এসে উপস্থিত হবেন।

৪৫
থিবেথ (তিব্বত) প্রদেশ

মাংগু খান সেই দেশে যুদ্ধ শুরু করার সময়কাল থেকেই সেখানকার পশ্চিমের একটি প্রদেশের নাম ছিল থিবেথ। এর ওপর দিয়ে বিশ দিনের পথ অতিক্রম করার সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত অসংখ্য শহর আর প্রাসাদ নজরে আসে; এবং ঘটনাক্রমে অধিবাসীদের অভাবে, জায়গাটাতে বুনো জন্তু, বিশেষ করে বাঘের সংখ্যা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পর্যটকদের রাতের বেলা সেখানে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হতে হয়।

এখানে তাদের কেবল প্রয়োজনীয় রসদ বহন করলেই হবে না, সেই সঙ্গে পৌঁছাবার পর থেকে থামার জায়গাতে প্রচণ্ড সতর্ক অবস্থায় থাকতে হয়। আর তাদের ঘোড়াগুলো যাতে মারা না পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এখানে বিশেষ করে আশপাশের নদীগুলোর কাছাকাছি এলাকাতে দশ কদমের ওপরে দীর্ঘ একধরনের বাঁশ পাওয়া যায়, এগুলো তিন তালুর সমান গোলাকার এবং গাঁট বা সন্ধিগুলোও তিন তালু পরপর হয়ে থাকে। কাঁচা অবস্থায় পর্যটকেরা এগুলোর কয়েকটা একসঙ্গে বেঁধে রাত নামার আগে প্রবেশ পথে স্থাপন করে, এর কিছুটা দূরে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। তাপে সেই কাঁচা বাঁশের গাঁটগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। এতে এত বেশি শব্দ সৃষ্টি হয় যে তা দু'মাইল দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যায় এবং বুনো জন্তুদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তাদের আশপাশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

শব্দে শুনে সতর্ক হবার পর দড়ি ছিঁড়ে যাতে পালাতে না পারে সে জন্য ঘোড়াগুলোর পা বেঁধে রাখাতে ব্যবসায়ীরা এ সময় লোহার বেড়িও সঙ্গে রাখেন। এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখার কারণে ইতোমধ্যে অনেক মালিককে তাদের ঘোড়া খোয়াতে হয়েছে। এখান থেকে টানা বিশ দিনের পথ অগ্রসর হবার সময় জনমানবশূন্য এক দেশ দেখতে পাবেন, সেখানে তিন-চার দিনের আগে কোনো রসদ বা সরাইখানার সন্ধান মিলবে না, আর এ ধরনের কোনো সুযোগ মিলবার পর আপনাকে যতটা সম্ভব দরকারি জিনিসপত্র মজুদ করে সঙ্গে নিতে হবে। এই সময় অতিবাহিত হবার পর আপনি কয়েকটা পার্বত্য চূড়ায় অথবা পাহাড়ের ওপরে বেশ কয়েকটা প্রাসাদ আর দুর্গনগর আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন, আর ধীরে ধীরে জনবহুল ও উর্বর জেলাতে প্রবেশ করবেন, যেখানে শিকারি পশুর কোনো ভয় থাকবে না।

পৌত্তলিকতার অন্ধত্বের কারণে এই অংশের জনগণের মাঝে আজব সব রীতি বিরাজ করছে। এখানকার লোকেরা কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। বিয়ের আগে তাদের আরো অনেকের কাছে বিক্রীত হতে হয়। তাদের দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্যই তারা এমনটা করে থাকে এবং তাদের বিশ্বাস যেসব নারী অন্য লোকেদের সঙ্গ দেয়নি তাদের আদতেই কোনো মূল্য নেই।

একইভাবে, ব্যবসায়ীদের কাফেলা এসে পৌঁছার পর, সঙ্গে সঙ্গে তারা রাতে থাকার জন্য তাদের তাঁবু প্রস্তুত করার পর, সেখানকার যেসব মায়েদের ঘরে বিবাহযোগ্যা কন্যা রয়েছে তারা সেখানে এসে তাদের সঙ্গে সাহায্য-সযোগিতা করে এবং সেই অপরিচিতদের তাদের মেয়েদের গ্রহণ করে সেখানে অবস্থানকালে প্রতিবেশী হিসেবে তাদের সামাজিকতা উপভোগ করার অনুরোধ জানায়। তখন তারা তাদের জন্য অধিক সুন্দরীদের বেছে নেন, আর অন্যদের হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়। সেখান থেকে চলে যাবার আগপর্যন্ত বাছাই করা এই মেয়েরা তাদের সঙ্গেই অবস্থান করে। এরপর তাদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং কখনো সঙ্গে নেবার কথা ভাবা হয় না। আশা করা হয় এর বিনিময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের তুচ্ছ সব অলঙ্কার, কানের দুল বা এ ধরনের অন্যান্য সব উপহার দিবেন, যা সেই যুবতী মেয়েরা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

গলা আর দেহের অন্য সব অঙ্গে তারা এইসব গহনা পরে থাকে, আর যে শরীরে সবচেয়ে বেশি গহনা পরতে পারে সে অধিকসংখ্যক পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম বলে ধারণা করা হয় আর যেসব যুবকেরা বিয়ের জন্য পাত্রীর* সন্ধান করছে তারা যাতে এসব দেখে তার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারে। বিয়ের সময়, বধূ আগের মতোই সবার সামনে নিজেকে প্রদর্শন করে, আর এতে করে তার স্বামী নিশ্চিত হতে পারে যে তাদের দেবতা তাকে পুরুষদের চোখে অনিন্দ্য সুন্দরী করে তুলেছে। এরপর থেকে অন্যের বউ হবার কারণে তাদের কেউই আর তাকে কামনা করতে পারে না, আর এই রীতি কখনো লঙ্ঘন করা হয় না।

এইসব পৌত্তলিকেরা খুবই ধূর্ত আর নিষ্ঠুর, আর এখানে চুরি-ডাকাতি কোনো অপরাধ নয়, এরা বিশ্বের সবচেয়ে বড় লুটেরা জাতি। এরা পশু আর পাখি শিকারে সিদ্ধহস্ত, সেই সঙ্গে বনজঙ্গল থেকে ফলফলাদিও সংগ্রহ করে খায়। এখানে কস্তুরিমৃগের সন্ধান পাওয়া যায়, আর এখান থেকে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যায়। প্রতি মাসে একবার করে কস্তুরী নিঃসৃত হয় এবং তখন, আগেকার বর্ণনামতো তা সেইসব মৃগের নাভিদেশের থলেসহকারে বা উষ্ণরক্তসহ সংগ্রহ করা হয়। এখানকার সর্বত্র এই মৃগ প্রচুর রয়েছে এবং তাদের ঘ্রাণ এখানে সচরাচর পাওয়া যায়।** স্থানীয়দের ভাষায় এদের গুদ্দেরি নামে ডাকা হয় এবং কুকুর লেলিয়ে ধরা হয়।

---

* এভাবে বিয়ের কনের সৌন্দর্য প্রমাণে তাকে নিষ্পাপ করে তুলতে এখনো জাপানসহ বিশ্বের আরো অনেক অসভ্য জাতির লোকেরা এমনটা করে থাকে, যা ওয়েস্টারমার্ক-এর হিস্ট্রি অব হিউম্যান ম্যারেজ বইতে উল্লেখ রয়েছে।

** সম্প্রতি প্যারিসের সুগন্ধি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এই-দ্রব্য কেনার জন্য ইয়াংতেজ-এ তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। ১৯০২ সালে তিব্বত থেকে কস্তুরী আমদানি করা হয়, যার ওজন ছিল এক রৌপ্য মিলিক আউন্স। এনসাইক্লোপিডিয়া সিনিকা দেখুন।

এখানকার লোকেরা মুদ্রার ব্যবহার করে না, এমনকি গ্রেট খানের কাগজের মুদ্রাও, তবে অর্থ হিসেবে এরা লবণ ব্যবহার করে। এরা চামড়া বা লোমসহ পশুর ছাল বা ক্যানভাস দিয়ে পোশাক তৈরি করে। এদিক দিয়ে এরা খুবই ঘরোয়া প্রকৃতির। মানজি প্রদেশের সীমানার ওপারের থিবেথ-এর লোকেরা আজব একধরনের ভাষায় কথা বলে।

৪৬
থিবেথ নিয়ে আরো কিছু কথা

থিবেথ আগে আটটি রাজ্যে বিভক্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রাষ্ট্র ছিল, তখন এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ নির্মিত হয়। জায়গাটা অসংখ্য হ্রদ, নদী আর পাহাড়ে ঘেরা। এখনকার নদীতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ-কণা পাওয়া যায়। এর কোরালেরও চাহিদা ব্যাপক, মহিলারা এগুলো গহনা হিসেবে ব্যবহার করে, তাছাড়া দেব-দেবীকে সাজাতে এ ধরনের গহনা কাজে লাগে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে উটের লোমে তৈরি কাপড় এবং স্বর্ণবস্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও নানা ধরনের ওষুধ তৈরি হয়, যা আমাদের ওখানে পাওয়া যায় না।

এখানকার লোকেদের মাঝে এমন অনেক জাদুকর খুঁজে পাওয়া যায়, যারা তাদের সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে এমন সব অবাক করা কাজ করতে পারে যা আগে কখনো করা যায়নি। এরা বজ্রঝড়ের মতো দুর্যোগসহ প্রাকৃতিক আরো অনেক বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

সমষ্টিগতভাবে এরা কুপ্রভাবযুক্ত জাতি। এদের গাধার সমান একধরনের কুকুর রয়েছে, যা বিশেষ করে বুনো ষাঁড়সহ সব ধরনের শিকারে পারদর্শী, এগুলো আকারে যেমন বড় তেমনি দুর্ধর্ষও। বেশ কয়েক ধরনের লেনর বাজ এখানে বংশ বৃদ্ধি করে, সেই সঙ্গে দ্রুতগামী লড়াকু সুইফটও পাওয়া যায়, আর স্থানীয়েরা এদের শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে।

৪৭
কাইন-ডু প্রদেশ

কাইন-ডু পশ্চিমের একটা প্রদেশ, জায়গাটা আগে স্থানীয় রাজার অধীন ছিল; কিন্তু গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হবার পর থেকে তার নিযুক্ত গভর্নরের দ্বারা এটা শাসিত হচ্ছে। তারপরও, আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি জায়গাটা আদৌ এশিয়ার পশ্চিম অংশে অবস্থিত কি না, তবে আমরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসায় সেদিক থেকে তুলনা করলে এটুকুই কেবল বুঝে নেয়া সম্ভব যে এর অবস্থান পশ্চিমে। এখানে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে এবং প্রদেশের শুরুতেই এর

রাজধানী অবস্থিত, প্রদেশের মতোই যার নাম কাইন-ডু। রাজধানীর কাছাকাছি একটা লবণ জলের হ্রদ রয়েছে, এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ধবল মুক্তা আহরিত হয়, তবে এর আকৃতি পুরোপুরি গোলাকার নয়। এর পরিমাণ এতই বেশি যে সম্রাট যদি এখানকার সবাইকে তা আহরণের অনুমতি দেন তাহলে এর মূল্য একেবারেই পড়ে যাবে; অনুমতি ছাড়া এখান থেকে মাছ মারা নিষেধ।

কাছেই একটা পাহাড়ে বৈদূর্যমণি পাওয়া যায়, সেখানকার খনি থেকেও অনুমতি ব্যতিরেকে এসব আহরণ নিষেধ।

এখানকার অধিবাসীরা আচার-আচরণে বেহায়া, নির্লজ্জ আর ঘৃণ্য প্রকৃতির, পর্যটকদের সঙ্গে তাদের বউ, কন্যা আর বোনের সম্পর্কে এরা খুব একটা বিচলিত বোধ করে না, বরং অপরিচিত কাউকে দেখার পর বাড়ির কর্তারা সেধে এসে তাকে সেখানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকে। আর নিয়ে যাবার পর তাকে নারীদের কর্তা হিসেবে রেখে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও সরে পড়ে। অপরিচিত সেই লোক ঘরে থাকার সময় জানালায় হ্যাট বা অন্য কিছু দিয়ে একটা সংকেত তৈরি করে; তাতে করে যতক্ষণ এ ধরনের কোনো সংকেত দেখতে পাওয়া যায় ততক্ষণ সেই গৃহস্বামী আর বাড়ি ফিরে না। এ ধরনের রীতি এখানকার প্রদেশজুড়ে বিরাজ করছে। দেবতার সন্তুষ্টির জন্যই তারা এমনটা করে থাকে, তাদের বিশ্বাস এমন দয়ালু কাজ আর আতিথিয়েতার জন্য জমিতে প্রচুর ফলমূল সরবরাহের মাধ্যমে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

এখানকার লোকেরা নিজেদের তৈরি মুদ্রায় লেনদেন করে। এর জন্য প্রথমেই স্বর্ণ দিয়ে ছোট দণ্ড তৈরি করা হয়, তারপর ওজন অনুসারে কোনো ধরনের সিল ছাড়াই সেসব কেনাকাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। এটাই তাদের সর্বোচ্চ মুদ্রা। আর সর্বনিম্ন মুদ্রার চেহারা এ রকম; এই দেশে অনেক লবণ-ঝরনা রয়েছে, সেখানকার জল সংগ্রহ করে ছোট ছোট তাওয়াতে নিয়ে সেদ্ধ করে লবণ উৎপন্ন করা হয়। এই জল ঘণ্টাখানেক ধরে সেদ্ধ করার পর, সেটা থেকে একধরনের লেই পাওয়া যায়, তা থেকে দুই পেনি ওজনের ছোট ছোট কেক তৈরি করা হয়, যার নিচের দিক সমান আর উপরের দিক উত্তল। এগুলোকে শুকিয়ে আরো শক্ত করবার জন্য আগুনের কাছে তপ্ত টাইলসের উপর রাখা হয়। পরে এর ওপর গ্রেট খানের মুদ্রার বিশেষ একটা সিল মারা হয়, যা তার অফিসারদের ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। এ ধরনের আশি লবণ মুদ্রার বিনিময়ে এক স্যাগিও স্বর্ণ পাওয়া যায়। কিন্তু শহর থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার অধিবাসীরাসহ কিছু কিছু এলাকার স্থানীয় অসভ্য লোকেরা সেখানকার রীতি অনুসারে আনুপাতিক হারে এ ধরনের ষাট, পঞ্চাশ, এমনকি চল্লিশ লবণ মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের এক স্যাগিও স্বর্ণ দেয়।

এই একই ব্যবসায়ীরা একটু আগে যেভাবে বর্ণনা করা হলো সেভাবে থিবেথ-এর পার্বত্য অঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাগুলোতে চষে বেড়ায়, সেখানকার

সব জায়গাতে এই লবণ মুদ্রার মান সমান। এখানকার লোকেরা একে অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করে খাবারের সঙ্গে ব্যবহার করে বলে তারা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করতে পারে; অন্যদিকে শহরের লোকেরা খাবারের সঙ্গে শুধুমাত্র গুঁড়া লবণ ব্যবহার করে আর কেবল বিনিময়ের মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্য লবণের এ ধরনের আস্ত কেকগুলো তুলে রাখে।

কস্তুরী পাওয়া যায় এমন হরিণ এখানে প্রচুর সংখ্যায় ধরা পড়ে এবং আনুপাতিক হারে এর উপকরণও এখানে অঢেল আহরিত হয়। এখানকার হ্রদ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ আহরিত হয়। এখানে বাঘ, ভালুক, হরিণ, শূকর এবং এন্টিলোপ দেখতে পাওয়া যায়। এটা বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য পাখিরও আবাসস্থল। এখানে আঙুরের বদলে গম আর ভাতের সঙ্গে মসলা মিশিয়ে ওয়াইন প্রস্তুত করা হয়, যা খুবই চমৎকার একটা পানীয়।

এই প্রদেশে লবঙ্গ চাষ হয়। এর গাছগুলো ছোট : শাখা-প্রশাখা আর পাতা দেখতে অনেকটা জলপাই গাছের মতো হলেও কিছুটা সরু আর দীর্ঘ। সাধারণ লবঙ্গের মতোই এর ফুল সাদা আর ছোট, তবে পাকার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় বর্ণ ধারণ করে। আদা আর ক্যাসিয়াও এখানে প্রচুর পরিমাণে ফলে, এ ছাড়াও এখানে আরো অনেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়, যার কোনোটাই অতি সামান্য পরিমাণেও ইউরোপের বাজারগুলোতে পৌঁছে না।

কাইন-ডু শহর ছেড়ে প্রদেশের অপর পাশের সীমান্তে যেতে দশ দিনের মতো সময় লাগে; এই সময় অনেক লোকজন, দুর্গ, আর পশু আর পাখি শিকার করার জায়গা দেখতে পাওয়া যাবে। আগেকার বর্ণনামতোই এখানকার অধিবাসীরাও একই ধরনের রীতি-নীতি আর প্রথা অনুসরণ করে। এই দশ দিনের যাত্রা শেষে আপনি ব্রিয়াস নামের প্রশস্ত একটা নদীর কাছে এসে হাজির হবেন, যা এই প্রদেশকে ঘিরে রেখেছে। এই নদী সাগরে গিয়ে মিলেছে। এখানেই এই নদীর কথা শেষ করছি, কেননা এর সম্পর্কে আলাদা করে আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এবার আমরা কারাজান প্রদেশের কথা বলব।

৪৮

মস্ত প্রদেশ কারাজান এবং এর প্রসিদ্ধ নগরী ইয়াচি

একটু আগে যে নদীর কথা বলা হলো সেটা পেরিয়ে এলে, আপনি কারাজান প্রদেশে প্রবেশ করবেন, এটা এতই বড় যে এর প্রশাসন সাত ভাগে বিভক্ত। এটা পশ্চিমে অবস্থিত; অধিবাসীরা পৌত্তলিক। গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, এখানকার রাজা হিসেবে সম্রাট তার ছেলে সেন-তিমুরকে বেছে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত মহানুভব, ধনী, আর ক্ষমতাধর একজন রাজপুত্র, জন্মসূত্রেই প্রজ্ঞা আর সদ্‌গুণের অধিকারী এবং তিনি খুবই ন্যায়তার সঙ্গে রাজ্য শাসন করছেন। এই

নদীপথে পাঁচ দিন ধরে পশ্চিমে যাবার সময় জন-অধ্যুষিত একটা এলাকা আর অনেক প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়। এইসব লোকেরা মাছ, মাংস, আর তাদের ক্ষেতে জন্মানো ফলমূলাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। এদের ভাষা খুবই বিচিত্র, আর আত্মস্থ করা কঠিন। এই প্রদেশে সবচেয়ে ভালো জাতের ঘোড়া জন্মে।

এই পাঁচ দিনের ভ্রমণ শেষে আপনি এর রাজধানী ইয়াচিতে এসে হাজির হবেন, এটা খুবই বড় আর উন্নত এক নগর। মিশ্রজনতার এই শহরে অনেক বণিক আর কারিগরের বসবাস; পৌত্তলিক, নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান এবং সারাসিন বা মুহাম্মাদান সব ধরনের লোক থাকলেও; পৌত্তলিকদের সংখ্যাই বেশি। এখানকার লোকেরা রুটির বদলে ভাত খায়। এরা অন্যান্য শস্যের সঙ্গে মসলা মিশিয়ে স্বচ্ছ আর চমৎকার স্বাদের একধরনের ওয়াইন প্রস্তুত করে। মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এরা সাগর থেকে পোর্সেলিনের খোলস আহরণ করে, তাছাড়া গহনা হিসেবেও এগুলোকে তারা গলায় পরে। এমন আশিটা খোলক এক রৌপ্য স্যাগি বা দুই ভেনিসিয়ান গ্রোট এবং খাঁটি রুপায় হলে আট স্যাগি আর ভালো মানের স্বর্ণের হলে এক স্যাগির সমান। এই দেশেও লবণজলের ঝরনা রয়েছে, এখানকার অধিবাসীরা সেগুলো লবণ উৎপাদনে ব্যবহার করে। উৎপাদিত এই লবণ থেকে সম্রাটের কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জমা হয়।

অন্যের সঙ্গে নিজ বউয়ের সম্পর্ককে স্থানীয়েরা কোনো প্রকার অনিষ্ট হিসেবে গণ্য করে না, মহিলারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়েই তা করে থাকে। এখানে শত মাইল প্রশস্ত একটা হ্রদ আছে, সেখান থেকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা হয়; যার কোনো কোনোটা খুবই বড় আকৃতির। এখানকার লোকেরা রান্না ছাড়াই মুরগি, ভেড়া, ষাঁড় আর মহিষের মাংস খায়, তবে তার আগে তা এভাবে তৈরি করে নেয় : ছোট ছোট টুকরা করে কেটে বেশ কয়েক ধরনের মসলাযুক্ত লবণ জলে ডুবিয়ে রাখে। তবে কেবল ধনীরাই খাবার জন্য এভাবে মাংস তৈরি করে, কিন্তু দরিদ্রেরা কিমা করে রসুনের সসে ডুবিয়ে খায়।

৪৯

খারাজান প্রদেশের আরো কিছু জায়গার কথা

ইয়াচি ছেড়ে পশ্চিমে আরো দশ দিন গেলে আপনি খারাজান প্রদেশের প্রধান শহরে উপস্থিত হবেন। জায়গাটা গ্রেট খানের শাসিত এলাকার অধীন, তার পুত্র কোগাটিনের মাধ্যমে যাবতীয় রাজকীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এখানকার নদীতে গুঁড়া আর পিণ্ড এই দুই অবস্থাতেই স্বর্ণ পাওয়া যায়, আর এর পাহাড়ি শিলাতেও তা রয়েছে। আর বিপুল পরিমাণে আহরিত কারণে, এরা এক ছয় স্যাগি রুপার বিনিময়ে এক স্যাগি স্বর্ণ দিয়ে থাকে। এখানে পাওয়া না গেলেও তারা ভারত থেকে আসা পোর্সেলিনের খোলোস মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে। এর

আগে যেমনটা বলেছি, তেমনি এখানকার লোকেরাও বউ হিসেবে কখনো কুমারী নারীকে বিয়ে করে না।

এখানে সাপ, সেই সঙ্গে আরো একধরনের বিশাল আকৃতির সর্প [কুমির] দেখতে পাওয়া যায়, যার দৈর্ঘ্য দশ কদমের ওপরে, আর সামনের দিকে এর শরীর দশ বিঘতের মতো প্রশস্ত, মাথার কাছাকাছি, তিন নখরওয়ালা দুটা পা রয়েছে, চোখ দুটা তিন পেনির সমান এবং খুবই উজ্জ্বল। চোয়াল এতটাই প্রশস্ত যে তা আস্ত একটা মানুষ গিলে খাবার উপযোগী, দাঁতগুলো খুবই বড় আর ধারালো, প্রাণীটা দেখতে এতটাই ভয়ানক যে মানুষসহ যেকোনো জন্তু-জানোয়ার এর সামনে পড়লে ভড়কে যেতে বাধ্য। অন্যগুলো খানিকটা ছোট, আট, ছয় বা পাঁচ কদম পর্যন্ত লম্বা।

এগুলো ধরার জন্য বিশেষ একধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। দিনের বেলা প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে এরা দল-বেঁধে গুহাতে বিশ্রাম নিলেও রাতের বেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে আসে এবং সামনে পড়া যেকোনো পশুকে হত্যা করে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। খাবার পর এরা হ্রদ, ঝরনা বা নদীতে জল পান করতে যায়। কিন্তু খুব বেশি ওজনের কারণে তীরের দিকে এদের চলাচলের ছাপ দেখে মনে হয় ভারী কোনো থাম বুঝি বালির ওপর দিয়ে টেনে নেয়া হয়েছে। প্রায়ই একই পথ ধরে যাতায়াত করে বলে, শিকারিরা লোহার তীক্ষ্ণ কাঁটাওয়ালা বেশ কয়েকটা কাঠের টুকরা তাদের পথের ওপর গেঁথে বালি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়। যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। তারপর প্রাণীটা এর ওপর দিয়ে যাবার সময় আহত হয়ে মরে পড়ে থাকে।

মারা গেছে এটা বোঝার পর আশপাশের কাকেরা চিৎকার জুড়ে দেয়, আর সেটা শিকারিদের জন্য সংকেত হিসেবে কাজ করে, তখন তারা সেখানে গিয়ে মৃত জানোয়ারটার মাংস থেকে চামড়া ছাড়িয়ে, সতর্কতার সাথে দ্রুত পিত্তখানা আলাদা করে রাখে স্থানীয়দের মাঝে এটা খুব মূল্যবান ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাউকে পাগলা কুকুরে কামড়ালে, এর পেনি সমপরিমাণ, ওয়াইনের সঙ্গে মিশিয়ে, প্রয়োগ করা হয়। মহিলাদের প্রসব বেদনার সময়, প্রসব দ্রুততর করতেও এটা ব্যবহার করা হয়। ফোঁড়ার ওপর অতি সামান্য পরিমাণে দিলে সেটা পুঁজসহকারে মিলিয়ে যায়। এছাড়াও এর আরো অনেক কার্যকর ব্যবহারের কথা শোনা যায়।

এর মাংসও হরিণের দামে বিক্রয় হয়, কেননা এর মাংস অন্যান্য মাংসের চাইতে স্বাদে-গন্ধে উত্তম বলে সবার কাছে তা খুবই উপাদেয় বলে বিবেচিত। এই প্রদেশে বড় আকারের ঘোড়া প্রচুর পাওয়া যায় এবং ছোট থাকতেই এদের চড়া দামে বিক্রির জন্য ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঝাঁটানোর মতো বিশ্রী স্বভাবের কারণে লেজজুড়ে যাবার ভয় থাকায় আর জাহাজে অবিরাম দোল খাওয়ায় পাশ থেকে আঘাত ঠেকাতে অনেক ছোট থাকতেই তাদের সেখানে নেয়া হয়।

ফরাসিদের মতো এরাও ঘোড়ায় চড়ার সময় লম্বা রেকাব ব্যবহার করে; অন্যদিকে তাতারসহ অন্য সবাই, চলন্ত অবস্থায় সহজে তীর ছুড়তে তাদের

ঘোড়াকে খাটো রেকাব পরায়। এ সময় এরা সারা শরীরে মহিষের চামড়ার বর্ম পরে, সঙ্গে বর্শা, ঢাল আর তীর-ধনুক বহন করে। এদের সব তীরে বিষ মাখানো থাকে।

একটা সত্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি যে, অনেকেই এবং বিশেষ করে যাদের মনে খারাপ কিছু করার অভিসন্ধি রয়েছে, সব সময় সঙ্গে বিষ রাখে, যাতে ধরা পড়ার পর তা গিলে অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে পারে। সেই নিশ্চিত দুর্ভোগের বদলে তারা নিজেকেই ধ্বংস করে দিতে সদা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এ সম্পর্কে সজাগ এমন সবাই সঙ্গে সঙ্গে সেই লোককে কুকুরের বিষ্টা খাইয়ে দেয়, যাতে বমির সঙ্গে তাকে সেই গিলে ফেলা বিষ উগরে দিতে বাধ্য করা যায়। তাই এই মহাঔষধ সব সময় এ ধরনের হতভাগাদের জন্য তৈরি রাখা হয়।

গ্রেট খানের অধীনে আসার আগে এখানকার লোকেরা বর্বর এক রীতিতে আসক্ত ছিল। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য আর পরাক্রমে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ অপরিচিত কেউ এখানে আসলে তাদের কেউ থাকার কথা বলে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাতের বেলা হত্যা করত; তবে কেবল অর্থের লোভেই তারা এমন গর্হিত কাজ করত তা কিন্তু নয়, তাদের বিশ্বাস এর মাধ্যমে সেই মৃত লোক তার মেধা আর মনন নিয়ে তাদের পরিবারের মাঝে অবস্থান করবে, আর এভাবে তাদের আয়-উন্নতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। একইভাবে বিখ্যাত কারো আত্মার অধিকারী হবার পর সেই লোককেও এই একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে জীবন খোয়াতে হয়। কিন্তু এই দেশে সম্রাটের শাসন শুরু হবার পর থেকে তিনি এ ধরনের জঘন্য নিয়ম রহিত করার স্বার্থে চরম শাস্তি হিসেবে চর্চাকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের ঘোষণা দেন।

৫০

কারদানদান প্রদেশ এবং ভোচাং নগর

কারাজান থেকে পশ্চিমে পাঁচ দিনের পথ গেলে, আপনি কারদানদান প্রদেশে প্রবেশ করবেন, জায়গাটা গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অধীন এবং এর প্রধান নগরের নাম ভোচাং। মুদ্রা হিসেবে এখানে ওজনাকারে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়, সেই সঙ্গে পোর্সেলিন খোলসও। পাঁচ আউন্স রুপার বিনিময়ে এখানে এক আউন্স স্বর্ণ পাওয়া যায়, আর এক স্যাগি স্বর্ণে পাঁচ স্যাগি রুপা পাওয়া যায়। এ দেশে রুপার কোনো খনি নেই, তবে প্রচুর স্বর্ণ রয়েছে, তাই যেসব বণিকেরা এখানে রুপা আমদানি করে তারা অনেক বেশি লাভের মুখ দেখতে পারে।

এখানকার নারী-পুরুষের সবার মাঝে পাতলা সোনার পাতে দাঁত আবৃত করার রীতি রয়েছে, যা খুব সূক্ষ্মভাবে দাঁতের আকৃতির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় আর তাতে করে এর স্থায়িত্বও বাড়ে। পুরুষরাও হাতে-পায়ে সুই ফুটিয়ে কালো

একধরনের বন্ধনী আঁকে। এর জন্য প্রথমেই পাঁচটা সুই একসঙ্গে যুক্ত করে, আর সেটা দিয়ে রক্ত বের হবার আগপর্যন্ত মাংসে বিদ্ধ করে; এবং তারপর সেই ক্ষতে কালো রঙের একধরনের জিনিস লেপে দেয়, যার ফলে সেখানে অমোচনীয় একটা দাগ তৈরি হয়। এই কালো দাগ বহন করাকে বিশেষ মর্যাদা আর সম্মানজনক বলে গণ্য করা হয়।

ঘোড়ায় চড়ে শিকার ধরা, অস্ত্রবাজি আর সামরিক জীবনযাপন ছাড়া আর কিছুতেই তাদের নজর নেই; বাড়ির সব কাজকারবার দেখার ভার বউদের, দাস-দাসীরা তাদের কাজে সহযোগিতা করে, এদের কিনে বা যুদ্ধ বন্দিদের মাঝ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

এখানকার লোকেদের মাঝে বিশেষ একধরনের প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। সন্তান জন্ম দেবার পরপর মায়েদের বিছানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে গোসল দেয়া হয়, আর সদ্যপ্রসূত সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামী তার ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করে, পাশে বাচ্চা নিয়ে এভাবে সে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার যত্ন নেয়। এই সময়ে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাদের অভিনন্দন জানাতে আসে; সেই মহিলা তখন ঘরের কাজ করে, বিছানায় স্বামীকে খাবার-দাবার আর পানীয় এগিয়ে দেয় এবং তার পাশ থেকে শিশুকে স্তন্যপান করায়।* *

এখানকার লোকেরা কাঁচা মাংস বা একটু আগে যেভাবে বলা হলো সেভাবে তৈরি করে খায় এবং এর সঙ্গে ভাত খায়। তাদের ওয়াইনও মসলার মিশ্রণে এই ভাত থেকেই তৈরি হয়, আর এটা খুবই উন্নত ধরনের পানীয়।

এই জেলার লোকেদের জন্য কোনো মন্দির বা দেব-দেবীর প্রতিমা নেই, তবে এরা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের বা অন্যান্য পূর্বপুরুষদের পূজা করে। তাদের কথা হলো, তারাই তাদের এই অস্তিত্ব দিয়েছে, তাই তারা তাদের সব কিছুর জন্য তাদের কাছে ঋণী। লিখা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই এদের নেই, আর ঘন বনে আচ্ছাদিত প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃতিক বৈরী আবহাওয়ার কারণে এরা খুব বেশি দূরে ভ্রমণেও যায় না। গ্রীষ্মে আবহাওয়া এতটাই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আর বিমর্ষ থাকে যে, জীবন বাঁচাতে বণিক আর পর্যটকদের সেই সময়টুকু এখানেই কাটিয়ে দিতে হয়।

স্থানীয়রা একে অন্যের সঙ্গে কোনো ব্যবসায়ীক লেনদেনে, ধারদেনার দরকার হলে, তাদের গোত্র প্রধান চারকোনা একটা কাঠের টুকরা নিয়ে দু'ভাগ করেন। তারপর অর্থের পরিমাণ বোঝাতে তাতে খাঁজ কেটে দু'পক্ষের হাতে তার

---

* এ ধরনের চমৎকার প্রথা ভারত, বোর্নিও, সিয়াম, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কিছু জায়গাতেও প্রচলিত রয়েছে। সেখানে জন্ম নেয়া সন্তানের নামের একটা অংশও বাবার থেকে নেয়া হয়। প্রাচীন চৈনিক অনেক চিত্রকর্মে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার বেশ কিছু লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এবং জাদুঘরের ক্যাটালগে চৈনিক এই শিল্পকর্মের প্রতিনিধি হিসেবে তা পুনরুৎপাদিত হচ্ছে।

একটি করে খণ্ড তুলে দেন, ঠিক যেমনটা আমাদের টালির ক্ষেত্রে প্রচলিত। সময় অতিবাহিত হলে ঋণদাতার দেনা পরিশোধ হবার পর তিনি সেই অংশ গ্রহীতাকে ফেরত দেন, এভাবে উভয়ের সন্তোষটি বিধান নিশ্চিত হয়।

এই প্রদেশ, এমনকি কাইন-ডু, ভোচাং বা ইয়াচি নগরে কোনো জোকজ্ঞানসম্পন্ন লোক নেই। ঘটনাক্রমে কেউ অসুখে আক্রান্ত হলে, তার পরিবারে লোকেরা দেবী প্রতিমার কাছে বলি দেন, তার কাছে পীড়ার ধরন অনুসারে প্রার্থনা জানানো হয়।

তখন সেখানকার জাদুকর উপস্থিত লোকেদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নেচে-গেয়ে দেবতার তুষ্টি অর্জনের পথ বাতলে দেন। দুষ্ট-আত্মা তাদের কারো ওপরে ভর করার আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এরপর তারা অশুভ-আত্মা ভর-করা সেই লোকের কাছে এর প্রকৃত কারণ আর তার সেরে ওঠার উপায় জানতে চান। দুষ্ট-আত্মা তখন যার দেহে ঢুকেছে তার মুখ দিয়ে এর জবাব দেন এবং এমন কোনো দেব-দেবীর নাম প্রকাশ করেন যার প্রতি কৃত পাপই এই দুর্ভোগের কারণ। সেই জাদুকর তখন পাপীর হয়ে দেবতার কাছে এই বলে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, উপশম হলে রোগী তার নিজ রক্ত হতে বিসর্জন দিবে। কিন্তু সেই অপদেবতা যদি মনে করেন তার উপশমের আর কোনো আশা নেই তাহলে, তিনি তখন সবাইকে জানান সেই দেবতা এতটাই রুষ্ট হয়ে আছেন যেকোনো বলিই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। অন্যদিকে, যদি, তিনি বুঝতে পারেন এর উপশম সম্ভব তাহলে সেই দেবতাকে কালো মাথাওয়ালা অনেকগুলো ভেড়া বলির প্রস্তাবের কথা জানানো হয়; আর এমনটা হলে আরো অনেক জাদুকর তাদের বউদের সঙ্গে নিয়ে বলি দেবার জন্য একত্রিত হন এবং তারা নিজ হাতে সেই বলি দেন; যার মানে হলো, তাদের মতে, দেবতার অনুগ্রহ পাওয়া গেল।

দেবতার ইচ্ছে পূরণে মত দেবার পর সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদামতো সব কিছু জড়ো করা হয়, ভেড়া কাটা হয়, তাদের রক্ত ছিটিয়ে স্বর্গের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়, নারী আর পুরুষ জাদুকরদের সবাই সেই অসুস্থের বাড়িঘর ধূপ-ধুনার সৌরভ আর ঘৃতকুমারী কাঠের ধোঁয়ায় ভরিয়ে তুলে। মাংস সেদ্ধ করা জলের সঙ্গে মসলা দিয়ে গাঁজানো মদ মিশিয়ে বাতাসে ছিটিয়ে; হাসতে হাসতে দেবতার সম্মানে নেচে-গেয়ে, সেই বলির মাংস আর মসলা মদে ভোজের আয়োজন করে, যা তাদের আরো উচ্ছল আর স্বাধীনভাবে গাইতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

খাওয়া শেষে, নিজেদের পাওনা বুঝে নেবার পর, তাদের সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়; এবং তাদের ঈশ্বরের বিধান অনুসারে রোগী আরোগ্য লাভ করলে, যে দেবতার কাছে বলি দেয়া হয়েছিল এর কৃতিত্ব তাকে দেয়া হয়। আর রোগী মারা গেলে তারা তখন ঘোষণা করেন, দেবতা চেখে দেখার আগেই, পূজার উপকরণ তৈরি করেছে এমন কেউ সেই উৎসর্গের জিনিসে ভাগ বসিয়েছিল।

তবে এটাও বুঝে নিতে হবে যে সবার অসুস্থতার ক্ষেত্রে এমন জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্ভব নয়, কেবল ধনী আর অভিজাতদের জন্যই এমন

ব্যবস্থা, আর সম্ভবত মাসে এ ধরনের দু-একটা অনুষ্ঠান সেখানে লেগেই থাকে। এই ক্যাথি এবং মানজি প্রদেশের সর্বত্রই এ ধরনের আচার দেখতে পাওয়া যায়, সেখানকার পৌত্তলিক অধিবাসীদের জন্য চিকিৎসক জিনিসটা একেবারেই বিরল; এবং প্রতারিত আর দুর্দশাগ্রস্তদের অন্যতম ভরসা থুজ-ডু নামের অপদেবতা।

৫১
মিএন* আর বাংলা জয়

এবার আমার এই রাজ্যের লড়া এক স্মরণীয় যুদ্ধের কথা শুনব। ১২৭২ সালের ঘটনা, গ্রেট খান ভোচাং এবং খারাজানের নিরাপত্তায় বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে আসন্ন বিদেশি আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভব হয়। তখনো তিনি সেখানকার গভর্নর হিসেবে নিজের ছেলেকে পাঠাননি।

সেই সময় মিএন, বাঙালা আর ভারত একক রাজার অধীনে ছিল। বেশ কিছু অনুগত রাজ্যসহ বিশাল রাজত্ব আর ধন-সম্পদের জন্য সেই রাজা ছিলেন খুবই ক্ষমতাধর। তাতার বাহিনী ভোচাং পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এটা জানার পর তৎক্ষণাৎ তাদের আক্রমণ করার জন্য তিনি সেদিকে অগ্রসর হন, যাতে এর ধ্বংসের মাধ্যমে গ্রেট খানকে তার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েনে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশাল এক বাহিনী সমবেত করেন, এতে বারোজন করে থাকার মতো দুর্গবুরুজ বা কাঠের প্রাসাদসহ বিশাল এক হাতি বাহিনীও ছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিশাল এক পদাতিক আর অশ্বারোহী। এদের সবাইকে নিয়ে তিনি ভোচাং-এর দিকে রওনা হন। গ্রেট খানের সেনারা যেখানে চৌকি গেড়েছে তার কাছাকাছি পৌঁছে তাঁবু ফেলে তিনি তার সেনাদের কয়েক দিনের বিশ্রাম দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

৫২
গ্রেট খানের সেনারা যেভাবে যুদ্ধ লড়ে

মিএন-এর রাজা তার প্রচণ্ড শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট খানের চৌকস আর সাহসী সেনা কমান্ডার নেস্টরডিন অনেক বেশি সতর্ক হয়ে পড়েন। তার অধীনে তখন বারো হাজারের বেশি সৈন্য ছিল না। অন্যদিকে হাতিবাহিনীর পাশাপাশি শত্রু ছাউনিতে অপেক্ষায় ছিল ষাট হাজারেরও বেশি সৈন্য। তারপরও তার চোখে সম্রাটের প্রতি অবাধ্য হবার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। তবে তিনি ভোচাং-এর সমতল থেকে সরে গিয়ে ঘন বনের পাশে অবস্থান নেন। হাতির প্রচণ্ড আক্রমণ হলে যেন অন্তত তার সেনারা বনের ভেতরে

---

* বার্মা

পালিয়ে বাঁচতে পারে আর সেখান থেকে তারা তীরের সাহায্যেও শত্রুকে আক্রমণ করতে পারবে।

প্রধান অফিসারদের একত্র করে তিনি আদেশ দেন যাতে সবাই আগের মতোই তাদের সাহসিকতা সমুন্নত রাখেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বিজয় কখনো সংখ্যার ওপরে নির্ভর করে না, এর জন্য দরকার সাহসিকতা আর নিয়মানুবর্তিতা। তিনি তাদের বলেন, মিএন ও বাঙালার রাজার সৈন্যরা অনভিজ্ঞ এবং যুদ্ধের নৈপুণ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাদের মতো এত অভিজ্ঞতা অর্জনেরও এদের সুযোগ নেই; তাই শত্রুর বিশাল সংখ্যা দেখে দমে না গিয়ে নিজেদের শক্তিতে আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত; কেননা কেবল এই শত্রুর কাছেই নয়, বিশ্বব্যাপী তাদের অপর নাম আতঙ্ক। এরপর তিনি সবাইকে নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর যখন শত্রুরা জানতে পারে যে তাতাররা সমতল থেকে সরে পড়েছে, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে তাতারদের দিকে মাইলখানেক অগ্রসর হন।

পূর্ববর্তী আদেশ অনুসারে তারা আস্ত বাহিনীসমেত সোজাসুজি তাতারদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে তাতাররাও নড়াচড়া বাদ দিয়ে একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে পরিখা পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দেয়। এরপর তারা প্রচণ্ড উদ্যমে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়; কিন্তু খুব দ্রুত দেখতে পাওয়া যায় তাতার ঘোড়াগুলো ভয়ঙ্কর দর্শন প্রাসাদসমেত প্রকাণ্ড সেই জন্তুসমূহ দেখে অভ্যস্ত নয় এবং সেসব দেখে তারা পালাতে শুরু করে, আর তাদের আরোহীরাও তাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়, এরই মধ্যে রাজা তার সব সৈন্যসামন্তসহ সামনে অগ্রসর হতে থাকে। সেই বিচক্ষণ কমান্ডার অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিশৃঙ্খলা আঁচ করতে পারার পরপর, হতবুদ্ধি না হয়ে, ত্বরিত তার লোকেদের তাদের বাহন থেকে নেমে ঘোড়াগুলোকে বনের মধ্যে নিয়ে বেঁধে রাখতে বলেন। অবতরণ সম্পন্ন হলে কোনো প্রকার সময়ক্ষেপণ না করে, সবাই পায়ে হেঁটে হাতির সারির দিকে এগোতে থাকে এবং তখন তিনি তাদের শত্রুর উদ্দেশ্যে তীর ছুড়বার আদেশ দেন।

একই সময়ে হাতির পিঠের ওপর কাঠের দুর্গে অবস্থানকারীরাসহ রাজার বাকি সৈন্যরা, প্রচণ্ড উদ্যমে একযোগে তীর ছুড়তে থাকে; কিন্তু তাদের তীর তাতারদের মতো একই ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, কারণ প্রতিপক্ষের তীরগুলো আরো শক্তিশালী হাত দ্বারা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে তীর বর্ষণ আর তাদের সব অস্ত্র হাতির বিপরীতে ব্যবহার করায়, সেগুলো দ্রুত তীরে ছেয়ে যায়, ফলে বিভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ পালাতে গিয়ে তারা পেছনে থাকা তাদের নিজ লোকেদের ওপর চড়াও হয়। তাদের চালকদের পক্ষে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ক্ষতের ব্যথায় কাতর এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে তারা চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে থাকে, এই অবস্থায় তাদের আর নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আর দিকনির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ভয়কাতর অবস্থায় সেগুলো বনের যে দিকটা তখনো তাতারদের দখলে নেই সেদিকে সবেগে ঢুকে পড়ে। এতে করে বনের বিশাল বিশাল বৃক্ষের শাখার সঙ্গে আঘাত লেগে তাদের ওপরকার কাঠের প্রাসাদ বা দুর্গ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়, আর তার ভেতরের লোকেরা মারা পড়ে। হাতিগুলোকে এভাবে পালাতে দেখে তাতারদের মনে গভীর সাহসের সঞ্চার হয়, তখন একে একে ঘোড়ায় আরোহণ করে আবারও তারা তাদের ডিভিশনগুলোতে যোগ দেয়। এরপর তারা নতুন উদ্যমের সঙ্গে আবারও লড়াই শুরু করে।

এদিকে রাজার সৈনিকদের মনে এক বিন্দু পরাক্রম অবশিষ্ট নেই এবং তিনি নিজে সৈন্যের সারির ভেতরে গিয়ে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস যোগাতে থাকেন। আর তিনি তখন হাতির পালের ভেতরে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অবহিতও ছিলেন না। কিন্তু তাতাররা, তীর ছুড়বার দক্ষতার কারণে, তাদের কাছে খুব ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। দু'দিক থেকে তীর ছুটে আসতে থাকে, লোকেরা তাদের তরবারি আর গদা আঁকড়ে ধরে, আর একে ওপরের ওপর মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাৎক্ষণিক অনেক ভয়ানক ক্ষত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, এদিকে-সেদিকে অসংখ্য বিচ্ছিন্ন হাত-পা, মাটিতে পড়ে অনেকেই মুখ বিকৃত করে মৃত্যুবরণ করে, সেই রক্তের উৎসরণের দিকে তাকিয়ে থাকা খুবই আতঙ্কজনক। একে অপরকে এমন প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করতে থাকে, সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার আর শোরগোল আকাশ ভেদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সেনানায়কের দায়িত্বে থাকা মিএন-এর রাজা ভয়াবহ বিপদ আঁচ করতে পারার পরও সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন এবং সকাতরে তাদেরকে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে বলেন। রিজার্ভ থেকে তরতাজা স্কোয়াড্রনগুলোকে পরিশ্রান্ত হতবিহ্বল দলগুলোর সাহায্যে এগিয়ে যেতে আদেশ দেন; কিন্তু অবশেষে তিনি বুঝতে পারেন এই যুদ্ধে টিকে থাকা বা তাতারদের প্রতিহত করা এই মুহূর্তে তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায়, এই দুর্বল সেনানী নিয়ে তাকে এবার পালাতে বাধ্য হতে হবে, যাদের বেশিরভাগই পশ্চাদ্ধাবনকালে মারা পড়ে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, এতে দু'পক্ষের অনেকেই মারাত্মক আহত হয়, তাতে করে উভয়েই যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতি আঁচ করতে পারে। কিন্তু অবশেষে তাতারদেরই জয় হয়। সম্ভবত এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো, রাজা যদি সেই অবস্থান থেকে আক্রমণ পরিচালনা না করতেন তাহলে তাতারদের বনের দিক থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। আর সেটা করলে সেই অবস্থান থেকে তারা বনের সহায়তায় সশস্ত্র হাতির আক্রমণকে কিছুতেই প্রতিহত করতে সক্ষম হতো না এবং সেখানে তার অশ্বারোহীর দুটি অংশ তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে পারত।

শত্রুকে পরাজিত করার পর, শক্তি সংগ্রহ করে তাতাররা হাতিগুলোর দখল নেবার জন্য বনের যেই অংশে সেগুলো পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় উৎখাত হওয়া সৈনিকেরা তাদের প্রতিহত করতে গাছ কেটে পথ আটকে রেখেছে। কিন্তু তাতাররা অবিলম্বে তাদের অনেককে হত্যা করে এবং হাতি চালাতে সক্ষম এমন লোকেদের সহায়তায় তারা দুশয়ের অধিক হাতি ধরতে সক্ষম হয়।

এই যুদ্ধের পর থেকে গ্রেট খান সব সময় তার সেনাবাহিনীতে হাতি রাখতে শুরু করেন। আর অভূতপূর্ব এই বিজয়ের ফলে বাঙালা এবং মিএন রাজার রাজত্বের অধিকৃত বাদবাকি সমস্ত অঞ্চল তার অধিকারে চলে আসে।

৫৩

প্রথামুক্ত এক অঞ্চল এবং মিএন রাজত্ব

কারাডেনডান প্রদেশ ছেড়ে আসলে পথে বিশাল একটা ঢাল পড়ে, টানা পথ চললে তা পেরিয়ে আসতে প্রায় আড়াই দিনের মতো সময় লাগতে পারে, এখানে কোনো বসতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপর রয়েছে প্রশস্ত একটা সমতল প্রান্তর। যেখানে সপ্তাহে তিন দিন ব্যবসায়ীদের সমাগম হয়, যাদের অনেকেই স্বর্ণের বিনিময়ে রুপা সংগ্রহের জন্য সেগুলো নিয়ে আশপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসে। বণিকেরা এখান থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে দূর দেশে নিয়ে যায়। এখানে এক স্যাগিও স্বর্ণের বিনিময়ে পাঁচ রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়।

এখানকার অধিবাসীরা তাদের নিজেদের স্বর্ণ রপ্তানিকারকদের রপ্তানির অনুমোদন করে না, তবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে তারা সেগুলো ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এবং স্থানীয়দের ছাড়া অন্য কেউ তাদের বাসা-বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না। এই নিয়ম এতটাই কঠোর যে বাইরের কারো পক্ষে সেখানে পৌঁছানো খুবই কষ্টকর, আর এ কারণেই খোলা মাঠে সব ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন হয়।

এখান থেকে দক্ষিণে, ভারত সীমান্তের কাছাকাছি মিএন [বার্মা] প্রদেশ অবস্থিত। ঘর-বসতি আর জনমানবহীন এলাকার ভেতর দিয়ে একটানা পনের দিনের পথ। এখানকার বন হাতি, গণ্ডার আর নানা জাতের বন্য জন্তুতে ভরপুর।

৫৪

মিএন নগর এবং সেখানকার সোনা-রুপার স্তম্ভ

এই পনের দিনের পথ চলার পর আপনি মিএন নগরে এসে পৌঁছবেন, যা খুবই প্রকাণ্ড, জাঁকজমকপূর্ণ এবং রাজত্বের [বার্মা] রাজধানী। জায়গাটার অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে।

জানা গেছে, আগে এখানে খুব ধনী আর ক্ষমতাধর এক সম্রাট রাজত্ব করতেন, মৃত্যুর সময় তিনি নিজ হাতে এঁকে তার সমাধির কাছে দুটি পিরামিড আকৃতির স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ দিয়ে যান। এর একটি এক ইঞ্চি পুরুত্বের স্বর্ণ পাতে এমনভাবে আবৃত যে স্বর্ণ ছাড়া এর ভেতরের আর কিছুই দৃশ্যমান হয় না। আর অন্যটা একই পুরুত্বের রুপার পাতে ঢাকা। এদের শীর্ষে সোনা-রুপার ছোট ছোট ঘন্টি এমনভাবে রাখা আছে যেন তা বাতাসে দোল খেয়ে আপনা-আপনিই অনবরত বাজতে থাকে। এই এক একটি স্তম্ভ দশ কদম করে উঁচু। যার পুরোটা দেখতে সত্যিই চমৎকার।

একইভাবে সমাধিটাও আংশিক সোনা আর আংশিক রুপার পাতে আবৃত। নিজের আত্মার সম্মানে এবং তার স্মৃতি যাতে কখনো মুছে না যায়, তাই এভাবেই রাজা তাদের সেটা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

গ্রেট খান এই নগরের মালিকানা বুঝে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, তা কার্যকর করার জন্য এক বীর অফিসারের নেতৃত্বে সেখানে একদল সেনা প্রেরণ করেন, আর তাদের সঙ্গে থাকে একদল জাদুকর, যাদের অসংখ্যজন সব সময় দরবারের সেবায় উপস্থিত থাকেন। নগরে প্রবেশের সময় তারা শোভাময় সেই দুটা পিরামিড দেখতে পান। কিন্তু এদের ব্যাপারে সম্রাটের ইচ্ছের কথা জানার আগপর্যন্ত তারা এর কোনো কিছুতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। গ্রেট খান জানতে পারেন প্রাক্তন রাজার মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। আর তাতাররা মৃতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেকোনো জিনিসকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তাই তিনি তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হতে দেননি। এই দেশে অনেক হাতি পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে বিশালাকৃতির সুন্দর সুন্দর বুনো ষাঁড়, শূকর, বেঁটে হরিণসহ অন্যান্য জন্তুও প্রচুর রয়েছে।

৫৫

বাঙালা প্রদেশ

বাঙালা [বাংলা] প্রদেশ দক্ষিণে অবস্থিত এবং মার্কো পলো তার প্রাসাদে অবস্থানের সময় সেটা গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। খুব দুর্ভেদ্য আর এর রাজা প্রচণ্ড ক্ষমতাধর হওয়ায় দেশটি অধিকার করতে এর বিরুদ্ধে তার বাহিনীকে উল্লেখযোগ্য সময় ধরে অভিযান পরিচালনা করতে হয়।

এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা রয়েছে। লোকেরা পৌত্তলিক। এখানে একধরনের ষাঁড় দেখতে পাওয়া যায়, যা প্রায় হাতির মতোই উঁচু, তবে তা আকৃতিতে খুব একটা বড় নয়। অধিবাসীরা মাংস, দুধ এবং ভাত খেয়ে জীবনধারণ করে, যা এখানে প্রচুর জন্মে। এই দেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয় এবং এখানে বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছে। সুগন্ধি বৃক্ষ, জালানাজাল, আদা, চিনি এবং অসংখ্য ধরনের ওষুধ

এখানকার মাটিতে জন্মে; সেসব কিনতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে বণিকেরা আসে।

একইভাবে তারা এখান থেকে খোজাও সংগ্রহ করে, এই দেশে দাস হিসেবে এদের প্রচুর পাওয়া সম্ভব; আর রাজা-রাজন্যসহ পদস্থেরা তাদের নারীদের নিরাপত্তায় এদের পেতে ইচ্ছুক, ফলে অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের দাস নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি লাভের মুখ দেখতে সক্ষম হন। দেশটা ত্রিশ দিনের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর পুবের সীমান্তে কাঙ্গিগু নামের দেশ অবস্থিত।

৫৬

কাঙ্গিগু প্রদেশ

কাঙ্গিগু পুবের একটা প্রদেশ, আর এটা এক রাজার দ্বারা শাসিত। লোকেরা মূর্তির উপাসনা করে, তাদের নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে এবং এরা স্বেচ্ছায় গ্রেট খানের বশ্যতা স্বীকার করে, তার কাছে বাৎসরিক আদায় পাঠিয়ে থাকে। এখানকার রাজা ভোগ-বিলাসে খুবই আসক্ত, তাই তার তিন শতের মতো বউ রয়েছে এবং কোথাও সুন্দরী ললনার খোঁজ পেলে তাকে আনিয়ে বিয়ে করেন।

এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, সেই সঙ্গে পাওয়া যায় অসংখ্য ধরনের ওষুধ; কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরে আর ভূ-মধ্যস্থ দেশ হওয়াতে, এখানকার উৎপাদিত জিনিসপত্রের দাম অনেক কম। এখানকার বনে হাতিসহ অন্যান্য জন্তু প্রচুর সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীরা মাংস, ভাত আর দুধ খেয়ে জীবনধারণ করে। এখানে আঙুরের মদ পাওয়া না গেলেও, ভাতের সঙ্গে বিশেষ ধরনের ওষুধ মিশিয়ে সেটা তৈরি করে। নারী-পুরুষ সবাই সুই দিয়ে সারা শরীরে পশু-পাখির উল্কি আঁকে। এবং এদের মাঝে হাত, পা আর বুকে উল্কি আঁকিয়ে পেশাজীবী শিল্পীও রয়েছে। এই ছিদ্রগুলোর ওপরে একপ্রকার কালো বস্তু ঘষে দেবার পর সেই দাগ জল বা কোনো কিছুতেই অপসারণ করা সম্ভব নয়। নিজেদের সুশ্রী করে তুলতে নারী-পুরুষ সবাই তাদের দেহে অজস্র উল্কির প্রদর্শন করে।

৫৭

আমু প্রদেশ

আমুও পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং এখানকার অধিবাসীরাও গ্রেট খানের বশীভূত। এখানকার লোকেরা তাদের পোষা গবাদিপশুর মাংস আর ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। এদেরও আলাদা ভাষা রয়েছে। এই দেশে প্রচুর ঘোড়া আর ষাঁড় জন্মে, বণিকদের কাছে তা বিক্রয় করা হয়, আর তারা সেসব সংগ্রহ করার

পর ভারতে নিয়ে যান। বিস্তৃত তৃণভূমির জন্য এখানে ষাঁড়ের মতো অসংখ্য মহিষও পাওয়া যায়।

নারী-পুরুষ উভয়ে কানে সোনা-রুপার দুল পরে, সেই সঙ্গে হাত, পা আর কোমরেও গহনা পরে, তবে পুরুষদের চাইতে নারীদের গহনার দাম অনেক বেশি।

এই প্রদেশ থেকে কাঙ্গিগু পঁচিশ দিনের পথ, আর বাঙালায় যেতে হলে বিশ দিনের মতো পথ চলতে হবে। এবার আমরা থলোমান প্রদেশ প্রসঙ্গে আসছি, আগের প্রদেশ থেকে সেখানে যেতে আট দিনের মতো লাগে।

৫৮
থলোমান প্রদেশ

থলোমান প্রদেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত, আর এর অধিবাসীরা পৌত্তলিক। তাদের আলাদা একটা ভাষা রয়েছে। এবং জায়গাটা গ্রেট খানের অধীন। এখানকার লোকেরা দীর্ঘকায় এবং দেখতে সুন্দর; তাদের গাত্রবর্ণ খানিকটা বাদামি। এরা লেনদেনের ক্ষেত্রে খুবই ন্যায়পরায়ণ এবং বীর যোদ্ধা।

এদের বেশিরভাগ শহর আর প্রাসাদ সুউচ্চ দুর্গম পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। এরা মৃতদেহ পুড়িয়ে সৎকার করে; তবে তার হাড়গোড় ছাইয়ে পরিণত হতে না দিয়ে, সেগুলোকে কাঠের বাক্সে নিয়ে, পাহাড়ে গিয়ে এমনভাবে পাথরের গুহায় রেখে আসে যাতে বুনো পশুরা তাদের একেবারে বিরক্ত করতে না পারে।

এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সাধারণ ছোট মুদ্রা হিসেবে তারা ভারত থেকে আসা পোর্সেলিনের খোসা ব্যবহার করে; আর এই ধরনের মুদ্রা আমু এবং কাঙ্গিগুতেও ব্যবহৃত হয়, যা আগেই বলা হয়েছে। এরা ভাত, মাছ খায় আর দুধ পান করে।

৫৯
চিন্টিগুই, সিদিন-ফু, জিন-গুই আর পাজান-ফু নগর

নদীপথে বারো দিন ভ্রমণের সময় তীরের দু'ধার ঘেঁষে অসংখ্য শহর আর প্রাসাদ চোখে পড়ে, আর সে পথ ধরে এগোতে থাকলে অবশেষে এসে পৌঁছবেন বিশাল আর চমৎকার চিন্টিগুই নামের এক নগরে। এর অধিবাসীরা ব্যবসায়ী এবং কারিগর। এরা একধরনের গাছের ছাল থেকে কাপড় প্রস্তুত করে, যা দেখতে চমৎকার, নারী-পুরুষ উভয়েই তা দিয়ে গ্রীষ্মের সাধারণ পোশাক বানিয়ে পরিধান করে। এখানকার পুরুষেরা বীর যোদ্ধা। গ্রেট খানের নামাঙ্কিত মুদ্রা ছাড়া এদের নিজস্ব কোনো মুদ্রা নেই।

এই প্রদেশে অসংখ্য বাঘ রয়েছে, তাই এখানকার অধিবাসীরা এদের উৎপাতের কারণে রাতের বেলা শহরের বাইরে অবস্থান করতে পারে না। আর নদীপথে ভ্রমণের সময় এখানকার লোকেরা তীরের কাছাকাছি হবার সাহস দেখায় না। এইসব পশুরা জলপথে সাঁতরে নৌকায় উঠে তার থেকে মানুষ ছিনিয়ে নেয়।

এর পাশাপাশি সেখানে বড় আকৃতির হিংস্র একধরনের কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। এরা এতই সাহসী আর শক্তিশালী যেকোনো লোকের সঙ্গে এর একজোড়া থাকলে সে নিজেকে বাঘের চাইতেও বেশি ক্ষমতাধর বলে ভাবতে পারে। তীর-ধনুক আর তাদের সঙ্গে নিয়ে কেউ তাই বাঘের মুখোমুখি হলে, সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুর জোড়া ছেড়ে দেয়, আর তারা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সেদিকে ছুটে যায়। জন্তুটা তখন একটা গাছ খুঁজে সেটার ওপরে চড়ে বসে, যাতে কুকুর জোড়া তাকে ধরতে না পারে এবং তাতে করে সে তার শত্রুকে আরো সামনে আসার সুযোগ করে দেয়। আর শিকারিও তার কুকুর জোড়াকে দেখতে পেয়ে সেই গাছের দিকে দৌড়ে নয়, ধীর পদক্ষেপে এগোতে থাকে, তবে চোখে-মুখে ভয়ের কোনো চিহ্নই থাকে না, কেননা তার দর্প এর অনুমোদন করে না। সুচিন্তিত এই চলাচলের সময়টুকুতে কুকুর দুটা তাদের নজরদারি আরো জোরদার করে এবং সুযোগে লোকটা এগিয়ে এসে তার দিকে তীর ছুড়ে। অন্যদিকে বাঘটা তখনো কুকুরগুলোকে জব্দ করতে ব্যস্ত। কিন্তু তারা তখন ক্ষিপ্ততার সঙ্গে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এই ফাঁকে সে অসংখ্য তীরে বিদ্ধ হতে থাকে এবং বেশ কয়েকবার কুকুরের কামড়ও খায়। দুর্বল হয়ে আর রক্ত খুইয়ে একসময় এভাবেই সে শিকারির হাতে ধরা পড়ে।

এখানে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদিত হয়, যার বড় একটা অংশ শহর আর প্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীপথে দেশের অন্যান্য অংশে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার লোকেরা জীবিকার জন্য পুরোপুরি ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। বারো দিন শেষে, আপনি সিদিন-ফু নগরে এসে পৌঁছবেন, যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। এখান থেকে বারো দিনের পথ গেলে জিন-গুই শহরের দেখা মিলবে এবং এর আরো চার দিন সামনে পাজান-ফু নগর, যা ক্যাথির মালিকানাধীন, আর প্রদেশের অপর পাশ দিয়ে ফেরার সময় তা দক্ষিণে পড়বে। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, এরা মরা পোড়ায়। এর সবই গ্রেট খানের অধিকৃত, তার কাগজের মুদ্রা এখানে প্রচলিত। এরা ব্যবসা এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অঢেল রেশম থাকায় তা দিয়ে তারা স্বর্ণ মিশ্রিত একধরনের মিহি বস্ত্র বয়ন করে, সেই সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চাদরও বানায়। এই নগরের সীমানার আশপাশজুড়ে আরো অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে: যার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বিশাল এক নদী, যে পথে এখানকার উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বড় একটা অংশ কানবালুতে [পিকিং] নিয়ে যাওয়া হয়; আর এই উদ্দেশ্যে শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য অসংখ্য খাল কাটা হয়েছে। কিন্তু

সেসব কথা এখন আমাদের তুলে রেখে, আরো তিন দিনের পথ এগিয়ে চ্যান-গু নামের অন্য আরো একটা নগরের কথা বলতে হচ্ছে।

৬০
চ্যান-গু নগর

চ্যান-গু বিশাল এক নগর, এটা দক্ষিণে এবং ক্যাথির ভেতরে অবস্থিত। এটা গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করে এবং মড়া পোড়ায়। সম্রাটের কাগজের মুদ্রা এখানেও প্রচলিত।

এই নগর আর আশপাশের এলাকাজুড়ে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়। আর তা এভাবে প্রস্তুত হয়: এই দেশে একধরনের লবণাক্ত মাটি রয়েছে; সেই মাটির বিশাল গাদার ওপর পানি ঢেলে এর লবণ দ্রবীভূত করে প্রশস্ত পাত্রে সংগ্রহ করা হয়, যার গভীরতা চার ইঞ্চির বেশি নয়। এই পাত্রের পানি সেদ্ধ করলে তা কেলাস আকারে জমাট বাঁধে। আর এ কারণেই এই লবণ সাদা আর উন্নত ধরনের এবং তা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গাতে রপ্তানি করা হয়। এই লবণ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতেরা তাই প্রচুর লাভ করতে পারে এবং গ্রেট খানও এর থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব আদায় করেন।

এই জেলাতে প্রচুর পরিমাণে উত্তম গন্ধযুক্ত পিচ ফলে, যার একেকটার ওজন দুই পাউন্ডের মতো। এবার আমরা চ্যাং-গ্লি নামের অন্য একটা শহরের কথা বলব।

৬১
চ্যাং-গ্লি নগর এবং টুডিন-ফু আর এক বিদ্রোহের কথা

চ্যাং-গ্লিও দক্ষিণে অবস্থিত ক্যাথির একটা শহর, আর এটা গ্রেট খানের মালিকানাধীন; এখানকার অধিবাসীরাও খানের কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করে। চ্যাং-গ্লি থেকে এই শহরে আসতে পাঁচ দিনের মতো লাগে। পথে আগের মতোই গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের আরো অনেক শহর আর প্রাসাদের দেখা মিলবে। এইসব এলাকাজুড়ে বিপুল পরিমাণে বাণিজ্য সংঘটিত হয়, আর সেখান থেকে বড় অঙ্কের রাজস্বও আদায় হয়।

এই শহরের মাঝ দিয়ে প্রশস্ত আর গভীর এক নদী বয়ে গেছে, এই পথে রেশম, ওষুধ এবং আরো অনেক মূল্যবান পণ্যদ্রব্য আনা-নেয়াসহ বিপুল পরিমাণে বাণিজ্য সংঘটিত হয়। এবার আমরা এই জায়গা ছেড়ে টুডিন-ফু নামের অন্য একটা শহরের বর্ণনা তুলে ধরব।

আপনি যখন চ্যাং-গ্লি থেকে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে টানা ছয় দিনের মতো পথ চলবেন, সেই পথে জাঁকজমকে ভরা আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর আর প্রাসাদের দেখা পাবেন, যার অধিবাসীরা প্রতিমা পূজা করে আর মড়া পোড়ায়। এরা ব্যবসা-বাণিজ্য আর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, পণ্যের সরবরাহ প্রচুর। ছয় দিন পর টুডিন-ফু নামের শহরের দেখা মিলবে। আগে এটা জাঁকজমকে ভরপুর এক রাজধানী ছিল, কিন্তু গ্রেট খান অস্ত্রের জোরে একে অধিগ্রহণ করে এই অবস্থায় পর্যবসিত করেন। বর্তমানে একে বাগানে ঘেরা সুন্দর আবাসস্থালে পরিণত করা হয়েছে, সেই বাগান মনোরম সব গুল্ম আর চমৎকার অনেক ফলবান বৃক্ষে ভরপুর। এখানে উন্নত মানের রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এর সীমানাজুড়ে সাম্রাজ্যের আরো এগারোটা নগর আর প্রসিদ্ধ অনেক শহর অবস্থিত, এই জায়গাসমূহের সর্বত্রই বিপুল পরিমাণে বাণিজ্য সংঘটিত হয় এবং রেশমের প্রাচুর্যের কারণে এরা খুবই প্রসিদ্ধ। গ্রেট খানের অধিগ্রহণের পূর্বে এখানে নিজস্ব রাজা কর্তৃক সরকার গঠিত হতো।

১২৭৩ সালে সম্রাট লুক্যানসর নামের তার এক উচ্চপদস্থ অফিসারকে এই শহরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। দেশের এই অংশের নিরাপত্তার জন্য তার অধীনে সত্তর হাজার ঘোড়া রয়েছে। এই অফিসার এখানে আসার পর নিজেকে খুবই উন্নত আর উৎপাদনশীল একটা জেলার প্রধান হিসেবে আবিষ্কার করেন এবং বুঝতে পারেন তার অধীনে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর একটা বাহিনীও রয়েছে। তাই আত্ম-অহমিকার মদে মত্ত হয়ে সে সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দিয়ে তিনি নগরের বিশিষ্ট জনদের প্রভাবিত করেন। এবং এভাবে প্রদেশের সব শহর আর দুর্গে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

গ্রেট খানের কানে এই খবর পৌঁছার পর তিনি আনগুল এবং মনগাটাই নামের দুই সম্ভ্রান্তের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর আগমনের বার্তা জানতে পারার পর, লুক্যানসর কালবিলম্ব না করে বিরোধী পক্ষের সমপরিমাণ জনবলের এক বাহিনী প্রস্তুত করে, খুব দ্রুত অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক হতাহত হয়, কিন্তু অবশেষে লুক্যানসর মারা পড়লে তার সৈন্যরা লড়াই রেখে পলায়ন করতে থাকে। যাদের অনেকেই ধরা পড়ে হত্যার শিকার হন, অনেকেই কারাবরণ করে। এদের গ্রেট খানের সম্মুখে হাজির করে বিচারের আয়োজন করা হয়, ঘটনার মূল হোতাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাকিদের ক্ষমা ঘোষণা করে তার সেবায় বহাল রাখা হয়, আর পরবর্তীতে এদের সবাই তার প্রতি অনুগত থাকে।

৬২
সিনগুই-মাটু নগর

টুডিন-ফু থেকে তিন দিনের পথ দক্ষিণে অগ্রসর হবার সময় অনেক দুর্গ আর শহর নজরে আসবে, জায়গাগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পের উল্লেখযোগ্য

প্রসার ঘটেছে। এ দেশে শিকারের জন্তু-জানোয়ার আর পাখির কোনো অভাব নেই, সেই সঙ্গে জীবনধারণের উপযোগী জিনিসপত্রের সরবরাহও অঢেল।

তিন দিনের ভ্রমণ শেষে সুদৃশ্য, অভিজাত আর প্রকাণ্ড এক নগর সিনগুই-মাটুতে এসে পৌঁছবেন, ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পের জন্য জায়গাটা খুবই প্রসিদ্ধ; এই নগরের সবাই পৌত্তলিক এবং এটা গ্রেট খানের অধীন। এখানে সম্রাটের কাগজের মুদ্রা প্রচলিত। এর ভেতরে খানিকটা দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা প্রশস্ত আর গভীর নদী বয়ে গেছে, যার সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা দুটি খালের সংযোগ করেছে। যার একটা পূর্ব দিকে ক্যাথির দিকে গেছে, আর অন্যটা গেছে পশ্চিমের মানজি প্রদেশের দিকে। এই নদীতে অসংখ্য জলযানের যাতায়াত লক্ষ করা যায়। এটা দুই প্রদেশের সংযোগ হিসেবে কাজ করছে। এর ওপর দিয়ে অবিরাম ধেয়ে চলা মূল্যবান মালামাল বোঝাই প্রকাণ্ড সব অসংখ্য জলযানের চলাচল সত্যিই খুব বিস্ময়কর দৃশ্য।

৬৩
লিনগুই এবং পিনগুই নগরের কথা

সিনগুই-মাটু ছেড়ে দক্ষিণে ষোল দিনের পথে অনবরত বাণিজ্যিক শহর এবং প্রাসাদের দেখা মিলবে। অবশেষে আট দিন পর লিনগুই নগরে এসে পৌঁছবেন। প্রসিদ্ধ এই শহরের লোকেরা যুদ্ধবাজ; সেই সঙ্গে এরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের সঙ্গেও সম্পৃক্ত।

এখানে প্রচুর পশু রয়েছে এবং খাবার-দাবার আর পানীয়েরও কোনো কমতি নেই। লিনগুই পেরিয়ে দক্ষিণে আরো তিন দিন পথ চলার সময় আরো অনেক শহর আর প্রাসাদ চোখে পড়বে, এর সবই গ্রেট খানের অধীনস্ত এলাকাতে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের সবাই পৌত্তলিক, এরা পুড়িয়ে মৃতের সৎকার করে। তিন দিনের ভ্রমণ শেষে পিনগুই নামের মনোরম একটা শহরের দেখা মিলবে, এখানে দরকারি সব কিছুই পাওয়া যাবে। আর এখান থেকে গ্রেট খানের কোষাগারে বড় অঙ্কের রাজস্ব জমা হয়। এর পর সমৃদ্ধ আর ধনী এক দেশের ভেতর দিয়ে টানা দু'দিন আরো দক্ষিণে গেলে চিনগুই নগরের দেখা মিলবে, সুবিশাল এই নগরী ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। এখানকার অধিবাসীদের সবাই পৌত্তলিক এবং পুড়িয়ে মৃতের সৎকার করে। এখানে কাগজের টাকা প্রচলিত এবং এটাও গ্রেট খানের অধিকৃত এলাকার ভেতরে অবস্থিত। এখানে শস্য আর গম প্রচুর পরিমাণে ফলে। আর যে পথ দিয়ে এখানে আসা হলো সেখানে আরো অনেক শহর, উপশহর, প্রাসাদ এবং কাজের উপযোগী চমৎকার একধরনের কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। আর সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে এই নগরের লোকদের হুবহু মিল রয়েছে।

৬৪

কারা-মোরান নামের বিশাল নদী আর কই-গান-জু এবং কুআন-জু নগর

আরো দু'দিন পথ চলা শেষে পথে আবারও বিশাল একটা নদী পড়বে, এই নদীর নাম কারা-মোরান [হলদে নদী], এই অঞ্চলের মালিক ছিলেন প্রেস্টার জন। নদীটা মাইলখানেক প্রশস্ত আর অনেক গভীর এবং এর জলপথে মালামাল বোঝাই বিশাল বিশাল জাহাজ অনবরত চলাচল করছে। এখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বড় মাছ ধরা হয়।

সাগর থেকে মাইলখানেক ভেতরে এই নদীর তীরে পনের হাজার জাহাজ ভিড়ার উপযোগী একটা বন্দর রয়েছে, এ ধরনের প্রতিটা জলযান পনেরটা করে ঘোড়া আর বিশজন যাত্রী পরিবহনে সক্ষম, সেই সঙ্গে নাবিক অন্যান্য জনবলসহ প্রয়োজনীয় মজুদ আর রসদপাতি তো রয়েছেই। আশপাশের ভারতীয় দ্বীপসমূহে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা ত্বরিত মোকাবেলা বা আরো দূরবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জন্য এখানে গ্রেট খানের সেনাবাহিনীর একটি অংশকে সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়। জাহাজগুলো যেখানে তীরের খুব কাছাকাছি নোঙর করে থাকে সেখান থেকে খুব কাছেই, কই-জান-জু নামের বিশাল এক নগর রয়েছে, এর বিপরীতে আরো একটা ছোট্ট শহর আছে, যার নাম কুয়ান-জু।

এই নদী পেরিয়ে এলে আপনি অভিজাত প্রদেশ মানজিতে প্রবেশ করবেন; তবে এমনটা ধরে নেয়া মোটেই উচিত হবে না যে ক্যাথি প্রদেশের সব কিছুর বর্ণনা দেয়া হয়ে গেছে। আসলে এর বিশ ভাগের এক ভাগও এখানে আমি তুলে ধরতে পারিনি। এই প্রদেশের মাঝ দিয়ে ভ্রমণ করার সময়, মার্কো পলো কেবল তার চলার পথে পড়েছে এমন কিছু শহরের কথা বলেছেন এবং এর আশপাশে অবস্থিত জায়গাগুলোর কথা বাদ দিয়েছেন। একইভাবে মধ্যবর্তী অনেক জায়গার কথাও বলা সম্ভব হয়নি, কেননা তাতে বর্ণনার ভারে পাঠকের মনে বিরক্তির উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় আর সেটা খুব বড় ধরনের কাজ এবং অনেক পরিশ্রমসাধ্যও বটে। এসব কথা রেখে এবার মানজির প্রদেশ প্রসঙ্গে বলা যাক। প্রথমেই, মানজি প্রদেশ জয় এবং তারপর এর জাঁকজমকপূর্ণ ধনাঢ্য শহরসমূহ এবং আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য আরো কিছু অংশের বর্ণনা তুলে ধরছি।

৬৫

সবচাইতে অভিজাত প্রদেশ মানজি এবং গ্রেট খান যেভাবে তা জয় করেন

পুবের বিশ্বের কাছে মানজি সবচাইতে জাঁকজমকপূর্ণ এবং ধনাঢ্য প্রদেশ হিসেবে পরিচিত। আগে এটা ফ্যাকফার নামের এক রাজার অধীন ছিল, গ্রেট খান ছাড়া পরাক্রম আর সম্পদের দিক দিয়ে তিনি অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবে

তিনি ছিলেন শান্তিকামী, আর কাজেকর্মে ছিলেন খুবই সদাশয়। জনগণ তাকে খুবই ভালোবাসত এবং বড় বড় নদ-নদী বেষ্টিত তার রাজত্ব এতই দুর্ভেদ্য আর শক্তিশালী ছিল যেকোনো বহিঃশত্রুর পক্ষে তাকে বিরক্ত করা ছিল একটি অসম্ভব ঘটনা। আর এ কারণেই তিনি সামরিক বিষয়াদিতে অতটা মনোযোগ দেননি, এমনকি জনগণকে পর্যন্ত সামরিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেননি।

তার শাসিত অঞ্চলের গভীর পরিখা পরিবেষ্টিত শহরগুলোও ছিল লক্ষণীয়ভাবে সুরক্ষিত, পানিপূর্ণ এইসব পরিখার দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে তীরে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। আর আক্রমণে বিশ্বাস না করায় নিজের জন্য তিনি কোনো অশ্বারোহী সেনা দলও গঠন করেননি। কী করে নিজের জন্য আরো বেশি আরাম-আয়েশ আর আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করা যায় এত সব নিয়েই তিনি বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন। রাজপ্রাসাদে তিনি এক হাজারের ওপরে অনন্য সুন্দরী নারী রাখতেন এবং খুশি মনে তাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। তিনি শান্তি এবং ন্যায়তার একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, কঠোর হস্তে দেশ শাসন করতেন। কারো হাতে কেউ সামান্য পরিমাণে অবমাননার শিকার বা আহত হলে তার সঠিক বিচার নিশ্চিত করতেন। এভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কারণে দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে পণ্য বোঝাই কোনো দোকান মালিকের অবহেলার কারণে খোলা অবস্থায় পড়ে থাকলেও কেউ সেখানে ঢুকতে বা তার থেকে সামান্য পরিমাণে কোনো-কিছু নেবার সাহস দেখাত না। দিন-রাত যেকোনো সময় দেশের যেকোনো অংশে বিপদের ভয় না করে পর্যটকেরা অবাধে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ছিলেন ধার্মিক এবং দানশীল। অসহায় মায়েরা সন্তান পালনে অক্ষম হলে তিনি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন এবং বছরে এমন বিশ হাজারের ওপর শিশুর দায়িত্ব নিতেন। সেই ছেলেমেয়েরা বড় হবার পর তাদের বিয়েথা দিতেন।

এই ফ্যাকফার এবং কুবলাই খানের মেজাজ-মর্জি আর আচরণের মাঝে ছিল বিশাল ব্যবধান, যুদ্ধবাজ তাতার সম্রাট দেশ জয় আর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির মাধ্যমে আনন্দ পেতেন। বেশ কিছু প্রদেশ আর রাজত্ব নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর তিনি বশীভূত করার জন্যে মানজির দিকে অগ্রসর হন, আর এই উদ্দেশ্যে তিনি চীন-সান-বাই-এন নামের এক জেনারেলের নেতৃত্বে অসংখ্য অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনা জড়ো করেন, সুবিশাল এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী এই জেনারেলের নামের মানে হলো 'শত চক্ষু'। এটা ১২৬৪ সালের ঘটনা।

তার অধীনে বেশ কিছুসংখ্যক জাহাজ দেয়া হয়, তাতে করে তিনি মানজি আক্রমণে অগ্রসর হন। নামার পর, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানকার কই-জান-জু নগরের অধিবাসীদের তার সার্বভৌমের কর্তৃপক্ষের আত্মসমর্পণের ঘোষণা জারি

করেন। এই আদেশ অগ্রাহ্য করার পরও কাউকে হত্যার নির্দেশ না দিয়েই তিনি পরবর্তী শহরের দিকে অগ্রসর হন এবং এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ শহরে গিয়ে একই জবাব পান। এভাবে পেছনের অসংখ্য শহরের মতো আর কোনোটাকে ছেড়ে আসা বিচক্ষণতার লক্ষণ মনে না করায়, সেগুলোর একটাতে তিনি আক্রমণ করে বসেন, যদিও দেশ থেকে গ্রেট খানের পাঠানো সমশক্তির আরো একটি বাহিনী অনতিবিলম্বে তার সঙ্গে যোগ দিবে তখনো মনে মনে এমন আশা করছিলেন। প্রচণ্ড চেষ্টা-চরিত আর নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে হাজির হবার পর, সেখানে থাকা সবাইকে তরবারির নিচে পড়তে হয়েছে।

এই খবর অন্যান্য শহরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীরা ভয়ে বিহ্বল হয়ে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের ঘোষণার জন্য তাড়া দিতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বাহিনীর দুই অংশকে একত্রিত করে একসঙ্গে কিনসাই নগরে অবস্থিত ফ্যাকফারের রাজকীয় প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আগে কখনো যুদ্ধ দেখেননি বা যুদ্ধের মতো কোনো বিষয়ে সম্পৃক্ত হননি বলে, তিনি অস্থির আর ভীত হয়ে পড়েন। নিজের নিরাপত্তায় চিন্তিত হয়ে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা জাহাজে করে পলায়ন করেন। এবং যথা শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার নির্দেশনা প্রদান করে তার রানির কাছে শহরের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যান। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে নারী হবার কারণে রানি শত্রুর হাতে বন্দি হলেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। সমুদ্রপথে অগ্রসর হয়ে তিনি নির্দিষ্ট সুরক্ষিত দ্বীপে গিয়ে পৌঁছান এবং আমৃত্যু সেখানেই কাটিয়ে দেন।

এভাবে রানিকে রেখে চলে যাবার পর, তিনি জানতে পারেন একবার রাজাকে তার জ্যোতিষীরা বলেছিলেন যে শতচক্ষু সেনানায়ক ব্যতীত আর কেউ তার সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিতে পারবে না। তবু প্রতিদিন রাজধানী আরো বেশি বিপদের নিকটবর্তী হতে থাকে, কিন্তু এমন ঘোষণার কথা জানার পর তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং ভাবেন মরণশীল কারো এতসংখ্যক চোখ থাকতে পারে না বলে, একে কিছুতেই পদানত করা সম্ভব নয়। কিন্তু শত্রু পক্ষের সেনানায়কের নাম জানতে চাইলে তাকে জানানো হয় তার নাম চীন-সান-বাই-এন, যার মানে এক শত চোখ, এ কথা শোনোর পর তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তার মনে হতে থাকে এই সেই লোক, যার কথা জ্যোতিষীরা বলেছিলেন, যিনি তার স্বামীকে তার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিবেন। ভয়ে তিনি কোনো প্রকার প্রতিরোধের চেষ্টা না করে সরাসরি আত্মসমর্পণ করেন।

এভাবে রাজধানী নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর, তাতাররা যথাশীঘ্র প্রদেশের বাকি অংশ তাদের অধীনে নিয়ে আসেন। রানিকে কুবলাই খানের সম্মুখে হাজির করার জন্য প্রেরণ করা হয়, সেখানে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং সম্রাটের নির্দেশে, তার পদমর্যাদা রক্ষা হতে পারে সেই পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ

করা হয়। এভাবে মানজি বিজয় বৈধতা পায়। এবার আমরা এই প্রদেশের বিভিন্ন শহরের কথা বলব, আর যার প্রথমটির নাম কই-জান-জু।

৬৬
কই-জান-জু নগর

কই-জান-জু খুবই মনোরম আর সম্পদশালী নগর, মানজি প্রদেশের প্রবেশমুখের দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্ব দিকে এর অবস্থান, কারা-মোরান [হলদে নদী-এর তীরের কাছাকাছি হবার কারণে এখান দিয়ে অনবরত অসংখ্য জাহাজের যাতায়াত। নদীপথে বিভিন্ন জায়গাতে পণ্য পরিবহনের সুবিধার কারণে বণিকেরা এখান দিয়ে বিপুল পরিমাণ মালামাল নিয়ে যাতায়াত করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়। কেবল নগরের লোকেরাই তা ভোগ করে না, বরং এখান থেকে অন্যান্য জায়গাতেও এই লবণ রপ্তানি করা হয়; এবং এর থেকে গ্রেট খান মোটা অংকের রাজস্ব পেয়ে থাকেন।

৬৭
পা-ঘিন শহর আর কাইন নগর

কই-জান-জু থেকে দক্ষিণ-পূর্বে চমৎকার একটা পাথুরে পায়ে চলার পথ মানজি প্রদেশের দিকে গেছে, এই পথ ধরে টানা এক দিন পথ চলার সময়ে এর দু'ধারে সুবিশাল হ্রদ দেখতে পাওয়া যায়, গভীরতার কারণে এরা নৌযান চলাচলের উপযোগী। এটি ছাড়া এই প্রদেশে প্রবেশের আর কোনো পথ নেই। তবে নৌপথে যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে; এবং এভাবেই গ্রেট খানের সেনানায়ক তার সমস্ত বাহিনী নিয়ে এখানে সক্রিয়ভাবে অবতরণ করে হানা দেয়।

এক দিন পথ চলা শেষ হলে, আপনি পাউ-ঘিন নামের গুরুত্বপূর্ণ এক শহরে এসে উপস্থিত হবেন। এখানকার অধিবাসীরা প্রতিমা পূজারি, মড়া পোড়ায়, কাগজের টাকা ব্যবহার করে এবং এটা গ্রেট খানের অধীন। ব্যবসা-বাণিজ্য আর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে; এদের প্রচুর রেশম রয়েছে এবং এরা স্বর্ণের কাপড় বোনে। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

পাউ-ঘিন থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এক দিনের দূরত্বে, প্রকাণ্ড আর সু-নির্মিত কাইন নগর দণ্ডায়মান। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্প উৎপাদনের বিপুল প্রসার ঘটেছে। তাদের মাছেরও প্রাচুর্য রয়েছে এবং শিকারের উপযোগী পশু-পাখিরও। বিশেষ করে লম্বা লেজওয়ালা রঙিন পাখি এখানে প্রচুর রয়েছে, আর ময়ূর আকৃতির এমন তিনটি পাখি কিনতে আপনাকে খরচ করতে হবে মাত্র ভেনিসিয়ান গ্রোট সমমানের এক রৌপ্য মুদ্রা।

৬৮
টিন-গুই, চীন-গুই এবং মার্কো পলো গভর্নর হন সেই উয়ান-গুই নগর

শেষবার উল্লেখ করা জায়গা থেকে এদিনের পথে অসংখ্য গ্রাম আর ক্ষেত-খামার পেরিয়ে আসার পর, আপনি টিন-গুই নামের একটা শহরে এসে পৌঁছবেন, আকৃতিতে খুব একটা বড় না হলেও জায়গাটা জীবনধারণের দরকারি সব জিনিসপত্রে ভরপুর। লোকেরা ব্যবসায়ী এবং তাদের অসংখ্য বাণিজ্য তরী রয়েছে। এখানে প্রচুরসংখ্যক পশু-পাখি রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থানের কারণে, এখান থেকে পুবে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করতে আপনি সমুদ্রের দেখা পাবেন। আর সেই মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেক লবণ তৈরির জায়গা দেখবেন, যেখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদিত হয়।

এরপর আপনি এসে হাজির হবেন বিশাল এবং সু-নির্মিত চীন-গুই শহরে, এখান থেকে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লবণ সরবরাহ হয়। এখান থেকে গ্রেট খানের যে পরিমাণ রাজস্ব আয় হয় সেই কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার এই একটি মাত্র পণ্য। এখানের লোকেরাও প্রতিমা পূজারি, কাগজের টাকা ব্যবহার করে এবং সম্রাটের অধীন।

চীন-গুই থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হলে, আপনি ইয়ান-গুই [ইয়াং-চাও] নামের এক গুরুত্বপূর্ণ শহরে এসে হাজির হবেন, এই সীমানার মাঝে মোট চব্বিশটি শহর রয়েছে, তাই এর থেকেই এখানকার প্রভাব আর প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এটি গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা পৌত্তলিক, ব্যবসা-বাণিজ্য আর হাতের কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে অস্ত্র এবং সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হয়; এরই প্রেক্ষিতে দেশের এই অংশে অনেক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।

প্রাদেশিক সরকার পরিচালনার জন্য সম্রাট কর্তৃক নিয়োগ দেয়া সম্ভ্রান্ত যে বারো জনের কথা আগে বলা হয়েছে, তাদের একজনের বাসস্থান এখানে অবস্থিত; এবং এখানকার একটিতেই মার্কো পলো গ্রেট খানের বিশেষ নির্দেশ অনুসারে টানা তিন বছর সিটি গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

৬৯
নান-ঘিন অঞ্চল

নান-ঘিন [নান-কিং] মানজি প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিশাল এক এলাকা, জায়গাটা পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা প্রতিমা পূজারি, এরা কাগজের টাকা ব্যবহার করে, গ্রেট খানের অধীন এবং বেশিরভাগই ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের কাঁচা রেশম আছে এবং প্রচুর পরিমাণে রুপা আর সোনার বিভিন্ন

ধরনের কাপড় বোনে। এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভুট্টার আবাদ হয় এবং গৃহপালিত গবাদিপশুসহ শিকারের উপযোগী অসংখ্য পশু-পাখি রয়েছে, আর বাঘের সংখ্যাও অঢেল। এখান থেকে সম্রাটের যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব আয় হয়, যার বেশিরভাগই আসে বণিকদের আমদানিকৃত মূল্যবান সব পণ্য থেকে। এবার আমরা প্রসিদ্ধ শহর সা-ইয়ান-ফু-এর কথা বলছি।

৭০
সা-ইয়ান-ফু নগর আর যেভাবে নিকোলো ও মাফিও পলো এখানে আসেন

সা-ইয়ান-ফু মানজি প্রদেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নগর, এর সীমানার ভেতরে সম্পদশালী বড় বড় বারোটি শহর রয়েছে। জায়গাটা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ ব্যাপক উৎপাদনশীল। অধিবাসীরা মড়া পোড়ায় আর পৌত্তলিক। তারা গ্রেট খানের অধীন এবং তার কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম উৎপাদিত হয়, আর মিহি রেশমের সঙ্গে সোনার মিশ্রণে কাপড় বোনা হয়। সব ধরনের শিকারও অঢেল রয়েছে। বিশাল এই নগর প্রয়োজনের সব ধরনের জিনিসপত্রে পরিপূর্ণ থাকায় এবং বিরল ক্ষমতার কারণে, তিন বছর পর্যন্ত পতন ঠেকাতে সক্ষম হয়; এমনকি মানজি পতনের পরও তা গ্রেট খানের বশ্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

উত্তর দিক ছাড়া বাকি তিন দিক জল বেষ্টিত হওয়ায় এর কাছাকাছি যেতে না পারায় অবরোধ তৈরিতে সেনাবাহিনীকে সমস্যায় পড়তে হয়। অভিযান সম্পর্কে গ্রেট খানকে অবহিত করার পর, তিনি মনে প্রচণ্ড আঘাত পান এই ভেবে যে সমস্ত প্রদেশ তার কাছে পদানত হবার পর শুধু এই জায়গাটিই বাকি রয়ে গেল।

নিকোল এবং মাফিও, এই দুজন ভাই তখন কুবলাই খানের প্রাসাদেই ছিলেন, তাই তারা সেসব কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের সামনে হাজির হন এবং এমন একটা যন্ত্র বানাবার অনুমতি চান যা দিয়ে সেই শহরের পশ্চিম দিক থেকে তিন শত পাউন্ড ওজনের পাথর ছুড়া যাবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে শহরের দালানগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে লোকজনকে হত্যা করা যাবে। সেই অনুরোধ অনুমোদন করে গ্রেট খান তাদের অধীনে যথাযথ কারিগর নিয়োগ করার নির্দেশ দেন; বেশ কয়েকজন নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান এ ধরনের কাজে পারঙ্গম হওয়ায় তাদের মাঝ থেকে লোক নিয়োগ দেয়া হয়।

দুই ভাইয়ের নির্দেশনা অনুসারে কয়েক দিনের মধ্যেই মঙ্গলেস নামের যন্ত্র বানানো সম্পন্ন হয়; এবং গ্রেট খানসহ দরবারের সবার উপস্থিতিতে সেই যন্ত্রের মাধ্যমে তিন শত পাউন্ডের পাথর ছুড়ার মহড়া প্রদর্শন করা হয়। এরপর সেগুলোকে রণতরীতে করে সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।

যখন সা-ইয়ান-ফু নগরের সম্মুখ দিকে স্থাপন করে সেটা থেকে প্রথম পাথরখানা ছোঁড়া হয়, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়ে তা একটা দালানে আঘাত করে আর তার বিশাল একটা অংশ ভেঙে খান খান হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এতে করে সেখানকার অসহায় অধিবাসীরা অসম্ভব রকমের ভড়কে যায়, তাদের কাছে মনে হয় এই বুঝি স্বর্গ থেকে বজ্রনির্ঘোষ নেমে এলো, তাই তারা তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রদেশের বাকি অংশ যেসব শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে সেসব মেনে নিয়ে নিজেদের সঁপে দেবার জন্য তারা যথাযথ লোকেদের প্রেরণ করে।

এমন তাৎক্ষণিক ফল লাভের কারণে গ্রেট খানসহ সারা দেশের মানুষের কাছে এই ভেনিসিয়ান দুই ভাইয়ের গ্রহণযোগ্যতা আর কদর অনেক বেড়ে যায়।

৭১
সিন-গুই নগর আর বিশাল নদী কিয়ান

সা-ইয়ান-ফু নগর ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে ষোল দিন গেলে আপনি সিন-গুই শহরে পৌঁছবেন, তেমন একটা বড় না হলেও জায়গাটা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে খুবই প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নদী কিয়াং [ইয়াং-সি কিয়াং]-এর খুব কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এখানকার লোকেরা অসংখ্য অতিকায় বাণিজ্য জাহাজের মালিক। কোথাও কোথাও এই নদীর বিস্তার ছয়, আট বা দশ মাইলেরও বেশি। আর সাগর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এক শত দিনের দূরত্ব। দূর দেশে থেকে উৎপন্ন হয়ে আরো অসংখ্য নাব্য নদ-নদীর জলধারা পথে এর সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, এটি এমন প্রকাণ্ড আকার ধারণ করেছে।

এর অববাহিকায় অসংখ্য নগর আর বড় বড় শহর-বন্দর অবস্থিত, সংখ্যায় যা দু'শর বেশি হবে এবং ষোলটি প্রদেশ এর নাব্যতার সুবিধা ভোগ করছে। এমনকি কখনো চোখে দেখার সুযোগ হয়নি তাদের পণ্যও এর ওপর দিয়েই যাতায়াত করে, এর থেকেই এই নদীর বাণিজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আর এর বিশাল দৈর্ঘ্য এবং অন্য যেসব নদী এতে মিলিত হয়েছে তাদের সবগুলোকে আমলে নেয়া হলে এর ওপর চতুর্দিক থেকে আসা মালামাল নিয়ে যাতায়াত করা বাণিজ্য জাহাজগুলোর পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য সত্যিই বিস্ময়কর ঠেকবে। তবে এর মাঝে প্রধান পণ্য হলো লবণ, কেবল সম্রাটের জন্যই নয়, এর সঙ্গে মিলিত হওয়া সব নদীপথেই পণ্যটি তাদের অববাহিকাতে অবস্থিত শহরগুলোতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আর সেখান থেকে পরে দেশের আরো ভেতরে দূর-দূরান্তে সেটি পৌঁছে যায়।

একবার কোনো একটা কাজে মার্কো পলোর সেখানে যাবার সুযোগ হয়েছিল, তখন সে সেখানে কম করে হলেও এ রকম পনের হাজার মালামাল বোঝাই

জাহাজ দেখেছেন; এবং তখন নদীর দু'ধারের অন্য শহরগুলোতে এদের সংখ্যা এরচেয়ে অনেক বেশিই ছিল। বিশাল সেই জলযানের সবগুলোই একধরনের পাটাতনে আবৃত ছিল, আর একটা করে পালসহকারে মাস্তুল। সাধারণত এর সবগুলোতেই চার হাজার ক্যান্টারি বা ভেনিসের কুইন্টাল ওজনের মালপত্রে ঠাসা ছিল। এবং এর কোনো তরী বারো হাজার ক্যান্টারি [৫০০ টন] মালামাল বোঝাই করতে সক্ষম ছিল। মাস্তুল আর পাল ছাড়া এর অন্য কোথাও এরা শণের দড়ি ব্যবহার করে না। এদের এখানে পনের কদম দৈর্ঘ্যের একধরনের বেত আছে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে, লম্বালম্বিভাবে এর পুরোটাকে অতি সরু আকারে আলাদা করা হয় এবং সেগুলোকে একসঙ্গে জড়িয়ে তারা শত কদম দৈর্ঘ্যের একধরনের দড়ি প্রস্তুত করে। এমন দক্ষতার সঙ্গে সেগুলো তৈরি করা হয় যে তা শণের দড়ির মতোই পোক্ত হয়।

এই দড়ির সাহায্যে জলযানগুলোকে নদীপথে টেনে আনা হয়, এভাবে প্রায় দশ থেকে বারো ঘণ্টা সময় লাগে। নদী তীরের অসংখ্য জায়গাতে বড় বড় পাহাড় আর পাথুরে ঢিবির ওপর পৌত্তলিকেরা তাদের মন্দির আর অন্যান্য সৌধ নির্মাণ করেছে, আর তার চারপাশে বিস্তৃত গ্রাম এবং জনবসতি দেখতে পাওয়া যায়।

৭২
কিয়ান-গুই নগর

এই নদীর দক্ষিণ অববাহিকায় অবস্থিত কিয়ান-গুই ছোট্ট একটা শহর, প্রতি বছর এখানে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা আর ধান সংগৃহীত হয়, যার বেশিরভাগই সরবরাহের জন্য এখান থেকে কানবালু নগরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রদেশসমূহের মাঝে অবাধে জাহাজ চলাচলের পথ তৈরি করতে গ্রেট খান নদী আর হ্রদগুলোর মাঝে জলযান চলাচলের উপযোগী গভীর সংযোগ খাল খনন করিয়েছেন, তাতে করে সমুদ্রে না গিয়েই কানবালুর মতোই মানজি থেকে নদীপথে ক্যাথি যাওয়া যায়।

চমৎকার এই কাজ প্রশংসার দাবিদার; এবং এভাবে দেশের ভেতরে বা সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে যত দূর পর্যন্ত এর বিস্তার ঘটেছে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেখানকার উৎপাদিত দ্রব্য আশপাশের শহরগুলোতে পৌঁছে যায়। একইভাবে, এর পাশ দিয়ে উঁচু বাঁধের আকারে মজবুত প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, যার ওপর দিয়ে স্থলপথে সুবিধাজনক জায়গাতে যাতায়াত সম্ভব।

কিয়ান-গুই শহরের বিপরীত দিকে নদীর ঠিক মাঝখানে পুরোপুরি পাথরের একটা দ্বীপে, বিশাল একটা মন্দির আর মঠ নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে দুই শত সন্ন্যাসী অবস্থান করে প্রতিমা পূজায় রত আছেন। এটা অন্যান্য আরো অনেক মন্দির আর আশ্রমের মাঝে প্রধানতম। এবার আমরা চ্যান-ঘিয়ান-ফু নগরের কথা বলব।

৭৩
চ্যান-ঘিয়ান-ফু নগর

চ্যান-ঘিয়ান-ফু নগর মানজি প্রদেশের একটা শহর, এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, গ্রেট খানের অধীন এবং এরা তার কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এবং এরা সম্পদশালী। এরা স্বর্ণসহকারে রেশমের বস্ত্র বয়ন করে। শিকারের সব ধরনের প্রজাতিই এখানে প্রচুর পাওয়া যায়।

এই শহরে তিনটি নেস্টরিয়ান চার্চ রয়েছে, ১২৭৮ সালে এসব নির্মাণ করা হয়, সে সময় সম্রাট মার-স্যাচিস নামের নেস্টরিয়ানকে তিন বছরের জন্য সরকারে নিয়োগ প্রদান করেছিলেন। তিনিই এসব চার্চ নির্মাণ করিয়েছেন। আজও সেগুলো সদর্পে টিকে আছে। এর আগে এখানে এ রকম কিছু ছিল না। এ জায়গা ছেড়ে এসে এবার আমরা টিন-গুই-গুই-এর কথা বলছি।

৭৪
টিন-গুই-গুই নগর

চ্যান-ঘিয়ান-ফু নগর ছেড়ে এসে, দক্ষিণ-পূর্বে চার দিন পথ চলার সময় আরো অনেক শহর আর দুর্গ নজরে আসবে, সেখানকার অধিবাসীরা প্রতিমা উপাসক, হাতের কাজ আর ব্যবসা করে জীবনধারণ করে, গ্রেট খানের অধীন এবং তার কাগজের মুদ্রা ব্যবহার করে। এই চার দিনের পথ চলার পর, আপনি টিন-গুই-গুই শহরে এসে হাজির হবেন। শহরটা খুবই বিশাল আর সুন্দর, এখানে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয়, যার থেকে নানা রকমের আর মানের বস্ত্র তৈরি হয়। এখানে প্রয়োজনের সব জিনিসপত্র অঢেল রয়েছে এবং সেই সঙ্গে চমৎকার সব শিকারেও সন্ধান মেলা সম্ভব।

তবু এখানকার অধিবাসীরা এক বিশ্রী স্বভাবের, নৃশংস জাতি। চীন-সেন বে-ইয়ান বা সেই শত চক্ষু সেনানায়ক মানজি পদানত করতে আসার পর, শহরটির দখল নেবার জন্য এলান নামের এক খ্রিস্টানের নেতৃত্বে তার লোকেদের সেখানে পাঠান। পৌঁছার পর তারা কোনো প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই তৎক্ষণাৎ এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। জায়গাটা পরপর দুটা দেয়ালে ঘেরা, যার একটার ভেতরে আরেকটা, এলান প্রথমে প্রথম ঘেরটার দখল সংহত করে, সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণে ওয়াইনের সন্ধান পান, আর আগে থেকেই পরিশ্রান্ত আর অবসাদগ্রস্ত হবার কারণে আগপাছ কোনো কিছু না ভেবেই তারা নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য সবাই সেদিকে অগ্রসর হয়। আর মাতাল হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ে। তখন দ্বিতীয় ঘেরের ভেতরে থাকা শহরের লোকেরা তাদের শত্রু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে

আছে সেটা বুঝতে পারার পর, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের হত্যা করে, একজনকেও পালিয়ে বাঁচার সুযোগ দেয় না। বিচ্ছিন্ন এই দলটির ভাগ্যে কী ঘটেছে সেটা জানার পর চীন-সেন বে-ইয়ান-এর ক্রোধ চরমে ওঠে এবং জায়গাটাকে আক্রমণ করার জন্য তিনি আরো একটি বাহিনী পাঠান। আর সেটা হস্তগত করার পর, প্রতিশোধ হিসেবে, তিনি সেখানকার নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাইকে নির্বিশেষে হত্যা করার আদেশ দেন।

৭৫
সিন-গুই এবং ভা-গিউ নগর

সিন-গুই [সুচৌ] বিশাল এক উৎপাদনশীল শহর, বিশ মাইল এলাকাজুড়ে যার বিস্তৃতি। এখানকার লোকেদের কাছে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম রয়েছে, আর সবাই রেশমের কাপড় পরে বলে কেবল নিজেদের জন্যই এরা এর থেকে রেশম প্রস্তুত করে না, বরং অন্যান্য বাজারেও* এখানকার রেশম বিক্রয় হয়। এখানকার লোকেদের মাঝে বিত্তবান অনেক বণিক আছেন এবং অধিবাসীদের মাঝে তাদের সংখ্যা এতই বেশি যে তা দেখে যে কেউ অবাক হবেন। তবে জাতি হিসেবে এরা কাপুরুষ, নিজেদের কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য আর উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। সত্যি বলতে কী, এ ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং এদের মাঝে আচার-ব্যবহারে উদ্যোগী, পুরুষালী, যুদ্ধংদেহী আর উদ্ভাবন কুশল লোকও প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, তবে তারা কেবল প্রদেশ নিয়েই ব্যস্ত নয়, বরং তাদের চিন্তা-চেতনা নিয়ে আরো দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

এদের মাঝে অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, যারা রোগের প্রকৃত কারণ এবং সঠিক উপশম সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। এদের মাঝে বিখ্যাত অনেক জ্ঞানী লোকও আছেন, বা আমাদের ভাষায় তাদের দার্শনিক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এবং অন্য আরেকটা দলকে হয়তো জাদুকর বলা যাবে।

শহরের কাছাকাছি পাহাড়গুলোতে উন্নতমানের রেউচিনির লতা জন্মে, আর এখান থেকে তা প্রদেশের বাকি অংশে যায়। একইভাবে প্রচুর আদাও উৎপন্ন হয় এবং তা এতই সস্তা যে চল্লিশ পাউন্ড তাজা মূল তাদের মুদ্রার সমমানের এক ভেনিসিয়ান রৌপ্য গ্রোটের বিনিময়ে পাওয়া সম্ভব।

সিন-গুই-এর সীমানার ভেতরে ষোলটি প্রসিদ্ধ এবং সম্পদশালী নগর আর শহর বিদ্যমান, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পের প্রসার ঘটেছে। সিন-গুই শব্দের দ্বারা বোঝায় "ধরিত্রীর নগর", একইভাবে কিন-সাই মানে, "স্বর্গের

---

* আজো সুচৌ অন্যতম এক রেশম কেন্দ্র। এখানকার চয়নকারী নানকিন এবং সুচাও নামের দুটা শক্তিশালী ভাগে বিভক্ত। এবং তাদের অধীনে সাতহাজার ব্যস্ত তাঁত রয়েছে।

নগরী"। সিন-গুই-এর প্রসঙ্গ রেখে এবার আমরা অন্য এক শহরের কথা বলছি, এখান থেকে এক দিনের পথ, নাম ভা-গিউ, সেখানেও আগের মতোই প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম পাওয়া যায় এবং সেখানেও অসংখ্য বণিক আর কারিগর রয়েছে। উন্নত মানের রেশম প্রস্তুতের পর সেখান থেকে তা প্রদেশের সর্বত্র বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই শহর নিয়ে আলাদা করে আর তেমন কিছু বলার নেই, এবার আমরা মানজি প্রদেশের প্রধান শহর এবং মহানগরী কিন-সাই-এর বর্ণনা তুলে ধরছি।

৭৬
অভিজাত এবং জাঁকজমকের কিন-সাই নগর

ভা-গিউ ছেড়ে আসার পর তিন দিনের পথে, লোকজনে ঠাসা বিত্তবান অনেক শহর, প্রাসাদ, আর গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়। এইসব লোকেদের কাছে অঢেল দ্রব্যসামগ্রী রয়েছে। তিন দিন শেষে পৌঁছবেন অভিজাত আর জাঁকজমকে ভরপুর কিন-সাই নগরে [রাজধানী; হ্যাং-চু], এই নামের মানে "দিব্য নগরী" এবং এর উৎকর্ষতার খ্যাতি অনেক আগে থেকেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, এর বিশালতা এবং সৌন্দর্য সেই সঙ্গে অসম্ভব ধরনের আনন্দের উৎসের কারণে এখানকার লোকেরা নিজেদের স্বর্গের অধিবাসী ভাবতে বাধ্য।

মার্কো পলোকে এই শহরে প্রায়ই আসতে হতো, তিনি খুব নিবিড়ভাবে এবং আনন্দের সহিত এখানকার সব ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করেছেন, যার সব কিছুই তার ডায়েরিতে উল্লেখ রয়েছে। আর সেখান থেকেই অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বেশ কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। সাধারণ বিবেচনায় শহরটি শত মাইল বিস্তৃত। এর সড়ক আর খালগুলো খুবই প্রশস্ত এবং খোলা মাঠ আর বাজারগুলো বিপুল লোকসমাগম অনুপাতে খুবই চওড়া। শহরটা একটা হ্রদ আর নদীর মাঝখানে অবস্থিত। এই হ্রদের স্বাদু পানি খুবই স্বচ্ছ, আর অপর পাশের নদী খুবই প্রসারিত, শহরের সকল প্রান্ত থেকে ছোট-বড় খাল এসে এতে মিলিত হয়েছে, এদের মাধ্যমে হ্রদ হয়ে শহরের সব নোংরা আবর্জনা নদীতে এসে পড়ে এবং সবশেষে সাগরে গিয়ে মিশে। স্থলপথের মতোই জলপথেও শহরের সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে। খাল আর সড়কগুলো যথেষ্ট প্রশস্ত, অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহনের জন্য এর একটিতে মালামাল বোঝাই তরী, আর অন্যটিতে ঘোড়ার গাড়ি খুব সহজেই চলাচল করতে পারে।

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, ছোট-বড় মিলিয়ে এখানে বারো হাজারের মতো সেতু রয়েছে। প্রধান প্রধান খালের ওপর থেকে যেগুলো মূল সড়কগুলোকে সংযুক্ত করে আছে, এগুলোর খিলান খুবই উঁচু এবং সবগুলোই প্রচণ্ড দক্ষতার সঙ্গে নির্মিত হয়েছে, ফলে জলযানগুলোর মাস্তুল এর নিচ দিয়ে যেতে পারে। সেই

সঙ্গে এর ঢাল বেয়েও খুব সহজেই এক্কাগাড়ি আর ঘোড়া চলাচল করতে পারে। আর পারাপারের এমন অসংখ্য সেতু না থাকলে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে চলাচলের কোনো উপায় থাকত না।

শহর থেকে দূরে, এর সীমানা প্রাচীর ঘিরে, চল্লিশ মাইল দৈর্ঘ্যের খুব প্রশস্ত একটা পরিখা রয়েছে, সেই নদী থেকে পানি এসে একে সবসময় ভরাট রাখে। নদীর অতিরিক্ত জল খালের মাধ্যমে সরিয়ে নেবার জন্যেই প্রদেশের এক প্রাচীন রাজা এটা খনন করিয়েছিলেন। একই সঙ্গে এটা শহরের প্রতিরক্ষার কাজও করছে। এর খনন করা মাটি ভেতরের দিকে ফেলা হয়েছে, আর সে কারণেই এর আশপাশে পাহাড়ের মতো ছোট ছোট ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়।

শহরে দশটা বড় আকারের বাজার রয়েছে, এর পাশাপাশি সড়কের দু'পাশেও রয়েছে অসংখ্য দোকানপাট। বাজারগুলোর এক একটা আধ মাইলের মতো চওড়া, যার সামনে রয়েছে চল্লিশ কদম প্রশস্ত প্রধান সড়ক, আর সেটা সোজা পাশের শহরে গিয়ে মিলেছে। এদের একটি থেকে অন্যটির দূরত্ব চার মাইল। এদের সামনের দিকে মূল সড়ক থাকলেও পেছন দিয়ে বয়ে গেছে খুব বড় আকারের একটা খাল, এর প্রশস্ত তীরের দিকটা পাথরে বাঁধাই করা। ভারতসহ অন্যান্য জায়গা থেকে মালামাল নিয়ে আসা বণিকদের জায়গা করে দেবার জন্যই তা বাজারের সুবিধাজনক স্থানে এভাবে তৈরি করা হয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন এখানে চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার লোক জড়ো হয় এবং প্রয়োজনের সব মালামাল আর দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ ও কেনাবেচা করে।

বেঁটে পুরুষ হরিণ, শূকর, অন্যান্য বুনো হরিণ, খরগোশ, সেই-সঙ্গে তিতির, বড় লেজওয়ালা পাখি, বাজ, কোয়েল, সাধারণ মোরগ, ছিন্ন-মুষ্ক মোরগ, পাঁতিহাস, রাজহংসসহ আরো অনেক শিকার এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খুব সহজে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে বলে, আপনি মাত্র এক ভেনিসিয়ান রৌপ্য গ্রোটে এক জোড়া রাজহাঁস বা দুই জোড়া পাঁতিহাস কিনতে পারবেন।

এখানে কসাইখানাও রয়েছে, এই জায়গাগুলোতে তারা খাবার মাংসের জন্য ষাঁড়, বাছুর, আর ভেড়া জবাই করে, যার বড় একটা অংশ ধনী আর সরকারি কর্মকর্তাদের টেবিলে পরিবেশিত হয়। কেননা এখানকার নিচু শ্রেণির লোকেরা বাছ-বিচারহীনভাবে সব ধরনের মাংসই খায়।

সব ঋতুতেই বাজারে ভেষজ আর ফলফলাদি পাওয়া যায়, বিশেষ করে দশ পাউন্ড ওজনের একপ্রকার বড় আকৃতির নাশপাতি, এর ভেতরটা পেস্টের মতো সাদা আর খুবই সুগন্ধিযুক্ত। সেই-সঙ্গে উপাদেয় গন্ধযুক্ত সাদা আর হলদে উভয় ধরনের পিচও পাওয়া যায়। এখানে আঙুর জন্মে না, তবে অন্য জায়গা থেকে উন্নত মানের শুকনো আঙুর আসে। ওয়াইন তৈরিতেও সেগুলোর ব্যবহার হয়, কিন্তু স্থানীয়েরা ভাত আর মসলার মিশ্রণে তৈরি মদে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের কাছে এর কদর নেই বললেই চলে। সমুদ্র এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, সেখান

থেকে প্রতিদিন নদীপথে শহরে প্রচুর মাছ আসে; হ্রদ থেকেও অঢেল মাছ ধরা হয়, আর মাছ ধরা যাদের পেশা তারাই মূলত এই কাজটা করে থাকে। বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ে। আর তার পরিমাণ দেখে আপনার ধারণা হতে পারে সেগুলো হয়তো অবিক্রীতই পড়ে থাকবে; কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এর সবই ফুরিয়ে যায়, কেননা এখানকার অসংখ্য অধিবাসীদের সক্ষম একটা শ্রেণি একই পাতে মাছ-মাংস পরিবেশনের মতো বিলাসিতা প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত।

এই দশটি বাজারের প্রতিটি উঁচু বসতবাড়িতে ঘেরা, যার নিচের অংশে দোকান, আর এগুলোতে প্রস্তুতকৃত সব ধরনের পণ্য পরিবেশন এবং ব্যবসায়ের সব উপকরণ বিক্রয় হয়; মসলা, ওষুধ, অলঙ্কারসহ অন্যান্য মনোহরি দ্রব্য এবং মুক্তাসহ অন্যান্য সব ধরনের পণ্যই এখানে পাওয়া যায়। কিছু কিছু দোকানে দেশীয় মদ ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি হয় না। এগুলোতে অনবরত সদ্য গাঁজানো চোলাই ক্রেতাদের কাছে সুলভে বিক্রয় হয়। আরো অসংখ্য সড়ক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে এবং এর কোথাও কোথাও শীতল পানিতে গোসলের ব্যবস্থা আছে, পুরুষ এবং নারী চাকর-চাকরানিরা সেগুলোর তত্ত্বাবধায়নে নিযুক্ত। যেসব নারী-পুরুষ শিশুকাল থেকেই শীতল জলে গোসল করে অভ্যস্ত এবং একে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী বলে মনে করেন, মূলত তারাই এখানে নিয়মিত আসেন। তবে নবাগত এবং যারা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারেন না তাদের জন্য এগুলোতে আলাদা করে গরম পানির ব্যবস্থা রয়েছে। এখানকার সবাই প্রতিদিন গোসলে অভ্যস্ত বিশেষ করে খাবার আগে।

এছাড়াও সড়কগুলোতে এতো বেশি বারবনিতাদের আনাগোনা যে তাদের কথা অলাদা করে বলার সাহস পাচ্ছি না। স্বভাবত থাকার উপযুক্ত স্থান বাজারের কাছাকাছিই শুধু নয়, শহরের সব জায়গাতেই এদের দেখা মিলবে, সেজে-গুঁজে, সুগন্ধি মেখে, সাজানো-গোছানো বাড়িতে, আরো অনেক নারী একত্রে থাকে। কামকলায় সুশিক্ষিতা শিল্পবোধসম্পন্না এই নারীরা সব ধরনের লোকেদের সঙ্গ দেবার উপযোগী। ভিনদেশি কেউ একবার এদের মায়া উপভোগ করার অভিজ্ঞতা লাভ করলে কামকলার জাদুমন্ত্রে এতটাই বু'দ হয়ে যাবেন যে বাকি জীবন সেটা ভোলা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই দেহ সুখে মাতাল সেই সব লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে জানান যে তারা কিন-সাই বা স্বর্গীয় শহরে ছিলেন এবং সুযোগ পেলেই তারা আবারও সেই স্বর্গে ফিরে আসেন।

অন্য একটি সড়কের পাশে চিকিৎসক আর জ্যোতিষীরা বসবাস করেন, এরা অন্য আরো অনেক কৃৎকৌশলসহ লেখাপড়ার ব্যাপারেও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। বাজারের অনেক বাড়িতেও এরা থাকেন। এসব বাজারের ঠিক বিপরীত দিকে দুটি করে বড় আকারের দালান রয়েছে, বিদেশি বণিক বা সেখানকার স্থানীয়দের মাঝে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে, তৎক্ষণাৎ সেসব আমলে নেবার জন্য,

সেখানে গ্রেট খানের নিয়োগ করা অফিসাররা অবস্থান করেন। একইভাবে আশপাশের এলাকায় সেতুর পাহারাদাররা ঠিকঠাক রয়েছে কি না বা এ ধরনের দায়িত্বে কোনো প্রকার গাফলতির ক্ষেত্রে দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়াও তাদের কাজ।

মূল সড়কের দু'পাশে, আগেই বলা হয়েছে এগুলো শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, বাগান সুশোভিত বড় বড় বাড়ি রয়েছে, আর এরই কাছে কারিগরদের আবাস, এরা নিজ নিজ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত দোকানে কাজ করে; আর সব সময়ই আপনি বিভিন্ন কাজে আসা এই ধরনের অসংখ্য লোকের যাতায়াত দেখতে পাবেন, যা তাদের পর্যাপ্ত খাবার যোগাতে সহায়তা করে। আর বাজারের দিনে এখানে ব্যবসায়ীরা ভিড় করে, গাড়ি আর নৌকা বোঝাই মালপত্র এনে তারা সমস্ত জায়গা ছেয়ে ফেলে আর এর কোনো কিছুই অবিক্রীত থাকে না। কেবল কাগজের মতো একটি জিনিস দিয়ে মাছ, মাংস, ওয়াইন, মুদির সব জিনিসপত্রসহ কিন-সাই-এর লোকেদের ভোগ করার মতো প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া সম্ভব। গ্রেট খানের নিয়োগ দেয়া এক শুল্ক কর্মকর্তার কাছ থেকে মার্কো পলো জানতে পারেন, প্রতিদিন এখানে এ ধরনের তেতাল্লিশটি কাগজের বোঝা আসে, যার প্রতিটির ওজন দুই শত তেতাল্লিশ পাউন্ড।

এই শহরের অধিবাসীরা পৌত্তলিক এবং তারা মুদ্রা হিসেবে কাগজের টাকা ব্যবহার করেন। নারীদের মতোই এখানকার পুরুষেরাও ফর্সা এবং সুশ্রী। অন্যান্য প্রদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে একচেটিয়া রেশম আমদানি করে। সেসব হতে কিন-সাইতে অঢেল বস্ত্র উৎপাদিত হয় বলে এখানকার লোকেদের বেশিরভাগই রেশমের কাপড় পরে।

এখানে হস্তশিল্প ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে, আর বাদবাকিগুলো বাদ দিয়ে এখানকার বারো ধরনের হস্তশিল্পকে খুবই উন্নত ও ব্যবহার উপযোগী বলে মনে করা হয়। এ ধরনের প্রতিটি হস্তশিল্পের জন্য হাজারেরও ওপরে ওয়ার্কশপ বা কর্মশিবির রয়েছে, যার প্রতিটিতে দক্ষ কারিগরের অধীনে দশ-বিশ জনের ওপরে কর্মী কাজ করছে, আর কোনো কোনোটিতে কর্মীর সংখ্যা চল্লিশের ওপরে। এই সব দোকানের বিত্তবান মালিকেরা নিজেরা কাজ করেন না, বরং গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান। একইভাবে তাদের বউরাও কোনো কাজ করে না। এদের সবাই নজরকাড়া সুন্দরী এবং আচার-আচরণেও কোমল আর ধীর। এদের রেশমের পোশাক-পরিচ্ছদ আর গহনাগাটির দাম কল্পনা করা দুঃসাধ্য। যদিও এখানকার আগেকার রাজার আইনি আদেশই ছিল যে প্রত্যেক নাগরিক তাদের পৈতৃক পেশা অবলম্বন করবে, তবে তখনো যথেষ্ট সম্পদ আহরণের পর গায়ে-গতরে না খেটে, লোক খাটিয়ে সেই পৈতৃক পেশা চালাবার অনুমতি ছিল।

এদের বাড়িগুলো খুব মজবুত করে তৈরি আর অনেক বেশি কারুকার্যমণ্ডিত। চিত্রকর্মের মাঝে এ ধরনের অলঙ্করণ আর বর্ণাঢ্য দালান এদের বেশি পছন্দের। আর এ কারণেই তারা এসবের ব্যবহারে অনেকটাই মুক্তহস্ত।

কিন-সাই-এর স্থানীয় বাসিন্দাদের মেজাজ-মর্জি অনেকটাই শান্ত প্রকৃতির, তাদের আগেকার রাজার মতোই এদেরও যুদ্ধ পছন্দ নয়, এরা চুপচাপ থাকতে পছন্দ করে। অস্ত্র পরিচালনা এদের অজানা, এখানকার কারো বাড়িতেই কোনো অস্ত্র নেই। অত্যন্ত সততা আর নিখুঁত সারল্যের সঙ্গে এরা পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। একে অপরের প্রতি এরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে একই সড়কের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের নারী-পুরুষ সবাইকে একই পরিবার বলে মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ঘর-গৃহস্থিতে এরা সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত আর স্ত্রীদের এরা কখনো সন্দেহের চোখে দেখে না, বরং অসম্ভব ধরনের সম্মান করে এবং বিবাহিত নারীদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ করলে সেই পুরুষকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। ভিনদেশিরাও, যারা তাদের শহরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসেন, তাদেরকেও এরা আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবে অবাধে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন, বন্ধুর মতো আপ্যায়ন করেন এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে সাহায্য- সহযোগিতাসহ আরো অনেক সৎপরামর্শ দেন। অন্যদিকে, তারা বর্তমান ব্যবস্থা অপছন্দ করে, আর স্থানীয় রাজার শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হবার কথা অকপটে গ্রেট খানের রক্ষীদের কাছে প্রকাশ করে।

হ্রদের কিনারায় উচ্চপদস্থ আর প্রশাসকদের জাঁকজমকে ভরপুর সুরম্য অনেক দালান রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে আশ্রমসহ অনেক প্রতিমা মন্দির, যেখানকার অসংখ্য সন্ন্যাসী প্রতিমা সেবায় নিয়োজিত। এর মাঝখানে দুটা দ্বীপ রয়েছে, যার প্রতিটিতে একটি করে চমৎকার ইমারত রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে আরো অসংখ্য দালান এবং আলাদা ভবন। বিবাহসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান আর অবকাশ কাটাতে হলে তারা এই দ্বীপের একটিতে চলে যায়, সেখানে নৌকা, ন্যাপকিন, টেবিলের চাদরসহ দরকারি সব কিছুই সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে, নাগরিকদের যৌথ তহবিল থেকে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করা হয়, আর এই টাকাতেই এসব দালানকোঠা তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বিবাহ বা ভোজের মতো অন্যান্য যেকোনো শত শত অনুষ্ঠান এখানে একাধারে আয়োজন করা সম্ভব। এখানকার কক্ষ, সভাকক্ষ আর প্যাভিলিয়নগুলো এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে তাতে একটি অপরটির ন্যূনতম সমস্যা করবে না।

এর পাশাপাশি, হ্রদে অসংখ্য প্রমোদ তরী বা নৌকা রয়েছে, যেগুলোতে দশ, পনের বা বিশজন পর্যন্ত লোক চড়তে পারে, দশ থেকে বারো কদম লম্বা, আর যথেষ্ট প্রশস্ত এই জলযানগুলোর মেঝে সমতল এবং চলাচলের সময় এগুলো একটুও কাত হয় না। আমোদ-ফুর্তির জন্য এগুলো সব সময় টেবিল-চেয়ার আর আপ্যায়নের অন্যান্য আসবাবে সাজানো অবস্থাতে তৈরি থাকে, পুরুষ এবং মহিলারা তাদের সঙ্গী-সাথীসহ একত্রে এগুলোতে চড়ে নৌবিহারের আনন্দ উপভোগ করে। সমতল ছাদের কেবিন বা আপার ডেকে চালকেরা অবস্থান করে।

হ্রদের গভীরতা দুই-এক ফ্যাদমের বেশি নয়, বলে কাঙ্ক্ষিত জায়গাতে পৌঁছাবার আগপর্যন্ত তারা লম্বা লগির সাহায্যে তরী ঠেলে সামনে অগ্রসর হয়। ক্যাবিনগুলোর ভেতরটা নানা রঙে রাঙানো আর বিভিন্ন ছবি আঁকা; জলযানের সবটাই এভাবে চিত্রিত। এর দু'পাশে জানালা রয়েছে, যা খোলা বা বন্ধ করে রাখা যায়, তাতে করে টেবিলের সামনে বসে চারপাশের অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারা যায়। এখানকার যে কেউ এই জলপথে ফলে শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে, কেননা হ্রদটা পুরো শহরের পাশজুড়ে বিস্তৃত। তীর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলার সময় এর বিশালতা আর সৌন্দর্য, এর প্রাসাদ, মঠ, মন্দির, তীরের কিনারা জুড়ে বিশাল বিশাল গাছগাছালি ছাওয়া সুদৃশ্য বাগান, সেই সঙ্গে অবিরাম আরো অনেক জলযানের পেরিয়ে যাবার দৃশ্য সত্যিকার প্রমোদ ভ্রমণের আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। যদিও এখানকার অধিবাসীরা প্রতিদিনেন লেনদের আর কাজ শেষে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু না ভেবে বউ বা বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে এমন আনন্দের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে।

৭৭
গ্রেট সিটি কিন-সাই-এর আরো কিছু বিবরণ

এখানে একটা জিনিস প্রথমেই চোখে পড়ে, আর তা হলো কিন-সাই-এর সব সড়ক পাথর আর ইটে বাঁধানো এবং মানজির দিকের সব প্রধান প্রধান সড়কও এই একইভাবে তৈরি। যাত্রীরা যাতে পায়ে মাটি না লাগিয়ে সবখানে ভ্রমণ করতে পারে সে জন্যই এই ব্যবস্থা। কিন্তু সম্রাটের কুরিয়ার, যারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুব দ্রুতগতিতে গমনাগমন করে তারা পায়েচলার পথের সড়কের সেই অংশগুলো ব্যবহার করতে পারে না, তাদের চলাচলের সুবিধার্থে সড়কের একদিকে অবাঁধাইকৃত একটা অংশ রয়েছে।

শহরের মূল সড়কের প্রতি পাশে ইট-পাথরে বাঁধাই করা এই অংশটি দশ কদম প্রশস্ত, এর মাঝের অংশ ছোট ছোট কাঁকর দিয়ে ভরাট করা এবং সেই সঙ্গে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু নালা, যার মাধ্যমে বৃষ্টির জল পাশের খালে সরে যেতে পারে, তাতে করে সড়কগুলো সবসময়ই শুষ্ক থাকে। এই কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে অবিরাম ঘোড়ার গাড়ি চলাচল করে। লম্বা আকৃতির এই গাড়িগুলো ওপর দিকে আবৃত, এতে রেশমের পর্দা আর গদি রয়েছে, এগুলো ছজন করে যাত্রী বহনে সক্ষম। নারী-পুরুষ উভয়েই কাজ শেষে খানিক আনন্দের জন্য প্রায় প্রতিদিনই এগুলো ভাড়া করে এদিক-সেদিক যাতায়াত করে, আর প্রতি ঘণ্টায় সড়কের মাঝ দিয়ে এমন প্রচুরসংখ্যক গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়। এদের কেউ কেউ কোনো বাগানে ঘুরতে যায়, সেখানে পরিচিতের সাহচার্য উপভোগ করে। যারা বাগান পরিচালনা করেন তারা এর জন্য বিভিন্ন আদলের ছায়া-ঢাকা স্থান তৈরি

করে রাখেন। এখানকার পুরুষেরা সারা দিন তাদের নারীদের নিয়ে সামাজিকতায় সময় কাটাতে পছন্দ করে, তাতে করে দেরিতে বাড়ি ফিরে।

কিন-সাই-এর লোকেদের প্রচলিত একটা প্রথা হলো, শিশু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা তার জন্মের তারিখ-দিন, ঘণ্টা, মিনিটসহ যে জায়গাতে জন্ম হয়েছে তা টুকে রাখেন। তারপর তারা জ্যোতিষের কাছে শিশুর রাশি বা তার জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অভিমুখ জানতে চান এবং তার সেই প্রশ্নের জবাবও লিখিত আকারেই দেয়া হয়। তারপর বড় হয়ে সে ব্যবসা-বাণিজ্য, অভিযান, বা বিয়ে করার সময় এই লিখিত দলিল জ্যোতিষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তিনি সেটা পর্যবেক্ষণ করেন এবং স্থান, কালসহ সব পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দৈববাণীতুল্য শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেন। বাজারগুলোতে এমন অসংখ্য জ্যোতিষ, অথবা জাদুকরের দেখা পাওয়া যায় এবং এ ধরনের পেশাদার কারো মতামত ছাড়া কোনো বিয়েই সম্পন্ন হয় না।

বিত্তবান বা বিখ্যাত কারো মৃত্যুর পর বিশেষভাবে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আয়োজন, এদের আরো একটা প্রথা। মৃতের নারী-পুরুষ-আত্মীয়দের সবাই মোটা কাপড় পরে, মড়া পোড়াবার জন্য একত্রে শ্মশানের দিকে রওনা হন। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ বাদক দল থাকে, পথ চলার সময় সেসব বাজতে থাকে, আর পৌত্তলিক প্রার্থনাকারীরা উচ্চনাদে কাঁদতে থাকে। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবার পর, তারা আগুনে অসংখ্য তুলট কাগজ ছুঁড়ে ফেলতে থাকে, যাতে তার চাকর-চাকরানি, ঘোড়া, উট, স্বর্ণালী রেশম, স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রার ছবি আঁকা থাকে। পরকালে মৃত যাতে তার দরকারি সব কিছু পেতে পারে এই বিশ্বাস থেকেই এনমটা করা হয়, ঠিক যেমনটা সে রক্ত-মাংসের শরীরে ভোগ করে গেছে। তারপর সেই স্তূপ পুড়ে শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবারও বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজতে শুরু করে, দীর্ঘ সময় ধরে তাদের তীব্র শোরগোল চলতে থাকে। তারা ভাবে, এভাবে তাদের দেবতা ভস্ম হয়ে যাওয়া মৃতের আত্মাকে গ্রহণে উৎসাহিত বোধ করবেন।

নগরের সব সড়কের পাশে পাথরের উঁচু দালান রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ বাড়িঘর কাঠের তৈরি বলে আগুন লাগার মতো দুর্ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর কোথাও আগুন লাগলে, নিরাপত্তার খাতিরে অধিবাসীরা তাদের মালামাল এই টাওয়ারগুলোতে সরিয়ে নেন।

সম্রাটের স্থাপিত আইন অনুসারে এখানকার সব প্রধান সেতুতে দশজন করে গার্ড নিয়োজিত রয়েছে, যাদের পাঁচজন রাতে এবং বাকি পাঁচজন দিনে পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করে। এই রক্ষীদের সবার কাছে একটা করে শব্দ সৃষ্টিকারী কাঠের যন্ত্র রয়েছে, সেই সঙ্গে একটা করে ধাতব আর জলের ডিভাইস, যার সাহায্যে ঘণ্টা অনুসারে দিবারাত্রির সঠিক সময় নিরূপণ করা হয়। রাত্রির প্রথম প্রহর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজন পাহারাদার কাঠের যন্ত্রে এবং ধাতব ঘণ্টাতে

একটি করে আঘাত করে। তাতে করে আশপাশের সড়কের প্রতিবেশী লোকেরা বুঝতে পারেন যে রাত্রির প্রথম প্রহর শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় প্রহর অতিবাহিত হবার পর তাতে দুটি আঘাত করা হয়; আর এভাবে ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অভিঘাতের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, এই গার্ডদের ঘুমাবার অনুমতি নেই এবং তাদের সব সময়ই সতর্ক থাকতে হয়। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবারও একটা শব্দ করা হয়, বিকেলেও, এভাবে প্রতি ঘণ্টায় শব্দের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

পাহারাদারদের কয়েকজন সড়ক প্রদক্ষিণ করে, দেখতে থাকে নির্দিষ্ট সময়ের পরও কোথাও আলো বা আগুন জ্বলছে কি না। এমনটা দেখতে পেলে তারা সেই ঘরের দরজাতে একটা চিহ্ন রেখে আসে এবং ভোর হবার পর সেই বাড়ির মালিককে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়, তার কাছে এই অপরাধের উপযুক্ত কৈফিয়ত তুলে ধরতে না পারলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। অসময়ে কাউকে বাইরে পাওয়া গেলে গ্রেফতার এবং আটক করা হয় এবং সকাল হলে আগের মতোই সেই একই আদালতের সামনে হাজির করা হয়। পঙ্গুত্ব বা অন্য যেকোনো কারণে কাজ করতে অক্ষম এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলে তারা তাকে হাসপাতালগুলোর একটিতে রেখে আসেন, আগেকার রাজা শহরের বিভিন্ন অংশে এমন বেশ কয়েকটি করে চিকিৎসালয় তৈরি করিয়েছেন যেখানে বিনা খরচে চিকিৎসা করা হয়। আর সেরে ওঠার পর তাদেরকে কাজের উদ্দেশ্যে কোনো না কোনো পেশা বেছে নিতে হয়।

কোনো বাড়িতে আগুন লাগলে, তারা সেই কাঠের যন্ত্র দিয়ে সতর্ক সংকেত বাজায়, কাছাকাছি সব সেতুর রক্ষীরা তখন আগুন নেভাতে এবং জিনিসপত্রসহ অন্যান্যদের এর আগে উল্লেখ করা সেই পাথরের দালানের কোনোটিতে সরিয়ে নিতে এগিয়ে আসে। কখনো কখনো মালামাল নৌকাতে তুলে সেই হ্রদের উপরকার দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ধরনের ঘটনা রাতের বেলা ঘটলে, সেই অবস্থাতেও লোকেরা বাড়ির বাইরে আসতে সাহস করে না এবং কেবল তারাই সেখানে থাকতে পারে যাদের মালামাল সরিয়ে নেয়া হচ্ছে, তারা রক্ষীদের এ কাজে সহযোগিতা করে, হাজারখানেক লোকের বদলে প্রায়ই এর সংখ্যা খুবই ছোট হয়।

নাগরিকদের মাঝে বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ দেখা দিলে, পুলিশের প্রয়োজন দেখা দেয়, কিন্তু সম্রাট সব সময়ই শহর আর এর আশপাশের এলাকাতে হাঁটা পথের দূরত্বে পদাতিক এবং অশ্বারোহী এই দুই ধরনের সৈন্য রাখেন, যাদের কমান্ডের দায়িত্ব তিনি চৌকস অফিসারদের কাছে দিয়েছেন।

রাতের পাহারার জন্য, মাইলখানেক পর পর মাটির ঢিবি গড়ে তোলা হয়েছে, যার ওপরে একটি করে কাঠের কাঠামো তৈরি করা আছে, সেখানে পাহারায় থাকা গার্ড কাঠের হাতুড়ি দিয়ে তাতে আঘাত করে, সেই শব্দ অনেক দূর-দূরান্ত থেকে শুনতে পাওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে এ ধরনের আগাম সতর্কতা গ্রহণ করা

না হলে বিপদের সময় পুরো অর্ধেক শহর পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে; এবং বিপদ সংকেত দেবার পর জনতার উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কয়েকটি সেতুর রক্ষীদের অস্ত্রে সজ্জিত করাসহ জায়গাটা মেরামতের জন্য তাদের উপস্থিতির প্রয়োজন দেখা দেয়।

এর আগে জায়গাটা একটি মাত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু গ্রেট খান তার অধীনে নেবার পর তিনি একে সুষমভাবে নয়টি অংশে বিভক্ত করার চিন্তা-ভাবনা করে, এর প্রতিটিতে তিনি একজন করে রাজা বা তার প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় নিয়োগ দেন, যারা নিজ নিজ অংশের সরকার প্রধান হিসেবে কাজ করবেন এবং জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন। তারা সম্রাটের দায়িত্বরত কমিশনের কাছে আদায়কৃত করের বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবেন, সেই সঙ্গে তাদের এলাকার অন্যান্য সব বিষয়াদিও তুলে ধরবেন। দায়িত্ব গ্রহণের তৃতীয় বছরে অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারীদের মতো বদলি হবেন।

এদের একজন ভাইসরয় কিন-সাই নগরে তার প্রাসাদে থাকেন এবং দরবার পরিচালনা করেন এবং তার অধীনে আরো এক শত চল্লিশটি মহানগরী এবং শহর রয়েছে, যার সবগুলোই বড় আর সম্পদশালী। মানজির বারো শত শহর আর তাদের অধ্যবসায়ী ও বিত্তবান বিশাল জনসংখ্যার কাছে এই সংখ্যাটা মোটেই বড় কিছু নয়। আকার আর আয়তন অনুসারে এর প্রতিটিতে সম্রাট একটি করে সেনাছাউনি রেখেছেন, সেখানকার শহরের জনতার সংখ্যা আর ক্ষমতা বিচার করে তিনি সেখানকার কোনো কোনো ছাউনিতে এক হাজার বা দশ-বারো হাজারের ওপরে সৈন্য রেখেছেন। তবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে এইসব সৈনিকদের সবাই তাতার। বরং এদের বেশিরভাগই পাশের প্রদেশ ক্যাথির স্থানীয়। তাতাররা সর্বজনীনভাবেই অশ্বারোহী এবং এখানকার শহরগুলো বিল অঞ্চলের নিচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়ায়, অশ্বারোহী সেনাদলের অবস্থানের জন্য সেগুলো মোটেই উপযোগী নয়, কারণ শক্ত আর উঁচু মাটিতেই কেবল এ ধরনের সৈনিকদের সঠিক পরিচালনা সম্ভব। তাই আগেকার সৈনিকদের বদলে তিনি ক্যাথিয়ান এবং মানজির সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের এখানে পাঠিয়েছেন; অধিকৃত এলাকা থেকে বাৎসরিক বাছাইয়ের মাধ্যমে অস্ত্র পরিচালনায় দক্ষ আর যোগ্যদের সৈনিক হিসেবে সংগ্রহের কারণেই সেটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মানজি থেকে সংগ্রহ করা সৈনিকদের তিনি কখনো তার নিজ শহরে নিয়োগ দেন না। তার বদলে তিনি তাদের সেখান থেকে বিশ দিনের দূরত্বে পাঠিয়ে দেন, আর সেখানে তাদের চার-পাঁচ বছর রাখা হয়, এর পর তাদের বাড়ি ফেরার অনুমতি মিলে, আর তাদের স্থানে সেখানে অন্যদের পাঠানো হয়। ক্যাথির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

নগরের বেশিরভাগ রাজস্ব গ্রেট খানের কোষাগারে জমা করা হয়, যা সেনাছাউনি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট। যখনই কোনো শহরে বিদ্রোহ দানা বাঁধার

উপক্রম হয়, আর এইসব লোকেদের পক্ষে হঠাৎ ফুঁসে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, অথবা তাদের গভর্নরকে হত্যার উদ্দেশ্যে জনতার কোনো অংশ উন্মাদ হয়ে উঠলে, কাছাকাছি সেনাছাউনির একটি অংশ নির্দেশমতো তাৎক্ষণিক দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হত্যার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আর এই উদ্দেশ্যে কিন-সাই শহরে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটা সেনাছাউনি প্রস্তুত রাখা হয়; আর যেকোনো জায়গাতে ছোট ছোট দলের একহাজার সৈনিক অবস্থান করে।

এবার এমন একটা চমৎকার প্রাসাদের কথা বলব। সেখানে আগেকার রাজা ফ্যাকফার বসবাস করতেন। তার বংশধরেরা দশ মাইলের মতো বৃত্তাকারে ঘেরা একটা জায়গাতে থাকতেন আর জায়গাটা তিন ভাগে ভাগ করা। যার মাঝের অংশে প্রবেশদ্বারে অভিজাত একটা সুউচ্চ তোরণ, আর এর দু'পাশে সমান দূরত্বে অবস্থিত চমকপ্রদ স্তম্ভের সারি, ভেতরে সারিবদ্ধ পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সমতল প্রশস্ত ছাদ, যার সবই সোনালি আর নীলাভ কারুকার্যে অলঙ্কৃত। প্রবেশপথের বিপরীতে স্তম্ভের সারির ওপাশে প্রাসাদের আরো ভেতরে, অনেক বেশি জাঁকজমকে ভরপুর, সেখানকার ছাদ আরো বেশি কারুকার্য শোভিত, পিলারগুলো গিল্ট করা, আর দেয়ালগুলো ভেতরের দিকে আগেকার রাজার ইতিহাসসমৃদ্ধ চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো।

এখানেই, রাজা ফ্যাকফারের বাৎসরিক দরবার বসত এবং প্রধান অভিজাত আর বিচারক এবং কিন-সাই-এর নামিদামি নাগরিকদের ভোজের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হতো। এই কলাম সারির নিচে খুব সহজেই দশ হাজারের বেশিলোক আঁটতে পারে। বাৎসরিক সেই উৎসব দশ বারো দিন ধরে চলত, আর সেটা খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতো, তার রেশম, সোনা আর মূল্যবান রত্নের পসরা যে কারো কল্পনার বাইরে; অতিথিরাও সাধ্যমতো মানানসইভাবে সেজেগুজে সেখানে উপস্থিত থাকত।

কলাম সারির সামনের দিকে আচ্ছাদিত পথসহকারে একটা দেয়াল রয়েছে, সেটা প্রাসাদটাকে বাহির আর ভেতরে দুটা অংশে ভাগ করে, যা বিশাল একটা আচ্ছাদনপথ হিসেবে কাজ করছে এবং এর ভেতরের দিকে রাজা আর রানির বিভিন্ন কক্ষ রয়েছে। এই পথ ধরে এগোলে ছয় কদম প্রস্তের আরো একটা আচ্ছাদিত পথ রয়েছে সেটা হ্রদের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এর দু'পাশে আরো দশটি প্রাসাদের প্রবেশপথ রয়েছে, সেখানেও একই রকমের দীর্ঘ আচ্ছাদিত পথ রয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি আচ্ছাদিত পথে বা এর সংলগ্ন প্রাসাদে পঞ্চাশটির মতন এপার্টমেন্ট রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে প্রাসাদসংলগ্ন বাগান, আর হাজারখানে তরুণীর কক্ষ, যাদের সবাই রাজার সেবায় নিয়োজিত।

কখনো রানিকে সঙ্গে নিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই সব তরুণীদের একটি দলকে নিয়ে হ্রদে নৌবিহারে বের হওয়া তার একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল, রেশমে আবৃত নৌযানে করে তিনি সে সময় হ্রদের তীরে অবস্থিত মন্দিরে

যেতেন। বাসস্থানের অন্য দুটি অংশে কুঞ্জবন, জলধারা, ফুল আর ফলে সুশোভিত সুদৃশ্য বাগান এবং কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, শূকর, খরগোসসহ সব ধরনের জন্তু-জানোয়ারের ঘের ছিল, এখানেও রাজা তার কুমারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে আসতেন, তাদের কেউ কেউ আসতেন ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে, কেউবা আসতেন ঘোড়ার পিঠে করে। কোনো পুরুষলোকের এখানে প্রবেশাধিকার ছিল না, মহিলারা তাদের কুকুর নিয়ে এখানকার অন্যান্য জীব-জন্তুকে ধাওয়া করতেন। আর পরিশ্রান্ত হয়ে তারা হ্রদের তীরে কুঞ্জবনে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন, সেখানে পোশাক ছেড়ে নগ্ন হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একে অন্যের দিকে খেলাচ্ছলে সাঁতরে যেতেন, আর রাজা বসে বসে সেসব মনোলোভা দৃশ্য দেখতেন। আর সব শেষে তারা প্রাসাদে ফিরে যেতেন।

কখনো কখনো তিনি তার সম্মানে সুউচ্চ গাছগাছালির ছায়া-ঢাকা কুঞ্জবন তৈরি করতে নির্দেশ দিতেন, আর সেখানে তিনি তরুণীদের নিয়ে আনন্দে সময় কাটাতেন। এভাবে নারীদের পেছনে সময়ক্ষেপণ করে তিনি সামরিক বিষয়াদিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন। তার এই বিকৃত আচরণের কারণেই গ্রেট খান তাকে তার চমৎকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হন এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন-সাই শহরে অবস্থানের সময় সেখানকার এক ধনী ব্যবসায়ী আমাকে এসব কথা বলেছেন, লোকটা খুবই বৃদ্ধ, তিনি রাজা ফ্যাকফারের খুব কাছের একজন ভৃত্য ছিলেন, রাজার জীবনের সমস্ত ঘটনা তার নখদর্পণে। প্রাসাদটার আদি অবস্থা জানা রয়েছে বলে, তিনি জায়গাটা আমাকে ঘুরে দেখাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বর্তমানে সেটা গ্রেট খানের ভাইসরয়ের বাসস্থান, এর স্তম্ভের সারিগুলোকে আগের অবস্থাতেই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, কিন্তু নারীদের কক্ষসমূহ প্রায় ধ্বংসের পথে, তাদের ভিত্তিগুলোই কেবল দেখতে পাওয়া যায়। একইভাবে বাগান আর কুঞ্জবনের দেয়ালগুলোও ধসে গেছে, সেখানকার পশুপাখি আর গাছগাছড়ার কোনো কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই।

এই শহর থেকে বিশ মাইল উত্তর-পূর্বে সাগরের অবস্থান, সেখানে অত্যন্ত চমৎকার এক বন্দর রয়েছে, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সব ধরনের পণ্যদ্রব্য বোঝাই জাহাজ এখান থেকে নিয়মিত ভারতে যাতায়াত করে।

সম্রাটের রাজস্ব আর লোকগণনার বাৎসরিক প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য সেবার মার্কো পলো কিন-সাই নগরে আসেন, তিনি তখন এখানে এক শত ষাট টোমান উনানের কথা লিপিবদ্ধ করেন, আর এমন এক একটি চুল্লিকে একটি ছাদ হিসেবে বিবেচনা করলে এবং এক টোমান সমান দশ হাজার বলে, তখন সেখানকার পুরো শহরে একই ছাদের নিচে অবশ্যই মোট এক লাখ ষাট হাজার পরিবার বসবাস করছিল তা একপ্রকার নিশ্চিত করেই বলা সম্ভব।

বাড়ির কর্তা বা পরিবারের পিতাকে সদর দরজায় পরিবারের তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে হতো, তাতে পরিবারের সবার নাম, নারী-পুরুষ আর ঘোড়ার সংখ্যা লিখে রাখার নিয়ম ছিল। কেউ মারা গেলে বা কেউ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে তার নাম কেটে দিতে হতো, আর কেউ জন্ম নিলে তার নাম তালিকাতে যোগ করা হতো। তাতে করে প্রদেশের উচ্চপদস্থ অফিসার আর নগরের গভর্নর অধিবাসীদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারতেন। মানজির মতোই ক্যাথিতেও এই একই ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। একইভাবে পান্থশালা এবং হোটেল মালিকদেরও তাদের খদ্দেরদের নামধাম, আসা-যাওয়ার দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট খাতায় লিপিবদ্ধ রাখতে হতো, যার একটি অনুলিপি প্রতিদিন বাজারের কাছে অবস্থিত সরকারি অফিসে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেয়ার নিয়ম ছিল। মানজির আরো একটা রীতি ছিল, আর তা হলো এখানকার দরিদ্র লোকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করবার জন্য, তাদের খাওয়া-পরা আর সঠিক আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য তাদের সেখানকার বিত্তবানদের কাছে বিক্রি করে দিতেন।

৭৮
গ্রেট খানের রাজস্ব

এবার আমরা কিন-সাই নগরী এবং মানজি রাজত্বের নয়টি বিভাগ থেকে গ্রেট খানের আদায় করা রাজস্বের কথা বলছি। প্রথম স্থানটিতে, লবণ, সবচাইতে উৎপাদনশীল একটা পণ্য, এখান থেকে তিনি বাৎসরিক আশি টোমান স্বর্ণ আদায় করে থাকেন। এক টোমান সমান আশি হাজার স্যাগি এবং এক স্যাগি সমান এক স্বর্ণ ফ্লরিন, ফলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় চৌষট্টি লক্ষ ডাকাট [ইউরোপে প্রচলিত পুরাতন স্বর্ণমুদ্রা]। বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত এই পণ্য সমুদ্রপথে অন্যান্য প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রীষ্মের গরমে এখানকার লেক আর বিলের পানি জমাট বেঁধে যায়, আর তখনই সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে কেলাস আকারে লবণ সংগ্রহ করা হয়, যা প্রদেশের বাকি পাঁচটি বিভাগের সরবরাহের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

এখানে প্রচুর পরিমাণে আখ চাষ এবং চিনি উৎপাদিত হয়, যা এখানকার অন্যান্য মুদিপণ্যের মাঝে তিন এবং একতৃতীয়াংশ রাজস্ব দিয়ে থাকে। ওয়াইন, অথবা ভাতের চোলাই থেকেও সম-পরিমাণে রাজস্ব আদায় হয়। বারো শ্রেণির যে কারিগরদের কথা একটু আগে উল্লেখ করা হলো, যার প্রত্যেক প্রকারের আলাদা করে হাজারের ওপর দোকান রয়েছে এবং যেসব বণিক প্রথমে শহরে মালামাল আমদানি করে পরে এখান থেকে তা সমুদ্রপথে দেশের অভ্যন্তর ভাগে বা বিদেশে রপ্তানি করেন তারাও সমপরিমাণ তথা তিন এবং এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব প্রদান করেন। কিন্তু যারা ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে তাদের দশ

শতাংশ রাজস্ব প্রদান করতে হয়। একইভাবে স্থানীয় দেশীয় জিনিসপত্র যেমন গবাদি-পশু, এখানকার মাটিতে জন্মানো শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলের জন্যেও রাজাকে কর দিতে হয়।

মার্কো পলোর উপস্থিতিতে এই হিসাব প্রস্তুত করা হয় বলে তিনি সম্রাটের রাজস্ব সম্পর্ক জানার সুযোগ পান, যার বড় একটা অংশ কেবল লবণ থেকেই আদায় হয়, যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানকার সর্বমোট বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দুই শত দশ টোমান বা এক কোটি আটষট্টি লাখ ডাকাট।

৭৯

টা-পিন-জু এবং অন্যান্য শহর

কিন-সাই ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে টানা এক দিন পথ চলার পর আপনি টা-পিন-জু নামের বিশাল আর সুদৃশ্য এক নগরে এসে উপস্থিত হবেন। এ সময় অনবরত অনেক বসত আর বাগানবাড়ি পেরিয়ে আসবেন। পথের এই খামারগুলোতে সব ধরনের শাকসবজি অঢেল পরিমাণে জন্মে। শহরটা কিন-সাই-এর অধিকারভুক্ত। অধিবাসীরা পৌত্তলিক, পুড়িয়ে মৃতের সৎকার করে, ব্যবসা-বাণিজ্য আর হাতের কাজ এদের প্রধান জীবিকা, জায়গাটা গ্রেট খানের অধীন আর লোকেরা তার কাগজের টাকা ব্যবহার করে। জায়গাটার এর বেশি কোনো বিশেষত্ব নেই, বিধায় এবার আমরা উগুইগু শহরের কথা বলছি।

টা-পিন-জু থেকে দক্ষিণ-পূর্বে তিন দিনের পথ গেলে আপনি উগুইগু শহরে উপস্থিত হতে পারবেন এবং সেই একই দিকে আরো দু'দিনের পথ গেলে পথে আরো অনেক শহর, প্রাসাদ আর জনঅধ্যুষিত এলাকা চোখে পড়বে এবং কোনো অপরিচিত ভিনদেশির কাছে এগুলোর এক একটিকে শহরের সম্প্রসারিত অংশ বলেই মনে হবে। এদের সবই কিন-সাই-এর অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা পৌত্তলিক, জীবন-জীবিকার সব কিছুই এই মাটিতে অঢেল পাওয়া যায়। এখানে অনেক মোটা আর লম্বা একধরনের বেত জন্মে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে, পরিধিতে এগুলো চার বিঘত এবং দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ কদমের ওপরে।

একই দিকে আরো তিন দিন অগ্রসর হলে, আপনি জেন-গুই শহরে পৌঁছবেন এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরো এগোতে থাকলে মনে হবে, কোলাহলময় শহর যেন শেষ হতে চাইছে না, ঘনবসতিপূর্ণ এইসব অধিবাসীরা কৃষি এবং ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানজি প্রদেশের এই অংশে কোনো ভেড়ার দেখা মিলবে না, তবে অসংখ্য ষাঁড়, গরু, মহিষ, ছাগল আর শূকর দেখতে পাবেন। চার দিনের পথ চলার পর অবশেষে পৌঁছবেন জেন-জিয়ান শহরে, নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটা পাহাড়ের ওপর সেটা অবস্থিত, আর সেই নদী একই ধরনের দুটা শাখায় বিভক্ত

হয়ে পাহাড়টাকে যেন জড়িয়ে ধরে রয়েছে, এর একটা ধারা বিপরীত দিকে দক্ষিণ-পূর্বে বয়ে গেছে, আর অন্যটা গেছে উত্তর-পশ্চিমে। এখানে যে শহরগুলোর কথা বলা হলো তার সবই গ্রেট খানের অধীন এবং কিন-সাই-এর অন্তর্ভুক্ত। অধিবাসীরা পৌত্তলিক এবং ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করে। এই সমস্ত অঞ্চল শিকার উপযোগী অঢেল জীবজন্তু আর পাখির আবাস। এখান থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তিন দিনের পথ গেলে আপনি বিশাল আর বিখ্যাত শহর গি-জাতে পৌঁছবেন, এটাই কিন-সাই-এর অধিভুক্ত এলাকার শেষ সীমানা। এই শহর পেরোলে, আপনি নতুন একটা রাজ্য বা অন্য এক ভাইসরয় শাসিত মানজির আরো একটা উপরাজ্যে প্রবেশ করবেন, যার নাম কোন-চা।

৮০
কোন-চা রাজ্য

কিন-সাই-এর সব শেষ শহর গি-জা ত্যাগ করার পর আপনি কোন-চাতে প্রবেশ করবেন, যার প্রধানতম শহরের নাম ফু-গিউ। এই রাজ্যের মাঝে দক্ষিণ-পূর্বে ছয় দিন পাহাড় আর উপত্যকার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করার সময়, শহর আর গ্রাম চোখে পড়বে, এগুলো জীবনধারণের অঢেল উপকরণে ঠাসা, আর শিকারের সুযোগও প্রচুর, বিশেষ করে পাখি। অধিবাসীরা গ্রেট খানের অধীন এবং ব্যবসা আর উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এই অংশের বাঘেরা আকার-আকৃতি আর শক্তির দিক দিয়ে অনেক বড়। আদা এবং এই একই পরিবারভুক্ত মসলা জাতীয় কন্দ গ্যালাঙ্গালসহ অন্যান্য ওষুধ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক ভেনিসিয়ান রৌপ্য গ্রোট সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রায় আপনি আশি পাউন্ড তরতাজা আদা কিনতে পারবেন, কারণ এখানকার সব জায়গাতেই এটা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এখানে জাফরানের মতো দেখতে একপ্রকার সবজি পাওয়া যায়, জাফরানের সব গুণাগুণ থাকলেও এটা আসলে সত্যিকার জাফরান নয়। এর অনেক কদর রয়েছে এবং সব ধরনের খাবার-দাবারে এটা ব্যবহার করা হয়, আর এ কারণেই এর দামও অনেক বেশি।

এখানকার লোকেরা মানুষের মাংসে আসক্ত, যেকোনো খাবারের চেয়ে এর কদর বেশি বলে রোগে-শোকে মারা না গেলে সেই মৃতের এ কাজে ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধে যাবার সময় এরা কানের ওপর চুল ছড়িয়ে দেয় এবং মুখে উজ্জ্বল নীল রং করে। তারপর বর্শা আর তরবারি হাতে-পায়ে হেঁটে সবাই সর্দারের পেছন পেছন রওনা হয়। সর্দার ঘোড়ার পিঠে বসে সবার নেতৃত্ব দেন। মানুষের মধ্যে এরা সবচাইতে অসভ্য জাতি, যুদ্ধের সময় শত্রুকে হত্যা করার পর এরা তাদের রক্ত পান করার জন্য উঠেপড়ে লাগে, আর তারপর গোগ্রাসে তাদের মাংস গিলে খায়। এসব বিষয় রেখে এবার আমরা কুই-লিন-ফু শহরের কথা বলব, মোটামুটি

বড় এই শহরে তিনটি চমৎকার সেতু রয়েছে, যার প্রতিটি শত কদম দৈর্ঘ্য আর আট কদম প্রস্থের। এখানকার নারীরা খুবই সুন্দরী এবং অত্যন্ত ভোগ-বিলাসের সঙ্গে জীবনযাপন করে। এখানে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে বিভিন্ন ধরনের রেশমের কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে তুলা থেকে রঙ-বেরঙের সুতাও তৈরি হয়, বিক্রির জন্য সেসব মানজির সর্বত্র নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার বেশিরভাগ লোকই বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিপুল পরিমাণ আদা আর গ্যালাঙ্গাল রপ্তানি করে।

এখানে বিশেষ প্রজাতির একধরনের গৃহপালিত মুরগি পাওয়া যায় যাদের গায়ে কোনো পালক নেই, তবে আমি সেটা নিজের চোখে দেখিনি। এগুলোর ত্বকের রং চুলের মতো কালো, দূর থেকে বিড়ালের লোমের মতো মনে হয় বলে এগুলো দেখতে খুবই অসাধারণ। এরা মুরগির মতোই ডিম পাড়ে, আর সেগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু।* এখানে বাঘের সংখ্যা বেশি বলে ভ্রমণ বিপজ্জনক, যদি না দলবেঁধে একত্রে বের হওয়া যায়।

৮১
উন-গুয়েন শহর

কুই-লিন-ফু শহর থেকে বেরিয়ে, তিন দিন ভ্রমণ শেষে আপনি উন-গুয়েন শহরে এসে পৌঁছবেন। পথে অনেক শহর আর প্রাসাদ চোখে পড়বে, সেখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, অঢেল রেশমের মালিক, সেসব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রপ্তানি করে থাকে।

উন-গুয়েন শহর চিনি উৎপাদনের জন্য খুবই প্রসিদ্ধ, রাজপ্রাসাদে ব্যবহারের জন্য এখান থেকে কানবালুতে চিনি সরবরাহ করা হয়। গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির আগে এখানকার লোকেদের কাছে উন্নত মানের মিহি চিনি তৈরির কৌশল অজানা ছিল। আর তখন তারা ত্রুটিপূর্ণভাবে তা সেদ্ধ করত, তাতে করে ঠাণ্ডা করার পর সেই চিনি বাদামি রং ধারণ করত। একবার কুবলাই খানের দরবারে ব্যাবিলন থেকে এক লোক আসে, সে উন্নত মানের চিনি তৈরির কৌশল সম্পর্কে জানত। আর শহরটা সম্রাটের সরকারের অধীনে আসার পর, এই শহরে লোকেদের সেই কৌশল শেখাবার জন্য তাকে এখানে পাঠানো হয়, সে একধরনের কাঠের ছাই ব্যবহার করে চিনি শোধনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়।

---

* মুরগি চাষিদের কাছে এই পাখিগুলো ফ্রেসি পার্সিয়ান (ঋষববপু চবৎংরধহ) নামে পরিচিত। চীনারা এগুলোকে "ভেলভেট-হেয়ার ফাউল" নামে ডাকে, তবে এখন শুধু এদের সাদা উপপ্রজাতিটি টিকে আছে।

একই দিকে পনের মাইল সামনে গেলে, আপনি কান-গুই নগরে পৌঁছবেন, যা মানজি প্রদেশের নয়টি উপরাজ্যের একটি, কোন-চা-এর অধীন। এখানে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বহুসংখ্যক সেনা মোতায়েন রয়েছে, বিদ্রোহ বা যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এরা সব সময় প্রস্তুত।

এর মাঝ দিয়ে মাইলখানেক প্রস্থের একটা নদী বয়ে গেছে, যার উভয় তীরজুড়ে প্রকাণ্ড আর সুদৃশ্য দালানকোঠা গড়ে উঠেছে। নদী তীরে মালামাল বোঝাই অসংখ্য জাহাজ নোঙর করা রয়েছে, যার বেশিরভাগই চিনি রপ্তানিতে নিয়োজিত। অসংখ্য জাহাজে করে এই বন্দরে বণিকেরা হীরা, মুক্তার মতো আরো সব মহামূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী বিক্রির জন্য আসেন। সেসব বিক্রয় করে তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করতে সমর্থ হন। এই নদী সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, জাই-তুন বন্দর হতে জায়গাটা খুব বেশি দূরে নয়। ভারত থেকে সমুদ্রপথে জাহাজ উজান বেয়ে এই শহরে এসে উপস্থিত হয়, এখানে সব ধরনের পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায় এবং বড় বড় ফলের বাগানও রয়েছে, সেখানে মজাদার সব ফলফলাদি জন্মে।

৮২
বন্দর নগরী জাই-তুন এবং টিন-গুই শহর

কান-গুই শহর ছেড়ে নদী পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হতে থাকলে, আপনি জনবসতিপূর্ণ এক দেশের সন্ধান পাবেন, এর ওপর দিয়ে পাঁচ দিন ভ্রমণের সময় শহর আর প্রাসাদসহ আরো অনেক জনবসতি পেরিয়ে যেতে থাকবেন। এসব স্থানে সব ধরনের পণ্যদ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে। সমতলসহ পাহাড়ের ওপর দিয়েও চলাচলের পথ রয়েছে এবং বনের গভীরেও পথের দেখা মিলবে। এখানকার বনগুলো থেকে কর্পূর সংগ্রহ করা হয়। এখানে প্রচুর শিকারও মিলবে। অধিবাসীরা গ্রেট খানের অধীন এবং কান-গিউ-এর অন্তর্ভুক্ত।

পাঁচ দিন ভ্রমণ শেষে, আপনি বিখ্যাত আর সুদৃশ্য জাই-তুন নগরে এসে পৌঁছবেন, এর সাগর তীরে একটা বন্দর রয়েছে, বণিকেরা এখান থেকে জাহাজ বোঝাই মালামাল নিয়ে রওনা হন, পরবর্তীতে সেসব মানজি প্রদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এখান দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাগজ আমদানি হয়, এরপর তা বিশ্বের পশ্চিম অংশের চাহিদা মেটাবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সত্যিকার চাহিদার চাইতে এর পরিমাণ খুবই অপর্যাপ্ত, সম্ভবত শতভাগেরও কম। পৃথিবীর এই বৃহত্তম বন্দরে আগত বণিকের সংখ্যা নিরূপণ আর পুঞ্জীভূত পণ্যের পরিমাপ করা সত্যিই দুরূহ একটি কাজ। এখান থেকে গ্রেট খান অঢেল রাজস্ব সংগ্রহ করেন। আর বণিকদের সবাই তাদের লগ্নিকৃত অর্থের দশ ভাগ দিতে বাধ্য। ভালো মানের পণ্যের ক্ষেত্রে ত্রিশ ভাগ, কাগজের জন্য চল্লিশ ভাগ

এবং চন্দনকাঠ আর বিভিন্ন ওষুধসহ অন্যান্য সাধারণ সব পণ্যের ক্ষেত্রে চল্লিশ ভাগের বিনিময়ে জাহাজ পণ্য পরিবহন করে থাকে। বণিকদের হিসাব অনুসারে, শুল্ক এবং পরিবহন মাসুলসহ তাদের খরচ মালামালের মূল্যের অর্ধেক; এবং তারপরও সেই বাকি অর্ধেক থেকে তারা পর্যাপ্ত লাভ করতে সক্ষম হন, তাই বারবার তারা মালামাল বোঝাই জাহাজ নিয়ে এই একই বাজারে ফিরে আসেন।

দেশটা আনন্দে ভরপুর। লোকেরা পৌত্তলিক, দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এরা নির্বিবাদী, আরাম-আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দ্য ভালোবাসে। এখানে অনেক দক্ষ উল্কি আঁকিয়ে রয়েছেন, আর তাদের কাছ থেকে শরীরে উল্কি আঁকাবার জন্য ভারত থেকে অনেকেই আসেন। সুঁই দিয়ে উল্কি আঁকার এ ধরনের কৌশলের কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

জাই-তুন বন্দর দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তা খুবই প্রশস্ত আর খরস্রোতা, আর এরই একটা শাখা কিন-সাই শহর থেকে এসেছে। আর যেখানে সেটা প্রধান খাল থেকে বিভক্ত হয়েছে, সেই স্থানে টিন-গুই নগর অবস্থিত। এই জায়গাতে পোর্সেলিনের তৈজসপত্র, যেমন : কাপ, বোল, থালা, তৈরি হয়, এছাড়া এখানকার আর কোনো বিশেষত্ব নেই। যে প্রক্রিয়াতে সেসব তৈরি হয়, এখানে তার বর্ণনা তুলে ধরা হলো। এরা খনি থেকে বিশেষ ধরনের মাটি সংগ্রহ করে, তারপর তা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে স্তূপ আকারে রেখে দেয়, উন্মুক্তভাবে পড়ে থাকা এই মাটি এ সময় বাতাস, বৃষ্টি আর সূর্যের তাপের সংস্পর্শে আসে, এই সময়ের মাঝে এগুলোতে আর হাত দেয়া হয় না। এভাবে সেগুলো পরিশোধিত হয় এবং উপরে উল্লেখ করা তৈজসপত্র বানাবার উপযোগী আকৃতি দেবার মতো উপযুক্ত হয়, তখন এদের ইচ্ছেমতো আকৃতি দিয়ে চুল্লিতে পোড়ানো হয়। আর তাই যারাই সেই খনি খুঁড়ে তারা আসলে তাদের ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনির জন্য মজুদ করে যাবার উদ্দেশ্যেই সেই কাজটা করে। এই শহরে এ ধরনের প্রচুর তৈজসপত্র বিক্রি হয়। আর মাত্র এক ভেনিসিয়ান গ্রোট সমপরিমাণ মুদ্রায় আপনি আটখানা পোর্সেলিনের কাপ কিনতে পারবেন।*

এবার আমরা মানজির নয়টি উপরাজ্যের একটি কোন-চা-এর এমন সময়কার বর্ণনা তুলে ধরছি, যখন গ্রেট খান কিন-সাই থেকে বড় আকারের রাজস্ব সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এখানকার অন্য কোনো শহরের বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে না, তার কারণ মার্কো পলো সশরীরে এখানকার অন্য কোনো শহরে যাননি, যেভাবে তিনি কিন-সাই এবং কোন-চা-তে গিয়েছিলেন। দেখা গেছে মানজি প্রদেশের সব জায়গাতেই একটি মাত্র সাধারণ ভাষা প্রচলিত, আর একইভাবে তা লেখা হয়, যদিও দেশের বিভিন্ন অংশে কথ্য ভাষার মাঝে তারতম্য রয়েছে, এই

---

* হান রাজবংশের (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকালে পোর্সেলিনের কথা জানা গেলেও, মার্কো পলোর শত বছর পর মিং রাজবংশের শাসনকাল চীনের পোর্সেলিনের যুগ হিসেবে খ্যাত।

একই ঘটনা জেনোসের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সেখানে মিলানেজ এবং ফ্লোরেনটাইন এবং অন্যান্য ইতালিয়ান কথ্য ভাষা থাকার পরও সেখানকার অধিবাসীরা সাধারণ একটি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদার-প্রদানে সক্ষম।

মার্কো পলো যে বিষয়ে লিখতে বলেছিলেন তার পুরোটা এখানেই শেষ করা সম্ভব হয়নি, এবার তিনি বইয়ের এই দ্বিতীয় অধ্যায়খানা শেষ করতে যাচ্ছেন এবং তিনি এবার অন্য সব দেশ আর ভারতের বর্ণনা তুলে ধরবেন, আর বর্ণনার সুবিধার্থে দেশটাকে, উজান, ভাটি আর মধ্য ভারত হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। গ্রেট খানের হয়ে কাজ করার সময় তার নির্দেশে বিভিন্ন কাজে তিনি সেসব স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এবং পরবর্তীতে বাবা আর কাকার সঙ্গে রাজা আর্গনের জন্য রানিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার সময় আবারও তার সেখানে যাবার সুযোগ হয়।

এই সব স্থানের অভূতপূর্ব অনেক ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি দেখার বিরল সুযোগ তার হয়েছিল, কিন্তু একই সঙ্গে বিশ্বস্ত আর গণ্যমান্য লোকেদের কাছ থেকে কোনো বা ভারতীয় উপকূলের সামুদ্রিক-মানচিত্রের যেসব জায়গার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেসবও বাদ যাবে না।

অধ্যায়-৩

জাপান এবং এর পার্শ্ববর্তী দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ভারত এবং ভারতীয় মহাসাগরের উপকূল আর দ্বীপসমূহ

১
ভারত, অধিবাসীদের আচার-আচরণ, মনে রাখার মতো অসাধারণ জিনিস এবং ঘটনা, ব্যবহৃত জাহাজ

এর আগের অংশে, বিভিন্ন প্রদেশ এবং অঞ্চলের বর্ণনা তুলে ধরার পর এবার আমরা সেসব রেখে ভারতের দিকে যাচ্ছি।

বণিকদের কাজে ব্যবহৃত জাহাজের বর্ণনা দিয়েই শুরু করা যাক, এগুলো ফার-কাঠ দিয়ে তৈরি। একতলাবিশিষ্ট। নিচের অংশে ষাটটি ছোট ছোট কক্ষ, যার এক একটিতে একজন করে বণিক থাকতে পারেন। এতে একটা করে মজবুত হাল রয়েছে। সঙ্গে চারটা মাস্তুল আর অসংখ্য পাল, কিছু কিছু জাহাজে মাস্তুল দুইটা, প্রয়োজনে তা নামিয়ে রাখা এবং আবারও আগের জায়গায় লাগানো সম্ভব। বড় আকৃতির কিছু জাহাজে ত্রিশটিরও বেশি পার্টিশন বা ভাগ রয়েছে, পুরু তক্তার কাঠ জোড়া দিয়ে এগুলো তৈরি। পাথর বা তিমির সঙ্গে আঘাতের মতো দুর্ঘটনার পর জাহাজ ছিদ্র হয়ে গেলে এগুলো সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। আর এ ধরনের ঘটনা খুব একটা বিরল নয়; কেননা রাতের বেলা পথ চলার সময় স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যে সাদা ফেনার সৃষ্টি হয় তা ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোকে আকৃষ্ট করে। খাবারের আশায়, সেদিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসার সময় এগুলো জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং এতে প্রায়ই তলার কিছু অংশ ভেঙে যায়। স্থায়ীভাবে আঘাতপ্রাপ্ত সেই জায়গা দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করে। নাবিকেরা ছিদ্র হবার বিষয়টা বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত সেই অংশের মালামাল সরিয়ে ফেলে, আর খুব ভালোভাবে সংযুক্ত থাকে বলে এক অংশ থেকে জল অন্য অংশে যেতে পারে না। এরপর তারা সেই ক্ষত সারিয়ে তুলে এবং সারিয়ে নেয়া মালামাল আগের জায়গাতে এনে রাখে।

সব জাহাজই দুই পরতের তক্তা দিয়ে তৈরি, এর মানে, সব অংশের তক্তার ওপর আরো এক পরত তক্তার আবরণ থাকে। এগুলোর ফাঁক বাহির এবং ভেতর

দু'পাশ থেকেই দড়ির ফেঁসো দিয়ে বন্ধ করে লোহার তারকাঁটা দিয়ে আটকে দেয়া হয়। এই দেশে আলকাতরা উৎপন্ন হয় না বলে, তারা এতে এর প্রলেপ দেয় না, তবে প্রলেপ দেয়ার জন্য এখানকার লোকেরা অন্য একধরনের উপাদান তৈরি করে। এরা কলিচুন আর শণ নেয়, তারপর সেগুলো ছোট ছোট করে কেটে, গুঁড়া করে তার সঙ্গে একপ্রকার গাছের তেল মেশায়, এতে একধরনের পিচ্ছিল দ্রব্য পাওয়া যায়, যার চটচটে ভাব সহজে নষ্ট হয় না এবং খুব শক্তভাবে লেগে থাকে, আর উপাদানটা আলকাতরার চাইতেও বেশি কার্যকরী।

বড় বড় জাহাজে তিন শত নাবিকের দরকার হয়; অন্যগুলোর দুই শত; এবং আকৃতি অনুসারে কিছু কিছু জাহাজের এক শত বা পঞ্চাশ জন ক্রু থাকে। এগুলো পাঁচ থেকে ছয় হাজার বাক্স বা চটের বস্তায় কাগজের পরিবহন করে।

আগে এখানকার জাহাজগুলোর আকৃতি অনেক বড় ছিল, কিন্তু সাগরের প্রবল ঢেউয়ের তোড়ে দ্বীপটির অনেক জায়গা ক্ষয়ে গেছে, বিশেষ করে প্রধান বন্দরগুলোর কাছাকাছি জায়গাগুলো, তাতে করে সেখানে জলযানগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা নতুন করে এখানকার বন্দরসমূহের উপযোগী ছোট আকারের জাহাজ বানিয়ে নিয়েছে।

এই জলযানগুলো দাঁড়ের মাধ্যমেও চালনা করা হয়, এই কাজের জন্য এদের প্রতিটিতে চারজন করে লোকের দরকার পড়ে। বড় জাহাজগুলোতে দুই থেকে তিনটা মাস্তুল থাকে, সেগুলো হাজারখানেক কাগজের বাক্স বহন করতে সক্ষম, আর ষাট, আশি বা এক শত জন নাবিক সেগুলোতে কাজ করে। দাঁড় টানা বা পালের সাহায্যে চলার পরও বাতাস তেমন জোরালো না হলে, ছোট ছোট নৌযানগুলোকে প্রায়ই বড় জাহাজ টানার কাজে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেটা পেছন থেকে কখনো নয়, কারণ তাহলে বড় জাহাজের পাল ছোটগুলোকে থামিয়ে দিতে পারে। জাহাজগুলো দশটার মতো ছোট ছোট নৌকাও বহন করে, নোঙর বহন করা, মাছ ধরাসহ এগুলো দিয়ে অন্যান্য আরো অনেক ধরনের কাজ করা হয়। এগুলোকে দু'পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়, আর ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে সেগুলোকে নামানো হয়। ছোট ছোট জাহাজগুলোতেও একইভাবে এধরনের নৌকা থাকে।

কোনো জাহাজ বছরখানেকের সমুদ্র অভিযান থেকে ফিরে আসলে, সেগুলোর মেরামতের দরকার পড়ে, আগের মতোই সেগুলোর তলায় আবার প্রলেপ লাগানো হয়, আঠালো সেই বস্তু দিয়ে সেগুলোর যাবতীয় ছিদ্র বন্ধ করা হয়। এবং পরে কখনো আবারও তাতে মেরামতের দরকার দেখা দিলে সেটাও করা হয়, এভাবে একটা জাহাজকে মোট ছয়বার পর্যন্ত প্রলেপ লাগানো হয়, এরপর অমেরামতযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় সমুদ্রযাত্রার অনুপযোগী হিসেবে পরিত্যক্ত করা হয়।

জাহাজের বর্ণনা দেবার পর এবার আমরা ভারত নিয়ে কথা বলব; তবে তার আগে আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেখানকার সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত নির্দিষ্ট কিছু

দ্বীপের কথা বলে নিতে চাইছি এবং জিপানগু নামের দ্বীপ দিয়েই সেই বর্ণনার প্রথমটুকু শুরু করছি।

২

জিপানগু দ্বীপ এবং এর বিরুদ্ধে গ্রেট খানের অভিযান

জিপানগু [জাপান] পুব সমুদ্রের একটা দ্বীপ, মূল ভূখণ্ড তথা মানজির উপকূল থেকে এটা পনের শত মাইল দূরে অবস্থিত।

দ্বীপটা আয়তনে অনেক বড়; এর অধিবাসীরা ফর্সা, শারীরিক গঠন সুগঠিত এবং আচার-আচরণে সভ্য, তাদের ধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন রয়েছে। তারা সমস্ত বিদেশি শক্তির প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন এবং কেবল তাদের নিজস্ব রাজার দ্বারাই শাসিত। এরা অঢেল স্বর্ণের মালিক, সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকার পরও, সেখানে যে গুটিকয়েক বণিক যাতায়াত করেন, তারা রাজার নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশের বাইরে সোনা রপ্তানি করতে পারেন না। এমনকি এখানে অন্যান্য এলাকা থেকে খুব বেশি জাহাজও যাতায়াত করে না।

যাদের সেই বিস্ময়কর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয়েছে তাদের কাছেই আমরা এখানকার সার্বভৌম রাজার প্রাসাদের অসাধারণ বিত্ত-বৈভবের কথা শুনেছি। ছাদের পুরোটা সোনায় মোড়ানো, ঠিক যেভাবে আমরা বাড়ি রং করি বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে চার্চের ছাদ যেভাবে সিসার পাতে ঢাকা হয়। সেখানকার সভাকক্ষসমূহের ছাদও এই একই মূল্যবান ধাতু দিয়ে মোড়া; অসংখ্য কক্ষে মোটামুটি পুরু সোনার ছোট ছোট টেবিল রয়েছে; এবং জানালোগুলোও সোনালি গহনায় সাজানো। সমৃদ্ধ সেই প্রাসাদ এতই বিশাল যে তাদের পক্ষে আগে তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে গোলাপি মুক্তাও পাওয়া যায়, গোলাকার এই মুক্তা আকারে অনেক বড় হয়, এমনকি আকৃতিতে তা সাদাগুলোকেও ছাড়িয়ে যায়।

এখানকার অধিবাসীদের একটা অংশ প্রথা অনুসারে মৃতকে কবর দেয়, আর অন্য অংশ পুড়িয়ে সৎকারকর্ম সম্পন্ন করে। আগে এখানে মারা যাবার পর মৃতের মুখে একটা করে মুক্তা পুড়ে দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। এখানে অনেক মূল্যবান রত্ন পাথরও পাওয়া যায়।

এই দ্বীপের ধন-সম্পদের পরিমাণ এতই বেশি যে গ্রেট খান কুবলাই-এর মনে তা জয় করার প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে কাজ করছিল, আর এখন তিনি তা জয় করে এখানে রাজত্ব করছেন এবং একে তিনি নিজ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত করেছেন। আর সেটা কার্যকর করতে তিনি অসংখ্য নৌযান প্রস্তুত করেন এবং দুজন প্রধান অফিসারের নেতৃত্বে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী জাহাজে তুলে দেন। নেতৃত্ব প্রদানকারী এই দুজন সেনানায়কের নাম আব্বাকাটান এবং ভোনসানসিন।

জাই-তুন এবং কিন-সাই থেকে অভিযাত্রা শুরু হয় এবং মধ্যবর্তী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা নিরাপদে দ্বীপে অবতরণ করে।

তবে দুই কমান্ডারের মাঝে একটা বিদ্বেষ কাজ করে, ফলে তাদের একজন অপরজনের বিরুদ্ধে আদেশ অমান্যের অভিযোগ আনার ষড়যন্ত্র করে। আর এ কারণেই তারা সেখানকার একটা ব্যতিক্রমী জায়গা ছাড়া অন্য কোনো শহর বা পরিখা ঘেরা স্থান নিজেদের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয় এবং আকস্মিক হামলা চালিয়ে দখলে নেয়া সেই শহরটির সেনানিবাসও অস্ত্র সমর্পণে অনীহা প্রকাশ করে।

কিছুদিন পর, প্রচণ্ড গতিতে উত্তরের বাতাস বইতে শুরু করে এবং তীরের কাছাকাছি নোঙর করে থাকা তাতারদের জাহাজগুলো অযাচিতভাবে একটির সঙ্গে অন্যটি ধাক্কা খেতে থাকে। জাহাজের একদল অফিসার তখন সেখান থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই মতো সৈন্যরা নিজেদের দ্বীপ থেকে গুটিয়ে নিয়ে দ্রুত জাহাজে উঠে সাগরের দিকে রওনা হয়। তারপরও দমকা বাতাসের ঝাপটা এতটাই বাড়তে থাকে যে তাতে বেশ কয়েকটা জাহাজ ডুবে যায়। সেগুলোর লোকেরা জাহাজের ধ্বংসাবশেষের ওপর ভেসে ভেসে কোনো রকমে জিপানগু থেকে মাইল চারেক দূরের একটা দ্বীপে গিয়ে ওঠে।

অন্য জাহাজগুলো, যেগুলো ঝড়ের কবলে পড়েনি তারাও মূল ভূখণ্ডের খুব কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি এবং যেটাতে দুই সেনা প্রধানসহ তাদের অন্যান্য অফিসার অথবা লাখের বা দশ হাজারের কমান্ডারদের নিয়ে আটকা পড়েছিলেন, সেটা নিয়ে তারা দেশের দিকে রওনা হয়ে কুবলাই খানের প্রাসাদে ফিরে যান।

৩
অভিযানের ফলাফল এবং যাদের দ্বীপে ফেলে আসা হয়

জাহাজডুবি আর নেতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত যেসব তাতার সেই দ্বীপে রয়ে যান, এমন ত্রিশ হাজারের মতো লোকের কাছে অস্ত্র বা রসদ কোনো কিছুই ছিল না, ফিরে আসা সম্ভব এমন কোনো জাহাজও তাদের নেই। তাই বন্দি হওয়া বা মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা রইল না, কারণ বসবাসের অযোগ্য এই দ্বীপে আশ্রয় দেবার মতো কোনো অধিবাসী ছিল না।

ঝড় থেমে যাবার পর সমুদ্র শান্ত হয়ে আসে, তখন জিপানগুর মূল ভূখণ্ড থেকে অসংখ্য নৌকাসহ বিশাল এক সেনাদল এই জাহাজডুবি তাতার সৈনিকদের বন্দি করার জন্য এগিয়ে আসে। এবং তীরে নামার পরপরই তারা অনেকটা বিশৃঙ্খলভাবে তাদের আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে থাকে। অন্যদিকে, এই ফাঁকে তাতাররা দ্বীপের মাঝখানে উঁচু জায়গাতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। শত্রু পক্ষ তাদের ধরতে দ্রুত দ্বীপের অন্য পারে ছুটে যায়। এই সুযোগে তারা রণতরীগুলো যেখানে

নোঙর করা ছিল সেখানে যায় এবং উড়ন্ত পতাকাসহ সবগুলো নৌযান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কব্জা করে দ্বীপ থেকে সটকে পড়ে, জিপানগুর মূল ভূখণ্ডের দিকে রওনা হয়, আর পতাকার কারণে তারা বিনা বাধায় সেখানে প্রবেশ করে। সেখানে তারা নারীসহ স্বল্পসংখ্যক লোকের দেখা পায়, নারীদের নিজেদের জন্য রেখে অন্য সবাইকে তারা বিতাড়িত করে।

কী ঘটেছে সেটা জানতে পারার পর রাজা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই শহরে কড়াকড়ি অবরোধ আরোপের নির্দেশ দেন, সেটা এতটাই কার্যকরী ছিল যে এর কারণে কাউকে সেখানে ঢুকতে বা বের হতে দেয়া হয়নি, টানা ছয় মাস ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে। এই সময় অতিবাহিত হবার পর, উদ্ধারের আর কোনো আশা না থাকায়, তাতাররা জীবন রক্ষার শর্তে আত্মসমর্পণ করে।

১২৭৯ সালে এই সব ঘটনা ঘটে।* এর কয়েক বছর পর গ্রেট খান সেই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন যে তার দুজন কমান্ডারের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই অভিযানের এমন পরিণতি ঘটে। তাদের একজনের গর্দান কাটার নির্দেশ দিয়ে অন্যজনকে তিনি অসভ্য দ্বীপ জোরজাতে পাঠিয়ে দেন, সেখানে অতি জঘন্য উপায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নিয়ম প্রচলিত। তারা অপরাধীর দু'হাত গুটিয়ে শরীর এমনভাবে বাঁধে যাতে সে একটুও নড়াচড়া করতে না পারে, তারপর সদ্য পাকড়াও করা বুনো মহিষের পেছনে ঝুলিয়ে সেটাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবে অসহায় অবস্থায় অপরাধীর করুণ মৃত্যু হয়।

৪

যেভাবে জিপানগুর নরখাদক লোকেরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করে

জিপানগু [জাপান] এবং এর আশপাশের এলাকার লোকেদের বিভিন্ন আকার-আকৃতির প্রতিমা রয়েছে, এর কোনোটা ষাঁড়ের মাথাওয়ালা, কোনোটার রয়েছে শূকর, কুকুর, ছাগল বা অন্য আরো অনেক প্রাণীর মাথা। কোনোটার আবার একটা মাথা থাকলেও মুখ দুইটা; অন্য কয়েকটার তিনটা করে মাথা, এদের একটার মাথা সঠিক জায়গাতে থাকলেও, অন্য একটার মাথা আবার কাঁধের ওপর। কোনোটার চারটা করে হাত, কোনোটার দশটা, আবার কোনোটার হাতের সংখ্যা একশ', আর যার হাতের সংখ্যা সবচাইতে বেশি তাকে অধিক ক্ষমতাধর হিসেবে গণ্য করা হয়, আর তাই সেটাকে অন্যগুলোর থেকে পৃথকভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয়।

---

* চৈনিক বর্ষপঞ্জির বিবরণে এই সালটা ১২৮০ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে এবং সেখানে এই অভিযানকে কুবলাই খানের জাপান দখলের ষষ্ঠম প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১২৮৩ সালে তিনি আবারও জাপান আক্রমণের পরিকল্পনা আঁটেন কিন্তু নিজের প্রজাদের মনোভাব তার সেই বাসনাকে নিবৃত্ত করে।

খ্রিস্টানরা যখন তাদের এ কথা জিজ্ঞেস করে, কেন তারা তাদের দেবতাদের এমন আকৃতি দিয়েছে, এর জবাবে তারা জানায় যে তাদের বাপ-দাদারা এভাবেই তাদের দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে আসছে। "আমাদের পূর্বপুরুষেরা", তারা বলে, "এভাবেই তাদের বানিয়ে গেছে এবং আমরাও নিজেদের উন্নতির খাতিরে এভাবেই তা হস্তান্তর করছি।"

নানাবিধ যেসব আনুষ্ঠানিকতার মাঝ দিয়ে এইসব দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হয় তা এতটাই গর্হিত আর শয়তানসুলভ নারকীয় নিষ্ঠুর কাজকারবার যে তা এই বইতে তুলে ধরলে পাঠকদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তারপরও এই দ্বীপের পৌত্তলিক অধিবাসীদের কাজকারবার সম্বন্ধে পাঠকদের জানানো দরকার বলে মনে করছি, যখন শত্রু পক্ষের এমন কোনো লোককে তারা আটক করে যাকে দিয়ে কোনোভাবেই মুক্তিপণের অর্থ আদায় সম্ভব নয়, তখন তারা সব আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবকে বাড়িতে দাওয়াত করে। সেই কয়েদিকে হত্যা করে, মানুষের মাংস স্বাদে-গন্ধে সব ধরনের খাবারের চাইতে উৎকৃষ্ট হবার কারণে, তারপর সেই শরীরটা তারা অত্যন্ত আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে রান্না করে খায়।

জেনে রাখা ভালো যে সমুদ্রে জিপানগু দ্বীপখানা অবস্থিত তার নাম চীন [চায়না] সাগর এবং পুবের এই সাগর খুবই বিস্তৃত, নিয়মিত চলাচল করেন এমন অভিজ্ঞ চালক বা নাবিকেরা এটা খুব ভালো করেই জানেন যে এখানকার অন্তত সাত হাজার চার শত চল্লিশটা দ্বীপের জনবসতি অধ্যুষিত। জানা যায় এই সমস্ত দ্বীপে যেসব গাছগাছড়া জন্মায় তাদের প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো সুগন্ধ উৎপন্ন করে। এরা অসংখ্য প্রজাতির মসলা এবং ওষুধ উৎপাদন করে, বিশেষ করে সাদা এবং কালো এই উভয় প্রকারের লিগনাম-অ্যালো এখানে প্রচুর জন্মে।

এই দ্বীপে স্বর্ণসহ অন্যান্য আরো যেসব বস্তু পাওয়া যায় তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব; কিন্তু মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে এটা খুবই দূরে অবস্থিত, আর জাই-তুন এবং কিন-সাই বন্দর হতে আসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত নৌযানগুলোর অনেক বেশি ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করতে হয় এবং শীতকালে পাল তোলার পর গ্রীষ্মে ফিরতে হয়, এই ধরনের একটা যাত্রায় তাদের পুরো একটা বছর পার করে দিতে হয়, ফলে তাদের পক্ষে খুব বেশি একটা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এই অঞ্চলে মাত্র দুটা সামুদ্রিক বায়ু বিরাজমান; এর একটা শীতকালে এবং অন্যটা গ্রীষ্মকালে বয়; তাই সমুদ্রপথে এখানে আসাতে হলে তাদের অবশ্যই এর একটাকে বেছে নিতে হয়, আর বাড়ি ফেরার জন্য অন্যটাকে। এই দেশটা ভারত মহাদেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এখানে আমাদের এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই সমুদ্র তথা চীন সাগর [সি অব চায়না] বলতে সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট অংশকেই কেবল বোঝানো হচ্ছে, ঠিক আমরা যেভাবে ইংরেজ সাগর অথবা

ঈজিয়ান সাগর বলতে যা বুঝি, ঠিক তেমনি পুবের এই লোকেরাও চীন সাগর বা ভারত সাগর বলতে তেমন কিছু একটা বোঝায়। এই দেশ বা দ্বীপ নিয়ে এখানে আমরা এর বেশি আর কিছুই বলছি না, একইভাবে এখান থেকে আরো দূরের জায়গাগুলো সম্পর্কেও কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না, কেননা ব্যক্তিগতভাবে সেখানে ভ্রমণ করার কোনো অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, আর সেগুলো গ্রেট খানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তও ছিল না। এবার আমরা জাই-তুন-এর প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি।

জাই-তুন বন্দর ছেড়ে পশ্চিমে এবং সামান্য উত্তরে অগ্রসর হতে থাকলে, এভাবে পনেরশ' মাইল গেলে, আপনি কেইনান নামের একটা উপসাগর পেরিয়ে আসবেন, যা দুই মাসের সমুদ্রপথের দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত, উত্তর উপকূলে এটি মানজি প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত এবং সেখান থেকে এটি আনিয়া, টলোমান এবং পূর্বে উল্লেখ করা অনেক দেশের কাছাকাছি অংশ দিয়ে গেছে। এই উপসাগরে অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে, যার বেশিরভাগই জন-অধ্যুষিত। এখানকার উপকূলের কাছাকাছি তীর অঞ্চল যেখানে নদী এসে মিশেছে সেখান থেকে প্রচুর স্বর্ণ কণা আহরিত হয়। তামাসহ আরো অনেক উপাদান এখানে পাওয়া যায়, আর যেসব এলাকায় এ ধরনের উপকরণ পাওয়া যায় না সেসব অঞ্চলে সরবরাহের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে এখানকার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই মহাদেশের লোকেরাও, তাদের প্রয়োজন অনুসারে সোনা আর তামা বিনিময় করে থাকে। এর বেশিরভাগ দ্বীপেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এই উপসাগর এতই প্রশস্ত আর জনবহুল যে একে স্বতন্ত্র এক বিশ্ব বলে মনে হয়।

৫
জিম্বা দেশ এবং গ্রেট খানকে এর রাজার দেয় কর

এবার আমরা আমাদের আগের বিষয় পুনরায় শুরু করছি। জাউ-তুন ছেড়ে, একটু আগে যেভাবে বলা হলো সেভাবে, উপসাগরের ওপর দিয়ে পনের শত মাইল পথ চলার পর, আপনি জিম্বা [ইন্দো-চীন] নামের এক দেশে এসে উপস্থিত হবেন, যার সীমানা অনেক বিস্তৃত এবং দেশটি খুবই সম্পদশালী। এটা নিজস্ব রাজার দ্বারা শাসিত, সেই সঙ্গে রয়েছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষা। অধিবাসীরা পৌত্তলিক এবং বাৎসরিক রাজস্ব হিসেবে গ্রেট খানকে এরা হাতি ছাড়া আর অন্য কিছুই দেয় না। রাজস্ব প্রদানের সেই আনুষ্ঠানিকতা এবং ঘটনাটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

১২৭৮ সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে, কুবলাই, এই রাজত্বের অসাধারণ বিত্ত-বৈভবের কথা জানতে পেরে, এই ব্যাপারে সুরাহা করার জন্য বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে দেশটিতে সেই শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অনুপ্রবেশ করে, সেটাকে তাদের একজন কমান্ডার সোগাটুর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। সেই রাজার নাম ছিল এক্কাম্বেল এবং গ্রেট খানের সেনাদের মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, এটা বুঝতে পেরে নিরাপত্তার খাতিরে তিনি

অনেক দূরের দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেখানে তিনি বিক্রমের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করেন।

এদিকে তার অরক্ষিত শহর আর সমতলের অধিবাসীরা নিজেদের সব কিছু ফেলে পালাতে শুরু করে। সমস্ত রাজ্য শত্রুর দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে খুব বেশি বাকি নেই, এটা বুঝতে পারার পর রাজা গ্রেট খানের কাছে দূত প্রেরণ করেন, যাতে তারা তাদের শান্তিকামী বৃদ্ধ রাজার সনির্বন্ধ আবেদন সম্রাটের কাছে পেশ করে তার জনগণকে রক্ষা করতে পারে। রাজা তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে বাৎসরিক কিছু হাতি আর সুগন্ধি কাঠ পাঠাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

এই প্রস্তাব পাবার পর গ্রেট খান সমব্যথী হয়ে ত্বরিত সোগাটুর কাছে নির্দেশ পাঠান যাতে তিনি অধীনস্ত সেনাদের নিয়ে অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং অন্য দেশ জয় করতে অগ্রসর হন। তখন থেকে রাজা প্রতি বছর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে গ্রেট খানকে তার অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন বিশটি করে সুদর্শন আর বিশালাকার হাতি পাঠান। আর এভাবে জিম্বার রাজা গ্রেট খানের অধীনে আসেন।

এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে, এবার আমরা সেই রাজার কিছু ঘটনা আর তার দেশের কথা উল্লেখ করছি। প্রথমেই জানানো উচিত যে তার রাজত্বে রাজার দ্বারা সতীত্ব প্রমাণিত হবার আগে কোনো যুবতী মেয়ে বিয়ে করতে পারে না। যাদেরকে তিনি যোগ্য বলে মনে করেন তাদের কিছু সময়ের জন্য তার কাছে রেখে দেন এবং যখন তাদের বিদায় দেয়া হয়, নিজেদের পদমর্যাদা আর সামাজিক অবস্থান অনুসারে তারা যাতে বিয়েথা করে জীবনযাপন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাদের কিছু অর্থকড়ি সঙ্গে দেয়া হয়। মার্কো পলো, ১৯৮৫ সালে, এই জায়গা ভ্রমণ করেন, তখন সেই রাজার ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে সর্বমোট তিন শত ছাব্বিশ জন সন্তান-সন্ততি ছিল। এদের বেশিরভাগই বীর সৈনিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এই দেশে প্রচুর হাতি রয়েছে। উন্নত মানের কালো আবলুস কাঠের অনেক বনও রয়েছে, যা থেকে বিভিন্ন ধরনের চমৎকার আসবাবপত্র তৈরি হয়। এখানে এর বেশি উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু নেই। এই জায়গা ছেড়ে, এবার আমরা জাভা মেজর নিয়ে কথা বলব।

৬
জাভা দ্বীপ

জিম্বা ছেড়ে, দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্বে জাহাজ চালনা করলে, পনেরশ' মাইল পর আপনি বিশাল এক দ্বীপে এসে পৌঁছবেন, নাম জাভা। বেশ কিছু অভিজ্ঞ নাবিকের মতে, এটা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ এবং কম্পাসের মাপে এটা তিন হাজার মাইলেরও বেশি জায়গাজুড়ে বিস্তৃত, কেবল একজন রাজার দ্বারা শাসিত, এখানকার অধিবাসীরা অন্য কাউকে কর দেয় না। তারা মূর্তি পূজা করে।

এই দেশ পণ্যসম্ভারে ভরপুর। মরিচ, জায়ফল, স্পাইকনার্ড সুগন্ধিবৃক্ষ, জালানজাল কন্দ, গোলমরিচ, লবঙ্গসহ সব ধরনের মসলা আর ওষুধ, এই দ্বীপে

উৎপন্ন হয়; এসব উপকরণ রপ্তানির জন্য এখানে বহু জাহাজ ভিড়ে, আর এর থেকে সেসবের মালিকেরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লাভ করতে সক্ষম হন।

এখানে যে পরিমাণে স্বর্ণ আহরিত হয় তা সব হিসাব আর বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যাবে। তাই সাধারণত এখান থেকে জাই-তুন এবং মানজির বণিকেরা এটি রপ্তানি করে আসছে এবং এখনো প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হচ্ছে এবং এখান থেকে সংগৃহীত মসলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথ আর অভিযানের দূরত্বের কারণে গ্রেট খান দ্বীপটিকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

৭
সোন্দুর এবং কোন্দুর দ্বীপ আর লাক্ষা দেশ

জাভা দ্বীপ ছেড়ে, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে সাত শত মাইল সাগর পাড়ি দিলে, আপনি দুটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছাতে পারবেন, এদের বড়টির নাম সোন্দুর, আর ছোটটির নাম কোন্দুর; দুটি দ্বীপই জনবসতিহীন, এদের নিয়ে এর বেশি কিছু বলা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছি।

এই দ্বীপ দুটি থেকে আরো পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গেলে, আপনি বিস্তৃত আর সম্পদশালী এক প্রদেশে গিয়ে পৌঁছবেন, এটি মূল ভূখণ্ডের একটা অংশ, নাম লাক্ষা। অধিবাসীরা পৌত্তলিক। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং নিজেদের রাজা কর্তৃক শাসিত, যিনি অন্য কাউকে কর দেন না, আর এই দেশের অবস্থান এতটাই সুরক্ষিত যে এটা যেকোনো বৈরী শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আর আক্রমণ সম্ভব হলে গ্রেট খান এটাকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে মোটেই দেরি করতেন না।

এই দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্রাজিল উড [রঞ্জক-কাঠ] উৎপন্ন হয়। এত বেশি স্বর্ণ পাওয়া যায় যে তা কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন; এখানে হাতি দেখতে পাওয়া যায়, আর কুকুর বা পাখি, শিকারের জন্য এসবও অঢেল রয়েছে।

এখান থেকেই সেইসব পোর্সিলিনের খোলস রপ্তানি হয়, যা অন্যান্য দেশে নিয়ে যাওয়ার পর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। দেশটা বুনো আর পাহাড়ি বলে এখানে সচরাচর ভিনদেশিদের কেউ আসে না, তাছাড়া এখানকার রাজাও নিজের ধনভাণ্ডার আর রাজ্যের অন্যান্য গূঢ় বিষয়াদি বহির্বিশ্বের কাছে যতটা সম্ভব গোপন রাখতে বিদেশিদের এখানে আসতে নিরুৎসাহিত করেন। এসব ছাড়া এই দ্বীপ নিয়ে বলার আর বেশি কিছু নেই।

৮
পেনটান দ্বীপ এবং মালাবার রাজ্য

লাক্ষা থেকে দক্ষিণে পাঁচশ' মাইলের মতো গেলে, আপনি একটা দ্বীপে পৌঁছবেন, এর নাম পেনটান [বেনটান], যার উপকূল অনাবাদি আর বুনো, তবে এখানে প্রচুর

সুগন্ধি বৃক্ষ জন্মে। লাক্ষা আর পেনটান দ্বীপের মাঝখানে ষাট মাইলজুড়ে সমুদ্রের গভীরতা চার ফ্যাদমের বেশি নয় বলে এই স্থানে নাবিকদের হাল ছাড়াই নৌচালনায় বাধ্য হতে হয়।

এই ষাট মাইলের পর, দক্ষিণ-পূর্বে আরো ত্রিশ মাইলের মতো অগ্রসর হলে, আপনি একটি দ্বীপে পৌঁছবেন, এটাও একটা আলাদা রাজ্য, নাম মালাইয়ুর, এই একই নামে এখানকার প্রধান শহর পরিচিত। অধিবাসীরা একজন রাজার দ্বারা শাসিত এবং এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। শহরটা খুবই বড় আর সুনির্মিত। এখান প্রচুর পরিমাণে মসলা আর ওষুধ পাওয়া যায়, যার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি হয়। জায়গাটা নিয়ে এর বেশি কিছু বলার নেই। এখান থেকে আরো ভেতরের দিকে অগ্রসর হয়ে এবার আমরা জাভা মাইনরের কথা বলব।

৯
জাভা মাইনর দ্বীপ

পেনটান দ্বীপ ছেড়ে, জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্বে এক শত মাইলের মতো গেলে আপনি জাভা মাইনর দ্বীপে [সুমাত্রা] পৌঁছবেন। আকৃতিতে ছোট হলেও এর চারপাশ ঘুরে আসতে অন্তত দুই হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।

এই দ্বীপে আটটি রাজ্য রয়েছে, যা অসংখ্য রাজার দ্বারা শাসিত এবং প্রতিটা রাজ্যের আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক। এখানে অঢেল সম্পদ এবং সব ধরনের মসলা, সাপান কাঠের মতো রঞ্জক বৃক্ষ, আর বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথ আর দূরত্বের কারণে এসব এখান থেকে আমাদের দেশে রপ্তানি হয় না, তবে মানজি এবং ক্যাথিতে এসব পণ্য নিয়মিত যায়।

এবার আমরা আলাদা আলাদাভাবে এখানকার প্রতিটা রাজ্যের অধিবাসীদের বর্ণনা তুলে ধরব; তবে তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি, দ্বীপটা এত বেশি দক্ষিণে অবস্থিত যে সেখানে ধ্রুবতারা পর্যন্ত দেখা যায় না। এই দ্বীপের আটটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টিতেই মার্কো পলো সশরীরে গিয়েছেন; তিনি সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনাও দিয়েছেন, আর যে দুটাতে যাবার সৌভাগ্য হয়নি তাদের কথা বাদ দিয়েছেন।

আমরা এই আটটির একটি রাজ্য ফেলেক দিয়ে শুরু করছি। এখানকার বেশিরভাগ লোকই পৌত্তলিক, তবে সমুদ্রের কাছে অবস্থিত বন্দর নগরীতে সারাসিনদের অবাধ যাতায়াত থাকায় এইসব বণিকদের কাছ থেকে অনেকেই মুহাম্মদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। এখানকার পাহাড়ের অধিবাসীরা পশুর ন্যায় জীবনযাপন করে। এরা বাছ-বিচারহীন মানুষসহ পরিষ্কার বা অপরিষ্কার সব ধরনের জীবজন্তুর মাংস খায়। এদের পূজা-অর্চনা বিভিন্ন জিনিসকে ঘিরে, কেননা

ঘুম থেকে জাগার পর যে জিনিসটাকে প্রথমে দেখে সারাদিনভর তার ভজনা করে।

সব শেষ উল্লেখ করা রাজ্য ছেড়ে আসলে, আপনি বাসম্যান-এ প্রবেশ করবেন, যেটা অন্যগুলোর থেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভাষার অধিকারী। অধিবাসীরা গ্রেট খানের অনুগত, তবে তাকে কোনো প্রকার রাজস্ব বা শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করে না, আর এটা এত বেশি দূরে অবস্থিত যে এখানে তার সৈন্য পাঠানো যায়নি। তারপরও স্বাভাবিকভাবেই পুরো দ্বীপটা তার অধীনস্ত এবং এই পথে চলাচলরত জাহাজে করে তার কাছে দুর্লভ জিনিসপত্র আর কুরিয়ার পাঠানোর সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট ধরনের বাজপাখি।

এই দেশে অনেক বুনো হাতি আর গণ্ডার রয়েছে, যেগুলো হাতির থেকে অনেক ছোট হলেও পা দেখতে একই রকমের। এদের চামড়া অনেকটা মহিষের মতো। কপালের মাঝখানে একটা শিং রয়েছে; তবে এরা যাদের আক্রমণ করে তাদের এগুলোর সাহায্যে আহত করে না, বরং এই কাজে তারা কেবল জিহ্বার ব্যবহার করে, যেটা লম্বা আর ধারালো কাঁটায় আবৃত। এদের মাথা অনেকটা বুনো শূকরের মতো দেখতে, আর সেটাকে মাটির কাছাকাছি অবস্থানে নুইয়ে চলাফেরা করে। কর্দমাক্ত জলাশয় এগুলোর খুবই পছন্দের, আর আচরণে খুবই নোংরা। এগুলো সেইসব জন্তুর [ইউনিকর্ন] মতো নয়, যেগুলোর সম্পর্কে আমাদের ওখানকার লোকেদের ধারণা কুমারীদের দ্বারা সেসব অপহৃত হতো, এগুলো দেখতে পুরোপুরি আলাদা। এখানকার বিভিন্ন স্থানে বানর আর কালো শকুন দেখা যায়, যা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং সুন্দরভাবে এরা খাবার অনুসন্ধান করে।

জানা গেছে, এখান থেকে বামন মানব বা পিগমিদের শুকনো দেহ ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়, যা আসলে গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়, সেইসব দেহ এই দ্বীপেই বিশেষভাবে তৈরি, আর তা করা হয় এভাবে। এখানে এক বিশেষ প্রজাতির বানর পাওয়া যায়, পিগমিদের সঙ্গে এগুলোর অনেক মিল রয়েছে। যারা এগুলো ধরা ব্যবসায় পরিণত করেছে, তারা যে অংশে মানুষের লোম জন্মে সে জায়গাগুলো বাদ রেখে প্রথমেই এগুলোর লোম কামিয়ে নেয়। তারপর সেগুলোকে শুকিয়ে কর্পূর আর অন্যান্য ওষুধের সাহায্যে সংরক্ষণ করে; এবং এভাবে তা হুবহু বামন মানবদের মত দেখতে হবার পর, সেগুলোকে কাঠের বাক্সে পুরে বণিকদের কাছে বিক্রি করে, তারা সেগুলো নিয়ে গিয়ে বিশ্বের সব প্রান্তে বিক্রি করে। কিন্তু এসব নকল ছাড়া আর কিছু নয়। বুনো হবার পরও, ভারত বা অন্য কোথাও এভাবে শুকনো অবস্থায় পিগমি পাওয়া যায় না। এই রাজ্য নিয়ে যথেষ্ট বলা হলো, এখানে চোখে পড়ার মতো আর বিশেষ কিছু দেখছি না, এবার আমরা অন্য আরেকটা রাজ্যের কথা বলব, যার নাম সামারা।

১০
সামারা আর ড্রাগোইয়ান নামের রাজ্য

বাসম্যান পেরিয়ে আসলে আপনি এখানকার সামারা রাজ্যে প্রবেশ করবেন, এর মাধ্যমে দ্বীপটি বিভক্ত। প্রতিকূল বাতাসের কারণে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মার্কো পলোকে এখানে টানা পাঁচ মাস বন্দির মতো অবস্থান করতে হয়। ধ্রুবতারাসহ আরো অনেক তারা এখান থেকে দেখা যায় না। অধিবাসীরা পৌত্তলিক; তারা এক ক্ষমতাধর রাজপুত্রের দ্বারা শাসিত, যিনি গ্রেট খানের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

অনেক দিন থাকতে হবে বলে মার্কো পলো এর উপকূলের কাছাকাছি দুই হাজার লোকের একটা দলের সঙ্গে যোগ দেন। এখানকার অসভ্য আদিবাসীরা সুযোগ পেলেই দলছুটদের পাকড়াও করার পর হত্যা করে তাদের মাংস খায়। এইসব নৃশংস স্থানীয়দের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা স্থলের দিক ঘিরে গভীর এবং বিশাল এক পরিখা খনন করে, যার দু'পাশ তাদের জাহাজ যেদিকে ভেড়ানো ছিল সেদিকে বন্দরের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই পরিখাটিকে আরো দুর্ভেদ্য করার জন্য এর ওপর কয়েকটা কাঠের ঘর বা দুর্গ নির্মাণ করা হয়, এখানে এ ধরনের উপকরণ প্রচুর পাওয়া যায়। এভাবে পরিখা-প্রাচীর ঘেরা অবস্থায়, তারা দীর্ঘ পাঁচ মাস সেই বাসস্থানে নিরাপদেই কাটিয়ে দেন। এই আস্থায় স্থানীয়রাও প্রভাবিত হয়, তাই এ সময় তারা চুক্তি অনুসারে যাবতীয় রসদসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করে।

এখানকার মতো বিশ্বের আর কোথাও খাবার টেবিলে এত সুস্বাদু মাছ পরিবেশিত হয় না। গমের আবাদ না হলেও, প্রচুর ধান জন্মে। ওয়াইন তৈরি হয় না; তবে খেজুরের মতো একপ্রকার পাম [গোমুতি পাম] থেকে তারা একধরনের উন্নতমানের পানীয় প্রস্তুত করে। এর জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে গাছের শাখা কাটা হয়, রাত-দিন সেখান থেকে রস বের হতে থাকে। এবং ক্ষত চুইয়ে বেরিয়ে আসা রস সংগ্রহ করা হয়। এই মদ এতই স্বাস্থ্যকর, যে এটা পান করলে শোথসহ ফুসফুস এবং প্লীহার সমস্যার উপশম হয়। একসময় এই ডালপালাগুলোর কাটা জায়গা দিয়ে আর রস বের না হলে, তখন তারা গাছগুলোর গোড়ায় নদী থেকে এনে জল দেয়। এভাবে নল বা নালার মাধ্যমে যথেষ্ট সেচ দেবার পর আবারও সেগুলো আগের মতোই রস দিতে থাকে। কিছু কিছু গাছ স্বাভাবিকভাবেই লালচে রস দিলেও, অন্যগুলোর রস দেখতে খানিকটা ফ্যাকাসে।

এখানে ভারতীয় নারকেলও [কোকো-নাট] জন্মে, যার এক একটা মানুষের মাথার সমান, এতে দুধের মতো দেখতে মিষ্টি একধরনের খাবার জিনিস থাকে, সেটা খেতেও খুবই মজা। এর ভেতরের ফাঁপা অংশ শীতল আর স্বচ্ছ জলে পূর্ণ থাকে, যা ওয়াইন বা অন্য যেকোনো ধরনের পানীয়ের চাইতে অধিক স্বাদ আর

ঘ্রাণযুক্ত। এখানকার লোকেরা ভালো-মন্দের বাছ-বিচার না করেই সব ধরনের মাংস ভক্ষণ করে।

ড্রাগোইয়ান নিজস্ব রাজা কর্তৃক শাসিত এক রাজ্য, এর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এখানকার লোকেরা অসভ্য, মূর্তি পূজারি এবং গ্রেট খানের কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকার করে। পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে এরা বীভৎস এক প্রথা অবলম্বন করে : সে আদৌ ভালো হবে কী হবে না, তা জানার জন্য রোগীর আত্মীয়দের কাউকে গুনিনের কাছে পাঠানো হয়। সেই লোক তখন দুষ্ট আত্মার সহায়তা নিয়ে রোগের লক্ষণ বিচার করে রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনার কথা জানান। যদি তার সেরে ওঠার কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সেই আত্মীয় উক্ত রোগীর কাছে যান এবং দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার আগ পর্যন্ত নিপুণ দক্ষতায় তার মুখ চেপে ধরে রাখে। এরপর খাবার তৈরির জন্য সেই মৃতের শরীর টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। খাবার প্রস্তুত হলে আত্মীয়েরা একজোট হয়ে সব চেটেপুটে খায়, এমনকি হাড়ের মজ্জাও ফেলা হয় না। কেননা তাদের বিশ্বাস, রোগীর শরীরের কোনো অংশ ফেলে দেয়া হলে তা থেকে অনিষ্টকর জীবজন্তুর জন্ম হবে আর সেই জন্তুর মৃত্যুতে মৃতের আত্মা ভয়ানক কষ্ট পাবে। খাওয়া শেষ হলে তারা হাড়গুলোকে ছোট পরিষ্কার একটা বাক্সে নিয়ে পাহাড়ের গুহায় রেখে আসে, যাতে বুনো জানোয়ারেরা সেগুলোর নাগাল না পায়। মুক্তিপণ দিতে অক্ষম এলাকার বাইরের এমন কাউকে আটক করার পর এরা তাকে হত্যা করে গোগ্রাসে গিলে খায়।

১১
লাম্বারি এবং ফানফুর রাজ্য

একইভাবে লাম্বারিও নিজস্ব রাজা কর্তৃক শাসিত রাজ্য, এর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এই রাজ্যে কর্পূরসহ বিভিন্ন প্রকার ওষুধ পাওয়া যায়। এরা ব্রাজিল উড [রঞ্জক-কাঠ] লাগায় আর বেড়ে ওঠার পর এর ডালপালা ছেঁটে অন্যত্র স্থানান্তর করে তিন বছর রাখে। এরপর এর শেকড় থেকে রং প্রস্তুত করে। এই গাছের কিছু বীজ মার্কো পলো ভেনিসে এনে বপন করেছিলেন; কিন্তু জলবায়ু যথেষ্ট উষ্ণ না হওয়ায় সেগুলো থেকে আর গাছ বের হয়নি।

এই রাজ্যে লেজওয়ালা লোক দেখতে পাওয়া যায়, এই লেজ কুকুরের লেজের মতো এক বিঘত লম্বা, তবে এতে লোম নেই।* সংখ্যায় এরা অনেক, শহরের বদলে সবাই পাহাড়ে বসবাস করে। এখানকার বনে গণ্ডার খুব স্বাভাবিক একটা প্রাণী, এছাড়া এখানকার বনবাদাড়ে পশু-পাখিসহ প্রচুর শিকার রয়েছে।

---

* বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকা, বোর্নিও, ভারতীয় দ্বীপসমূহে এবং চীনের লেজওয়ালা মানুষের গল্প শোনো যায়, তবে এসব থেকে এর সঠিক সময়কাল সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের ইউরোপীয় গল্প থেকেও ইংরেজদের ছোট লেজ থাকার ব্যাপারে জানা যায়।

ফানফুর এই একই দ্বীপের অন্য আরেকটা রাজ্য, জায়গাটি নিজস্ব রাজা কর্তৃক শাসিত। দেশের এই অংশে এক বিশেষ ধরনের কর্পূর পাওয়া যায়, গুণে-মানে তা যেকোনো কর্পূরের চাইতে উন্নত। একে ফানফুরের কর্পূর নামে ডাকা হয় এবং স্বর্ণের ওজনে বিক্রি হয়।

এখানে গম বা ভুট্টার আবাদ হয় না, লোকেরা দুধ আর ভাত খায়, সেই সঙ্গে গাছ থেকে পাওয়া মদ পান করে। একটু আগে সুমাত্রা অংশে গাছ থেকে তা বের করার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একধরনের গাছ [সাগো ট্রি] রয়েছে, বিশেষ পদ্ধতিতে তারা সেটা থেকে একধরনের খাবার সংগ্রহ করে। এই গাছের কাণ্ড খুব মোটা, যা জড়িয়ে ধরতে দুজন মানুষের দরকার। এর বাহিরের দিক থেকে বাকল তুলে নিলে, ভেতরে তিন ইঞ্চি পুরু আরেক পরত জিনিস থাকে, আর ভেতরটা শাঁসে ভরা, যা থেকে আটা তৈরি হয়। এই শাঁস পানিপূর্ণ পাত্রে রেখে, একটা লাঠি দিয়ে থেঁতলানো হয়, যাতে আঁশসহ অন্যান্য অপদ্রব্য উপরে ভেসে ওঠে, আর খাদহীন অংশটুকু তলানি আকারে নিচে জমা হয়। তারপর পানিটুকু সরিয়ে নিয়ে আটা সংগ্রহ করা হয়। এই আটা থেকে কেকসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরি হয়। স্বাদের দিক দিয়ে বার্লির সঙ্গে এর তেমন একটা পার্থক্য নেই, মার্কো পলো প্রায়ই এই আটায় তৈরি খাবার খেতেন, এর কিছু তিনি তাদের ভেনিসের বাড়িতেও নিয়ে এসেছিলেন।

এখানে একধরনের কাঠ গাছ রয়েছে, যার সঙ্গে লোহা গাছের তুলনা চলতে পারে, পানিতে ছুঁড়ে ফেলার পর এর কাঠ সরাসরি ডুবে যায়, এর একমাথা থেকে অন্যমাথা এফোঁড়-ওফোঁড় ফেঁড়ে বাঁশের কঞ্চির মতো বেত পাওয়া যায়। তা দিয়ে স্থানীয়েরা একধরনের ছোট বর্শা তৈরি করে, এগুলো সঙ্গে বয়ে বেড়ানো আর ব্যবহার করা খুবই সুবিধা। তারা এগুলোর একপ্রান্ত সুচালো করে, আগুনে পান দিয়ে শক্ত করে, ফলে তা যেকোনো শক্তিশালী বর্ম ভেদ করতে সক্ষম, অনেক সময় লোহার বর্মও বাদ যায় না।

এখানকার রাজ্য নিয়ে বলতে গিয়ে এই দ্বীপরাষ্ট্রের ব্যাপারে যথেষ্ট বলা হলো। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে মার্কো পলোর যাবার সুযোগ হয়নি, তাই সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। আরো সামনে অগ্রসর হয়ে এবার আমরা নকুয়েরান দ্বীপের কথা বলছি।

১২
নকুয়েরান দ্বীপ

জাভা মাইনর আর লাম্বারি রাজ্য ত্যাগ করার পর, একশ' পনের মাইল সাগর পাড়ি দিলে আপনি দুটি দ্বীপ পাবেন। এর একটির নাম নকুয়েরান [নিকোবার] এবং অন্যটির নাম আঙ্গামান।

নিকুয়েরান কোনো রাজার অধীন নয়, আর এখানকার লোকেদের অবস্থা পশুর চেয়ে খুব বেশি উন্নত নয়। নারী-পুরুষ উভয়েই দেহের কোনো অংশ আবৃত না করেই অবাধে নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করে। এরা পৌত্তলিক। এখানকার বনে দরকারি আর মূল্যবান অনেক বৃক্ষ রয়েছে, এর মধ্যে সাদা-কালো চন্দন, নারিকেল, লবঙ্গ এবং রঞ্জকের জন্য সাপান বৃক্ষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। এবার আরো একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আমরা আঙ্গামান দ্বীপের কথা বলছি।

১৩
আঙ্গামান দ্বীপ

আঙ্গামান খুব বড় একটা দ্বীপ [আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ], এটাও কোনো রাজার শাসিত নয়। অধিবাসীরা পৌত্তলিক এবং এরা প্রচণ্ড বর্বর আর অসভ্য, এদের মাথা, চোখ এবং দাঁত কুকুর প্রজাতির ন্যায়। স্বভাবে এরা খুবই নিষ্ঠুর, নিজ গোত্রের নয় এমন কাউকে ধরতে পারলে তাকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে। এদের খাবার হলো দুধ, ভাত আর সব ধরনের মাংস। আমাদের ওখানে জন্মে এমন অনেক ফলই এখানে পাওয়া যায়, এছাড়াও রয়েছে নারকেল আর আপেল।

১৪
জেইলান দ্বীপ

আঙ্গামান ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাজার মাইলের সাগর পাড়ি দিলে, জেইলান [সিলন] দ্বীপের দেখা মিলবে। সত্যিকার আকৃতির কারণে এটা বিশ্বের যেকোনো দ্বীপের চেয়ে ভালো। এর বিস্তৃতি দুই হাজার চার শত মাইল, তবে আদিকালে এটা আরো বড় ছিল, তখন এর পরিধি ছিল পুরোপুরি তিন হাজার ছয়শ' মাইল, নাবিকদের চার্ট সে কথাই বলে। কিন্তু উত্তরের প্রচণ্ড দমকা বাতাসের কারণে, পাহাড়সমূহ ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গিয়ে এর কিছু অংশ সমুদ্রে ধসে পড়ে ডুবে গেছে, আর তাই দ্বীপটি তার সঠিক আকৃতি ধরে রাখতে পারেনি।

দ্বীপটা এক রাজার শাসিত, যার নাম সেন্ডর-নাজ। লোকেরা মূর্তি পূজারি এবং সব দিক থেকে স্বাধীন। শরীরের মাঝের অংশে কেবল একটুকরো কাপড় জড়িয়ে এখানকার নারী-পুরুষেরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করে। ধান আর তিল ছাড়া এখানে অন্য কোনো শস্যের আবাদ হয় না। তিল থেকে তেল হয়। এদের খাদ্য দুধ, ভাত এবং মাংস, আর এরা গাছ থেকে পাওয়া মদ পান করে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে সবচেয়ে উন্নত মানের রঞ্জক বৃক্ষ পাওয়া যায়, যা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এই দ্বীপে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান আর চমৎকার চুনি, সেই সঙ্গে নীলা, পোখরাজ, পান্না, তামড়িসহ আরো অনেক মহামূল্যবান রত্ন পাওয়া যায়। জানা যায়, এখানকার রাজার কাছে এক বিঘত লম্বা আর হাতের সমান মোটা খুব বড় বড় রুবি আছে, যা আগে কোথাও কখনোই দেখা যায়নি। এদের কোনোটাতে সামান্যতম খুঁত নেই, আর উজ্জ্বলতা ভাষার বাইরে। জাজ্বল্যমান আগুনের মতো দেখতে, এই পাথরগুলো এতই মূল্যবান যে অর্থের মাপকাঠিতে এদের দাম পরিমাপ করা হয়নি। এ ধরনের রুবি চেয়ে এই সম্রাটের কাছে গ্রেট খান কুবলাই দূত পাঠিয়েছিলেন। যার বিনিময়ে আস্ত একটা শহর দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। জবাবে তাকে জানানো হয় যে তিনি মহাবিশ্বের যাবতীয় ধনভাণ্ডারের সম্পদের বিনিময়েও এসব বিক্রি করবেন না; কোনোভাবেই এদের দেশের বাইরে পাঠাবেন না, কেবল তার বংশধরেরাই বংশপরম্পরায় এদের পাবেন। ফলে গ্রেট খানের হাতে এর কোনোটাই পৌঁছেনি।

এখানকার লোকেদের কেউই সৈনিক নয়, বরং এর উল্টো, বেশিরভাগই দরিদ্র আর ভীরু, কাপুরুষ ধরনের। ঘটনাক্রমে এখানে কাউকে সৈনিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও, তাদের সবাইকে দেশের বাইরে থেকে আনা হয়।

১৫

সগোমোন বারচান-এর কাহিনি এবং পৌত্তলিকতার শুরু

এই জেইলান [সিলন] দ্বীপে একটা পাহাড় আছে, পাথুরে আর বৃষ্টিবহুল এই পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করা একপ্রকার অসম্ভব। জানা যায়, এতে আরোহণের জন্য লোহার শেকল ব্যবহার করা হয়, আর এর সাহায্যে কিছু লোক তার শীর্ষে পৌঁছেছে, তারা সেখানে আমাদের আদি পিতা আদমের কবরের সন্ধান পেয়েছে। এটা সারাসিনদের মত। কিন্তু পৌত্তলিকদের মতে সেখানে আসলে সগোমন বারচান [বুদ্ধ]-এর দেহাবশেষ রয়েছে, ইনি তাদের ধর্মের স্থপতি এবং এদের সবাই তাকে সর্বোচ্চ সিদ্ধপুরুষ বলে গণ্য করে।

তিনি এই দ্বীপেরই এক রাজপুত্র ছিলেন, নিজেকে এক পুণ্যজীবনে নিয়োজিত করে তিনি রাজ্যপাটসহ যেকোনো ধরনের পার্থিব উপকরণ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে তার বাবা তাকে সেই পথ থেকে বিচ্যুত করতে নারীসহ কল্পনাসাধ্য সব ধরনের বাসনা পূরণে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। একে একে রাজার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে অবশেষে সেই যুবক পালিয়ে একাই এই দুর্গম পর্বতে আরোহণ করেন। সেখানে, কৌমার্য-ব্রত আর কঠোর তপস্যার মাধ্যমে জীবনযাপন করার পর অবশেষে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন।

পৌত্তলিকদের কাছে তিনি তপঃসিদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। সেই বাবা প্রচণ্ড মর্মন্তুদ দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে, নিজের ছেলের আদলে সোনার এক মূর্তি গড়ান

এবং দ্বীপের অধিবাসীদের সবাইকে দেবতা জ্ঞানে সেই মূর্তির পূজাঅর্চনা আর সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। এর থেকেই এই দ্বীপের পৌত্তলিকদের এমনতর ধর্মের উৎপত্তি; আর আজও সগোমোন বারচান [বুদ্ধ] সবার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে খ্যাত।

এই বিশ্বাসে, তিনি যেখানে কবরস্থ আছেন সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা এসে জড়ো হন। তার কিছু চুল, দাঁত এবং ব্যবহারের জন্য তিনি যে পাত্র তৈরি করেছিলেন, সেসব আজও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে এবং খুব আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে প্রদর্শিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে, সারাসিনেরাও মনে করে এগুলো তাদের নবি আদমের, আর একইভাবে তারাও পরম বিশ্বাসের সঙ্গে এই পাহাড়ে আরোহণ করে।

১২৮৪ সালের দিকে, গ্রেট খান সেখানে গিয়েছিলেন এমন একজন সারাসিনের কাছে আমাদের আদি পিতার এইসব নিদর্শন সম্বন্ধে জানতে পারেন। তখন থেকে সেসব পাবার জন্য তার মনে গভীর বাসনা জন্মে, তাই তিনি সেসবের কিছু চেয়ে জেইলান রাজার কাছে দূত পাঠাতে রাজি হন। দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর, অবশেষে তার দূতেরা গন্তব্যের সেই প্রাসাদে পৌঁছতে সক্ষম হন। এবং রাজার কাছ থেকে পেছনের দুটা বড় দাঁত, সেই সঙ্গে কিছু চুল এবং সবুজ পাথরের সুদৃশ্য একটা পাত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। গুপ্তচর মারফত দুর্লভ সব নিদর্শনসহ তার দূতেদের আগমনের কথা জানতে পারার পর সেসব দেখতে গ্রেট খান কানবালুর সব লোকেদের শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসে একত্রে জড়ো হবার নির্দেশ দেন এবং তাদের সবাই তখন প্রচণ্ড ঐকান্তিকতা আর জাঁকজমকের সঙ্গে তার সামনে উপস্থিত হন। জাইলানের সেই পাহাড়ের কথা যথাযথভাবে তুলে ধরার পর এবার আমরা মাবার রাজ্যের [ভারত] দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

১৬
মাবার প্রদেশ

জাইলান দ্বীপ ছেড়ে পাল খাটিয়ে ষাট মাইল পশ্চিমে গেলে আপনি মস্ত এক প্রদেশ মাবার পৌঁছুবেন, এটা আসলে দ্বীপ নয়, বরং বৃহত্তম ভারতের একটা অংশ মাত্র। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত আর সম্পদশালী রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত।

জায়গাটা চারজন রাজার দ্বারা শাসিত, যাদের প্রধানতমের নাম সেন্দের-বান্দি। তার রাজ্যের মাবার এবং জেইলান অংশের মধ্যবর্তী উপসাগরের অংশে মুক্তার চাষ হয়, এই অংশে সাগরের গভীরতা দশ থেকে বারো ফ্যাদমের বেশি নয়, আর কিছু কিছু স্থানে এই গভীরতার পরিমাণ দুই ফ্যাদমের মতো।

মুক্তার চাষের ব্যবসা এভাবে পরিচালিত হয়। আলাদা আলাদা কোম্পানির অসংখ্য ব্যবসায়ী সদস্যেরা বিভিন্ন আকারের নৌতরী আর জলযান নিয়ে সাগরের

এই অংশে এসে নোঙর করে। এদের সঙ্গে সাগর থেকে ঝিনুক তুলতে পারে এমন দক্ষ একদল ডুবুরি থাকে। এই ঝিনুকের ভেতরেই মুক্তা পাওয়া যায়। ডুবুরিরা নেটের ব্যাগ গায়ে বেঁধে বারবার সাগরে ডুব দিয়ে ঝিনুক খুঁজতে থাকে। শ্বাস ধরে রাখা সম্ভব না হলে তারা উপরে উঠে আসে। এবং খানিক বিরতির পর আবারও সাগরে ডুব দেয়। বেশিরভাগ মুক্তাই এই উপসাগর থেকে আহরিত হয়, এখানকার মুক্তা গোলাকার এবং খুব দ্যুতিময়। যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি ঝিনুক তোলা হয় তার নাম বেটালা, জায়গাটা মূল ভূখণ্ডের তীরে অবস্থিত।

এই উপসাগর নানা ধরনের বড় মাছের উপদ্রব খুব বেশি, প্রায়ই এরা ডুবুরিদের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়, ব্যবসায়ীরা তাই সতর্কতার অংশ হিসেবে বার্মিন নামের এক গোত্রের জাদুকরদের সঙ্গে নেন। নিজেদের রহস্যজনক ক্ষমতা ব্যবহার করে এরা মাছগুলোকে স্তম্ভিত করে দিতে পারে, তাতে করে এদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। কেবল দিনের বেলাতেই মুক্তা আহরিত হয় বলে সন্ধ্যা নামার পর এরা তাদের সেই জাদুকরী প্রভাব বন্ধ রাখে, যাতে অসৎলোকেরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাতের বেলা ঝিনুক চুরি করতে না পারে। একইভাবে এই জাদুকরেরা অন্যান্য পশু-পাখিদেরও মন্ত্রমুগ্ধ করতে সক্ষম।

এপ্রিলের শুরু থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই মুক্তা আহরণ অব্যাহত থাকে। রাজাকে দশ ভাগের এক ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই কেবল এই আহরণের অনুমতি মিলতে পারে। জাদুকরেরা বিশ ভাগের এক ভাগের বিনিময়ে কাজ করে এবং তারা নিজেদের জন্য লাভের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সংরক্ষিত রাখে। উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হবার পর ঝিনুকের মজুদ একেবারেই ফুরিয়ে যায়; এবং নৌযানগুলোকে তখন উপসাগর হতে তিন শত মাইল দূরে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়, সেখানে তারা সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবস্থান করে। মুক্তার যে এক-দশমাংশ ভাগ রাজা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, এর জন্য তিনি বড় বড় সুগঠিত মুক্তাই বেশি পছন্দ করেন; আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতি এমন উদার তাই বণিকেরাও সেগুলো তার কাছে নিয়ে যেতে মোটেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না।

১৭
মাবার প্রদেশ নিয়ে আরো কিছু কথা

দেশের এই অংশের স্থানীয়েরা সব সময় নগ্ন থাকে, কেবল একটুকরো কাপড় দিয়ে এরা দেহের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখে।

বাকিদের চাইতে রাজার কাপড়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, এছাড়াও তার সঙ্গে আরো একটা বড় কাপড় থাকে এবং সেই সঙ্গে আরো থাকে তার সম্মান- প্রতিপত্তি নির্দেশক বিভিন্ন ধরনের গহনাগাটি, যেমন মহামূল্যবান হীরা, মানিক, চুনি, পান্নসহ

আরো অনেক মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি এক কেতা গলবন্ধনী। তিনি আরো কিছু মিহি রেশমি সুতো পরেন, এদের প্রতিটিতে এক শত চারটি করে মুক্তা এবং রুবি রয়েছে, সেগুলো তার গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলে থাকে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যার মানে, ধর্মীয় কারণে দেবতার সম্মানে তাকে দিনে বহুবার প্রার্থনা বা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়; সেটা থেকে তার বংশের লোকেরা কখনো বিচ্যুত হয়নি। প্রতিদিনের সেই প্রার্থনায় এই শব্দসমূহ থাকে, প্যাকাউকা, ফ্যাকাউকা, ফ্যাকাউকা, যা এক শত চার বার করে উচ্চারণ করতে হয়। প্রতি বাহুতে তিনি তিনটি করে স্বর্ণের বালা পরেন, যা মণি-মুক্তায় খচিত থাকে; পায়ের আলাদা আলাদা তিনটি অংশে একই রকমের মণি-মুক্তা খচিত বন্ধনী পরেন; আর হাত-পায়ের আঙুলসমূহে মহামূল্যবান সব আংটি পরিধান করেন। তার রাজ্যে এ ধরনের আরো অনেক মহামূল্যবান হীরা, মণি, মুক্তা পাওয়া যায় বলে, সেই রাজকীয় আভিজাত্য প্রকাশের জন্য রাজাকে এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ রাজভূষণ পরতে হয়।

তার অন্তত পাঁচ শত পত্নী এবং উপপত্নী রয়েছে এবং যখনই তিনি এমন কোনো নারীকে দেখেন যার সৌন্দর্য তাকে অভিভূত করেছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে পাবার বাসনা চরিতার্থ করেন। একইভাবে তিনি তার ভাইদের বউদেরকেও আত্মসাৎ করেছেন, তবে এরা কৌশলী এবং বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও, এ নিয়ে তেমন একটা উচ্চবাচ্য করেননি।

এই রাজার অধীনে অনেক বীরযোদ্ধা রয়েছে, যাদেরকে "ইহকাল এবং পরকালে রাজার প্রতি অনুরক্ত" এই নামে ডাকা হয়ে থাকে। এদের সবাই দরবারসহ রাষ্ট্রীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে তাদের সঙ্গ দেন এবং সর্বদা তার সঙ্গে শোভাযাত্রাসহকারে গমনাগমন করেন। এদের সবাই এই রাষ্ট্রের সর্বত্র উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজার মৃত্যুর পর যখন তার শবদেহ আগুনে পোড়ানো অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সে সময় এই সমস্ত রাজভৃত্যদের সবাই স্বেচ্ছায় নিজেদের সেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং পরকালে রাজার সঙ্গী হবার আশায় নিজেদের রাজকীয় শবদেহের সঙ্গে চিরতরে নিঃশেষ করে দেন।

একইভাবে আরো রীতি প্রচলিত রয়েছে। এখানকার কোনো রাজা মৃত্যুবরণ করার পর যে ছেলে তার উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তিনি পূর্ববর্তী রাজার রাশিকৃত সম্পদে হস্তক্ষেপ করেন না, যাতে এর মাধ্যমে তার শাসন করার সক্ষমতা নিয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উঠতে না পারে। যদি সমস্ত অঞ্চলের মালিকানা রেখে যান, তাহলে তিনি বাবার মতো ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার সক্ষমতা প্রদর্শন করেন না। ঘটনাক্রমে এ ধরনের দূরাগ্রহের মাধ্যমে এমনটা ধরে নেয়া হয় যে পূর্ববর্তী বংশধরেরা অঢেল সম্পদের মজুদ রেখে গেছেন।

এখানে কোনো ঘোড়া জন্মে না, রাজা এবং তার তিন ভাই প্রতি বছর বণিকদের কাছ থেকে ঘোড়া কেনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এইসব বণিকেরা এখানে প্রচুর ঘোড়া আমদানি করে এবং এর রাজস্ব থেকে প্রচুর অর্থও

আয় হয়। তারা একসঙ্গে পাঁচ হাজারের ওপর ঘোড়া আমদানি এবং তার প্রতিটা পাঁচশ' স্বর্ণ স্যাগিতে বিক্রয় করেন, যা এক শত রৌপ্য মার্কের সমান। বছর শেষে সম্ভবত এর তিনশ'র কিছু বেশি জীবিত থাকে, আর তাতে করে সেসবের বদলে নতুন ঘোড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে আমার নিজস্ব মত হলো, এই প্রদেশের জলবায়ু ঘোড়ার জন্য প্রতিকূল, আর এ কারণেই এদের সংরক্ষণ বা বংশবৃদ্ধিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। খাবার হিসেবে এগুলোকে মাংসের সঙ্গে ভাত রান্না করে বা অন্যান্য রান্না করা মাংস দেয়া হয়, এখানে ধান ছাড়া অন্য কোনো শস্য জন্মে না। যদিও এখানে বড় আকারের খচ্চর এবং চমৎকার ঘোড়ার মাধ্যমে দুর্বল প্রকৃতির বিকৃত পায়ের অশ্ব-শাবক জন্মে, যা চড়ার অনুপযোগী।

এখানে আরো একধরনের অভূতপূর্ব রীতি প্রচলিত আছে। যখন কোনো লোক এমন কোনো অপরাধ করে, যার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়, তখন তার ইচ্ছে অনুসারে নির্দিষ্ট দেবতার সম্মানে বলি দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তার আত্মীয়স্বজনেরা জড়ো হয়ে তাকে বিশেষ ধরনের চেয়ার এবং খুব মজবুত আর উন্নতমানের বারোটা ছুরি দেয়। এর জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়, সেখানে সেই সাহসী লোক দেবতার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গের উদ্দীপনার প্রচণ্ডতায় নিজেকে হত্যা করেন। রায় কার্যকর করার স্থানে উপস্থিত হবার পর, সে তার মাঝ থেকে দ্রুত দুটি ছুরি তুলে নেয় এবং চিৎকার করে বলে ওঠে, "আমি অমুক দেবতার সম্মানে তার প্রতি আমার আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ নিজেকে উৎসর্গ করছি"—এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে নিজের উরুতে আঘাত হানে, অন্যটা দিয়ে হাতে, অন্য দুটা দিয়ে পেটে, আরো দুটা দিয়ে বুকে। এভাবে একেকটা ছুরি দিয়ে দেহের এক এক অংশে পর পর আঘাত হানতে থাকে। আর প্রতিবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। আর সবশেষে সর্বশেষ ছুরিটা নিজের বুকে বসিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই দৃশ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়েরা প্রচণ্ড বিজয়োল্লাস আর আনন্দের সঙ্গে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে পোড়াতে এগিয়ে আসে; এবং তার স্ত্রী, স্বামীর প্রতি ধর্মীয় সম্ভ্রমের কারণে, নিজেকে সেই আগুনের স্তূপে নিক্ষেপ করে, তার সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেসব নারী এমন দৃঢ়তা প্রদর্শন করে তারা সমাজে খুবই প্রশংসিত হন, অন্যভাবে বলতে গেলে, যারা এর থেকে পিছিয়ে আসেন তাদের সবার অবজ্ঞা আর গালাগাল সহ্য করে বাকি জীবনটুকু বেঁচে থাকতে হয়।*

এই রাজ্যের পৌত্তলিক অধিবাসীদের বেশিরভাগই ষাঁড়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; এবং এখানকার কাউকেই কোনোভাবেই এর মাংস খেতে রাজি

---

* এক নির্দয় সরকার ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করে; তারপরও বলা যায় আজও তা টিকে আছে। উলিয়াম আর্চারের ইনডিয়া এন্ড ফিউচার দেখুন।

করানো সম্ভব নয়। তবে গাউই নামের বিশেষ গোত্রের লোকেরা ষাঁড়ের মাংস খেলেও, তারা এই পশুকে হত্যার সাহস দেখায় না। তবে স্বাভাবিকভাবে সেটা মৃত্যুবরণ করলে তারা সেটা খায়।

এখানকার লোকেরা সবাই গোবর দিয়ে তাদের বাড়ি লেপন করে। এরা মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপর বসে এবং এভাবে বসার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে বলে, মাটির ওপর বসা খুবই সম্মানজনক; কেননা আমরা সবাই মাটি থেকেই উদিত হয়েছি, আর আমাদের সবাইকে আবার সেখানেই ফিরে যেতে হবে; তাই যারা একে উপযুক্ত সম্মান দেয় না, তারা কমবেশি একে অবজ্ঞা করে থাকেন। এই গাউই এবং তাদের পুরো গোত্রের পূর্বপুরুষেরাই যিশুর বারোজন শিষ্যের একজন সেইন্ট টমাসকে হত্যা করেছিলেন। আর সম্ভবত এ কারণেই এই গোত্রের কাউকেই তার সমাধিক্ষেত্রের দালানে ঢুকতে দেয়া হয় না। পবিত্র সেই মরদেহের আধিভৌতিক ক্ষমতা এতই বেশি যে, সেখানে কেবল দশজন লোককে তার পাহারায় রাখা হয়েছে।

এখানে ধান আর তিল ছাড়া অন্য কোনো শস্যের আবাদ হয় না।

এখানকার লোকেরা বর্শা আর ঢাল নিয়ে যুদ্ধে যায়, কিন্তু কাপড় পরে না এবং এরা খুবই জঘন্য সৈনিক। খাবার জন্য গবাদিপশু বা অন্য কোনো পশু হত্যা করে না, কিন্তু ভেড়া বা অন্য কোনো পশু বা পাখির গোস্ত খেতে ইচ্ছে হলে, সারাসিনদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করে, কারণ ধর্ম অনুসারে তাদের এই একই প্রথা অনুসরণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলে এরা কসাইয়ের কাজ করে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুবার নারী-পুরুষ উভয়েই সারা শরীর ধৌত করে। গোসল সম্পন্ন না হলে এদের কেউই পান-ভোজন করে না; এবং যে এই রীতি অবহেলা করে তাকে ব্যতান্ত্রিক বলে গণ্য করা হয়। জানা গেছে যে তারা শুধু ডান হাতে খাবার খায়, কেউই বাম হাতে খাবার স্পর্শ পর্যন্ত করে না। পরিচ্ছন্ন এবং সব ধরনের সূক্ষ্ম কাজে তারা ডান হাতের ব্যবহার করে এবং ধোয়া-মোছার মতো অপরিচ্ছন্ন আর বেমানান কাজ, যেমন শরীরের গোপন অংশ ধুতে নিজের বাম হাতখানা সংরক্ষিত রাখে। এরা নির্দিষ্ট পাত্র থেকে পান করে এবং সবাই নিজের জন্য আলাদা আলাদা পানপাত্র রাখে, অন্যের পানপাত্রে কেউ পান করে না। পান করার সময় এদের কেউই সেই পাত্রে মুখ লাগায় না, বরং মাথার ওপর ধরে তা থেকে তরল মুখে ঢালে যাতে পানপাত্র মুখ স্পর্শ না করে। অপরিচিত কাউকে পান করাবার সময়, এদের কেউই তাদের পানপাত্র সরাসরি হাতে তুলে না দিয়ে, মদ বা অন্যান্য পানীয় সেই লোকের হাতে ঢেলে দেয়, আর সেই হাত থেকেই তাকে কাপের মতো পান করতে হয়।

অপরাধীদের এখানে কঠিন বিচারের মুখোমুখি হতে হয়। দেনাদারদের জন্য এখানে এ ধরনের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। পাওনাদারের পাওনা পরিশোধে দেনাদার যদি বারবার মিছে আশ্বাস দিতে থাকে, তাহলে পাওনাদার তার লোকজন জড়ো করে

তাকে ঘিরে ধরে এবং পাওনা পরিশোধ বা উপযুক্ত আশ্বাসের আগপর্যন্ত তাদের কেউ সেই জায়গা ছেড়ে যায় না। এই অবস্থায় পালাবার চেষ্টা করলে আইনের বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে সে নিজেকে মৃত্যু ঝুঁকিতে ফেলবে।

মেসীয়র মার্কো, এই দেশ থেকে বাড়ি ফেরার সময় এ ধরনের একটা ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন। বিদেশি এক বণিকের কাছে সেখানকার রাজার কিছু ঋণ ছিল এবং তার কাছে বারবার পাওনা পরিশোধের তাগাদা দেয়া হলেও, তিনি তা শোধ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সময়ক্ষেপণ করছিলেন। একদিন রাজা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন সেই বণিক সুযোগ বুঝে তাকে লোকজন নিয়ে ঘিরে ফেলে। কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা আঁচ করার পর রাজা ঘোড়াসমেত দাঁড়িয়ে পড়ে এবং বণিকের পাওনা পরিশোধের আগে ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে বের হতে পারেন না। কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা দেখার জন্য আশপাশের লোকেরা এসে জড়ো হয় এবং সেখানে রাজাকে দেখতে পেয়ে তারা খুবই অবাক হয়, আর বলাবলি করতে থাকে নিজেকে আইনের হাতে সোপর্দ করে তিনি নিজের প্রতি সবচেয়ে বেশি সুবিচার করেছেন।

এখানকার লোকেরা আঙুরের তৈরি মদ পানে বিরত থাকে; এবং কেউ সেই মদ পানরত অবস্থায় ধরা পড়লে, এমনই কলঙ্কজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হন যে আদালতও তার প্রমাণাদি গ্রাহ্য করে না। বারবার সাগরে যায় এমন লোকেদের জন্যও একই ধরনের শাস্তি প্রচলিত, তাদেরও ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হয় এবং আদালত তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। তাই এখানকার লোকেরা অপরাধের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত।

এই দেশে গরম খুব বেশি আর তাই এখানকার লোকেরা নগ্ন হয়ে চলাফেরা করে। জুন, জুলাই আর আগস্ট মাস ছাড়া এখানে বৃষ্টি হয় না এবং এই তিন মাস বৃষ্টিতে এখানকার বাতাস শীতল না হলে এখানে জীবনধারণ খুবই কঠিন হতো।

এখানে মুখাবয়ব দেখে চারিত্রিক গুণাবলি নির্ণয়ের অনেক বিশেষজ্ঞ লোক রয়েছে, এর মাধ্যমে মুখ দেখেই নারী-পুরুষের ভালো-মন্দ গুণাগুণ বিচার করা হয়। কোনো পশু-পাখি দেখলে কী ঘটবে সেটাও এরা জানে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বুঝতে পাখির উড্ডয়ন পথকে এখানকার লোকেরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। সপ্তাহে প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময়কালকে তারা অশুভ মনে করে এবং এ সময় যেকোনো ধরনের কেনাকাটা বা ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে বিরত থাকে, তাদের ধারণা সেই সময়ে তারা কোনোভাবেই সফল হতে পারবে না। সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে এখানকার লোকেরা সময় নির্ণয় করে।

ছেলে বা মেয়ে হোক, কোনো শিশু জন্ম নেবার পর বাবা অথবা মা তার জন্মস্থানসহ জন্মের দিন-তারিখ লিখে রাখেন; এমনকি চাঁদের বয়সও মাসের নাম আর ঘণ্টাসহকারে টুকে রাখা হয়। পরবর্তীকালে যাতে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তার সব কাজকারবার পরিচালিত হতে পারে সে জন্যই এমনটা করা হয়।

ছেলে তেরো বছরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তখন তাকে আর বাবার বাড়িতে থাকতে হয় না; তাদেরকে তখন ব্যবসাপাতির মাধ্যমে আপনা থেকে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহের জন্য পুঁজি হিসেবে বিশ থেকে চব্বিশ গ্রোট দেয়া হয়। তারা তখন সারাদিন ধরে এক জায়গা থেকে জিনিসপত্র কিনে অন্যত্র গিয়ে বিক্রি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুক্তা আহরণের ঋতুতে তারা সাগর পারে গিয়ে সাধ্যমতো পাঁচ-ছয়টা বা ছোট আকারের আরো বেশিসংখ্যক মুক্তা কিনে, সেগুলো বণিকদের কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। বণিকেরা তখন অত্যধিক সূর্য তাপের কারণে ঘরে থাকে, আর এদের কাছে মুক্তা নিয়ে গেলে তাদের বলে : "এই মুক্তা আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান; ন্যায্য লাভ হবে তোমরা এমন দাম চাও।" বণিকেরা তখন তাদের পাওনা থেকে কিছু বেশিই দেয়। এভাবে তারা আরো অনেক পণ্য বিক্রয় করতে করতে একসময় পাকা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। দিনের কাজকারবার শেষ করে তারা বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে আর রান্না করে দেবার জন্য তা মায়ের কাছে দেয়, আর বাবার কোনো কিছু খায় না।

শুধু এই দেশই নয়, সারা ভারতজুড়ে যেসব পশু-পাখি দেখা যায় সাধারণভাবে তা আমাদের ওখান থেকে আলাদা। কেবল কোয়েল বাদে, এই পাখিটা হুবহু আমাদের মতোই। এখানকার বাদুড়গুলো শকুনের সমান, আর শকুনগুলো কাকের মতো কালো, যা আমাদেরগুলো থেকে অনেক বড়। এগুলো খুব দ্রুতগতিতে উড়তে পারে আর এদের কবল থেকে কোনো শিকারই পালিয়ে বাঁচতে পারে না।

এদের মন্দিরসমূহে অসংখ্য প্রতিমা রয়েছে, যার বেশিরভাগই নারী-পুরুষের আদলে তৈরি; আর এই দেব-দেবীর প্রতি বাবা-মায়েরা তাদের কন্যা উৎসর্গ করে। এই দেব-দেবীর প্রতি এরা এতটাই আত্মনিবেদিত যে তাদের তুষ্টি বিধানে আশ্রমের পুরোহিতের জন্য সব কিছু করে। অনুষ্ঠানের সময় সেখানে উপস্থিত থেকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নাচ-গান করে উৎসবের আমেজকে পরিপূর্ণতা দান করে। এই কুমারীরা সংখ্যায় অনেক। সপ্তাহে বেশ কয়েকবার এরা দেব- দেবীকে খাবার উৎসর্গ করে, আর এই খাবারকে তারা ভাগ হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে মূর্তিগুলোর সামনে টেবিল পাতা থাকে, সেখানে খাবার সাজিয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবেদনময়ী খেয়ালি ভঙ্গিতে নৃত্যের তালে তালে গীতবাদ্য পরিবেশন করে। উচ্চপদস্থ একজন লোকের খাবার খেতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ ধরে তা চলতে থাকে। এরপর তারা দেবতার আত্মা পরিতুষ্ট হয়েছেন বলে ঘোষণা করে, তাদের ঘিরে সেসব খেতে শুরু করে। বিয়ের আগপর্যন্ত তারা প্রতি বছর বেশ কয়েকবার করে এ ধরনের উপচারসমেত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে থাকে।

কুমারী নারীদের এভাবে একত্রে আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে এবার তা তুলে ধরা হচ্ছে : পুরহিতেরা বলেন, সুরসিকতার হীনতার কারণে এবং দেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতা তার সঙ্গে মিলিত, এমনকি কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন; তাই তাকে শান্ত করবার কোনো পদক্ষেপ নেয়া না হলে

আশ্রম সংশ্লিষ্ট সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা স্বর্গীয় করুণা আর আশীর্বাদের সব কিছুই তাদের মাঝে নিহিত। তাই, তারা চান কুমারী নারীরা যেন নগ্ন হয়ে, কেবল কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে, সেই দেব-দেবীর সামনে নৃত্য-গীতবাদ্য পরিবেশন করে। এদের বিশ্বাস দেবতারা এই সব দেবীদের সঙ্গলাভ করে খুবই আনন্দিত বোধ করেন।

নিজেদের ব্যবহারের জন্য স্থানীয়েরা বেত বুনে হালকা একধরনের খাট তৈরি করে, এগুলো এমনভাবে বানানো হয় যাতে একটি মাত্র সুতো টেনে পর্দা সরিয়ে একাধারে শোয়া-বসার কাজে ব্যবহার করা যায়। টেরানটুলার কামড়, আর মাছিসহ আরো অনেক ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য এভাবে জিনিসটা বানানো হয়; আর একই সঙ্গে অত্যধিক গরম থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে উচ্চপদস্থ আর ভাগ্যবানেরাই কেবল সেসব উপভোগ করে, নিচু জাতসহ অন্যরা সবাই রাস্তাঘাটে উন্মুক্ত পরিবেশে শুয়ে থাকে।

১৮
সেন্ট টমাসের পবিত্র সমাধি এবং এক আধিভৌতিক ঘটনা

এই মাবার প্রদেশে ধর্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী প্রভু যিশুর বারোজন শিষ্যের একজন শহিদ হন, মহিমান্বিত সেই সেইন্ট টমাসের মরদেহ এখানেই কাছের এক ছোট্ট শহরে [মাদ্রাজের কাছে] চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে। যাতায়াতের অসুবিধার কারণে বণিকেরা সচরাচর এদিকটায় আসেন না। এখানে বিপুল পরিমাণ খ্রিস্টান আর সারাসিনের বাস। এখানকার লোকেরা তাকে মহান এক ঋষি গণ্য করে, তাকে এনাইয়াস নামে ডাকে, যার মানে "পবিত্র মানুষ"।

যে স্থানে তাকে হত্যা করা হয়, তীর্থযাত্রীরা সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে, লাল রঙের সেই মাটি তারা পরমভক্তিতে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; পরবর্তীতে এর দ্বারা অলৌকিক সব কর্ম সম্পাদন করা হয় এবং পানিতে গুলিয়ে তা অসুস্থদের দেয়া হলে, এর সাহায্যে তাদের অনেক অসুখ ভালো হয়।

১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে, এ দেশের একজন ক্ষমতাধর ধনাঢ্য ব্যক্তি, প্রচুর ফসল তোলেন, সেই ধানের সবটা মজুদ করার মতো জায়গা তার গোলাতে ছিল না, তিনি তাই সেগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সেইন্ট টমাস চার্চের মালিকানাধীন একটা ধর্মীয় ভবনে এর সবটা জমা করেন। যারা সেই গৃহের দায়িত্বে ছিলেন তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই কাজটা করা হয়, সমাধি দেখতে আসা তীর্থযাত্রীদের বাসস্থান হিসেবে সংরক্ষিত ভবনটি এভাবে দখল না করার জন্য তারা তার কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানায়। কিন্তু পৌত্তলিক শস্য সরিয়ে নিতে অস্বীকার করে। সেই রাতে সেইন্ট টমাস তাকে দর্শন দেন, তিনি তখন হাতে একটা কাঁটা ধরে ছিলেন, সেটা তিনি সেই ব্যারনের গলায় ঠেকিয়ে বলেন, "যদি

তুমি শীঘ্র আমার গৃহের দখল ছেড়ে না যাও তাহলে আমি তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করব।" চিৎকার দিয়ে জেগে উঠে সেই ব্যারন তাকে যা করতে বলা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তা পালনের নির্দেশ দেন, জনসমক্ষে ঘোষণা করে সবাইকে জানান যে তিনি সেইন্টকে আপন মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। রোগ বা বিকলাঙ্গতা থেকে সেরে ওঠাসহ এখানে এ রকম কোনো না কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে।

যেসব খ্রিস্টান এই চার্চের সেবায় নিয়োজিত আছেন তারা ভারতীয় নারকেলের বাগান গড়ে তুলেছেন আর এই বাগানের নারকেল বিক্রি করে তারা জীবিকা উপার্জন করে থাকে। বাগানের প্রত্যেক গাছের জন্য রাজার এক ভাইকে তারা মাসে এক গ্রোট করে রাজস্ব প্রদান করেন।

সেই পবিত্র সেইন্ট এভাবে নিহত হন। একবার প্রার্থনা শেষে তিনি এক আশ্রম থেকে সবে বেরিয়ে এসেছেন। তার চারপাশে তখন অনেকগুলো ময়ূর ঘোরাফেরা করছিল। সে সময় এখানে এ ধরনের পাখি প্রচুর দেখা যেত। গাউই গোত্রের এক পৌত্তলিক তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। সে পবিত্র এই ঋষির উপস্থিতি টের পাননি। ফলে লোকটা না বুঝেই, একটা ময়ূরের দিকে তীর ছুঁড়ে, আর সেটা সেই ময়ূরটার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সেইন্টের গায়ে গিয়ে লাগে। আহত হয়েছেন, এটা বুঝতে পারার পর ঈশ্বরের কাছে সব কিছুর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করার মতো খুব কম সময়ই তিনি পেয়েছিলেন এবং এর পরপরই আত্মসমর্পিত চিত্তে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

এই প্রদেশের স্থানীয়েরাও কালো, তবে জন্মের সময় তারা এতটা কালো থাকে না। কালো তাদের কাছে সৌন্দর্য হিসেবে গণ্য। আর এ কারণেই তারা জন্মের পর কৃত্রিমভাবে শরীর কালো করে। আর এর জন্য এরা তিন বেলা শিশুর গায়ে তিলের তেল মাখে। ছবিতে তারা নিজেদের দেবতাকে কালো রঙে আর শয়তানকে সাদা রঙে চিত্রিত করে, কেননা তাদের ধারণা সব অপদেবতাই সাদা রঙের হয়। এখানকার যেসব লোকেরা ষাঁড়ের পূজা করে, তারা যুদ্ধে যাবার সময় নিজেদের ঘোড়ার কেশরে বুনো ষাঁড়ের চুল লাগিয়ে নেয়। তাদের বিশ্বাস যার সঙ্গে এসব থাকবে এটা তাকে সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। এ কারণে এ দেশে বুনো ষাঁড়ের চুল খুব বেশি দামে বিক্রি হয়।

১৯
মুরফিলি বা মনসুল রাজ্য

মাবার ছেড়ে উত্তরে পাঁচ শত মাইল অগ্রসর হলে আপনি মুরফিলি রাজ্যে প্রবেশ করবেন। এখানকার লোকেরা প্রতিমার উপাসনা করে। এটা স্বাধীন একটা রাজ্য। এখানকার লোকেরা ভাত, মাছ, মাংস এবং ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

এই রাজ্যের পাহাড়ে হীরক পাওয়া যায়।* বর্ষাকালে এইসব পাহাড়ের পাথর আর গুহা বেয়ে প্রচণ্ড বেগে পানি গড়িয়ে নামে। এই পানি নেমে গেলে পরে লোকেরা নদীর তলানিতে হীরক খুঁজতে নামে, আর প্রচুর হীরা পায়। জনাব মার্কো জানান যে গ্রীষ্মে, যখন প্রচণ্ড তাপদাহ বিরাজ করে আর বৃষ্টি থাকে না, এরা তখন গরমের অবসাদ আর আনাচে-কানাচে প্রচুর সাপখোপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। জানা যায়, ঠিক চূড়ার কাছে গুহা আর গর্তে ভরা অনেক গভীর একটা খাদ রয়েছে, সেখানে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়; আর সাপ খেতে প্রচুর ঈগল আর ধবল সারস সেখানে জড়ো হয়ে বাসা বাঁধে। যারা হীরা সংগ্রহে সেখানে যান তারা গুহা মুখে গিয়ে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে কয়েক টুকরা মাংস গুহার মধ্যে ছুড়ে ফেলেন, ঈগল আর সারসেরা খাদ থেকে সেগুলো তুলে আনতে পিছু নেয়, আর সেগুলো নিয়ে পর্বত শীর্ষে গিয়ে বসে। সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে মাংসের টুকরাগুলো উদ্ধার করে, কখনো কখনো তাতে হীরক লেগে থাকে। ততক্ষণে ঈগল সেটা গিলে ফেললে, তারা সেটার রাতে থাকার জায়গাটা চিনে রাখে, আর সকাল সকাল সেখানে গিয়ে তাদের বিষ্ঠা আর আবর্জনার মাঝে সেই পাথরের খোঁজ করে।** তবে এমনটা ধরে নেয়া মোটেই উচিত হবে না যে এর মাধ্যমে খ্রিস্টানেরা উৎকৃষ্ট হীরার মালিক বনে যায়, কারণ সেগুলো গ্রেট খান আর ভারতের বিভিন্ন অংশের রাজা এবং প্রধানদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

এখানে ভারতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের তুলা উৎপন্ন হয়। এরা যথেষ্ট গবাদিপশুর মালিক, এখানে বিশ্বের সবথেকে বড় ভেড়া পাওয়া যায় এবং এখানে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

২০
ল্যাক বা লার প্রদেশ

মহান সেইন্ট টমাসের মরদেহ যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছে, সেখান থেকে চলে আসার পর পশ্চিমে অগ্রসর হলে আপনি লার প্রদেশে প্রবেশ করবেন,

---

* দ্য গ্রেট মসুল, ওরলব, কো-হি-নুরসহ অন্যান্য বড় আকৃতির হীরকের প্রায় সবই এই প্রদেশেই পাওয়া গেছে।

** এরাবিয়ান নাইটস-এ নাবিক সিন্দবাদও এই একই গল্প বলেছেন। বিভিন্নভাবে তা চৈনিক এবং প্রাচ্যের সাহিত্যেও ঠাঁই পেয়েছে। ইয়েল'সের মার্কো পলো বইতে হেনরি কর্টিয়ার বলেছেন যে সর্বোচ্চ হিব্রু ধর্মগুরুর বক্ষবর্মের বারোটি হীরক খণ্ডের কথা প্রাচীন লোককাহিনিগুলোতেও উল্লেখ রয়েছে। লৌকিক এইসব কথাকাহিনি হতে জানা যায় যে নতুন খনি উদ্বোধনের সময় দেবতার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেয়া পশুবলি থেকেই ভারতীয় বলি প্রথার উদ্ভব।
শিকারি পাখি মৃত পশুর যে মাংস সংগ্রহ করত তাতে হীরা লেগে থাকত। তাতে করে খুব বেশি অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতো না।

এখানেই ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি, আর এখান থেকেই তারা ভারতের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে।

এদের মতো সৎ আর সম্মানিত ব্যবসায়ীর দেখা অন্য কোথাও মিলবে না। কোনো অবস্থাতেই এদের দিয়ে মিথ্যে বলানো সম্ভব নয়, এমনকি মৃত্যু ঝুঁকিতেও না। এরা প্রতারণা বা অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করাকে ঘৃণার চোখে দেখে। একইভাবে এরা এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকার মতো সদ্‌গুণের কারণে লক্ষণীয়ভাবে পরিচিত। দেশীয় নিয়ম-কানুনের সঙ্গে অপরিচিত এমন ভিনদেশি বণিকদের কাউকে নিজের পরিচয় জানিয়ে এরা তার ব্যবসা নিজ হাতে পরিচালনার প্রস্তাব দেয়, সে রাজি থাকলে ব্রাহ্মণেরা তার ব্যবসা দেখাশোনা করে এবং মালামাল মজুদ, সৎভাবে হিসাব রাখাসহ সর্বতোভাবে সেই অপরিচিতের লাভালাভ নিশ্চিত করে, আর এর প্রতিদানে কিছুই দাবি করে না। বিনিময়ে মালিক তার লাভের থেকে যা দেয় তাই নেয়।

এরা মাংস আর দেশীয় ওয়াইন পান করে। তবে এরা পশু বধ করে না, মুসলমানদের কাছ থেকে মাংস সংগ্রহ করে। নির্দিষ্ট পৈতা, কাঁধে মোটা সুতির দড়ি দেখে এদের চেনা যায়, সেটা কাঁধ থেকে হাতের নিচ হয়ে বুকের ওপর থেকে পেছন পর্যন্ত জড়ানো থাকে।

রাজা খুবই ধনী আর ক্ষমতাধর, তিনি মণি-মুক্তাসহ মহামূল্যবান রত্ন-পাথরের মালিক হতে খুবই আনন্দিত বোধ করেন। মাবারের ব্যবসায়ীরা সবচাইতে চমৎকার রত্ন দেখিয়ে দাম হাঁকার পর, তাদের কথা বিশ্বাস করে তিনি সেটার বাজার মূল্যের দ্বিগুণ তিনগুণ দিয়ে থাকেন। এ কারণে তার কাছে অনেক বেশি বেশি রত্ন পাথর আনা হয়।

এখানকার লোকেরা ঘোর পৌত্তলিক, এরা খুব মনোযোগসহকারে নানাবিধ চিহ্ন আর শুভ-অশুভ লক্ষণ বাছবিচার করে থাকে। কোনো কিছু কেনার সময় এরা মাটিতে নিজের ছায়ার দিকে লক্ষ করে, ছায়াটাকে স্বাভাবিকের চাইতে বড় মনে হলে তারা সেদিন কেনাকাটা করে।

আবার, কেনাকাটার জন্য কোনো দোকানে ঢুকবার পর সেখানে কোনো টেরানটুলা দেখলে সেটা কোন দিক থেকে এসেছে তা বাছ-বিচার করে দাম-দস্তুর শুরু করে। আর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় কেউ হাঁচি দিলে সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সেদিনের মতো বাড়িতেই থাকে।

খাবার-দাবারের ব্যাপারে তারা খুবই মিতচারী, আর অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বিশেষ ধরনের ভেষজ চিবানের কারণে তাদের দাঁত অটুট থাকে। ভেষজটা হজমে সহায়তা করে তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যাতেও কাজে আসে।

এখানকার স্থানীয়দের একটা অংশ ধর্মীয় জীবনযাপন করে, এদের চুগী [যোগী] বলা হয়, নিজ ধর্মের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এরা অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে। এরা পুরোপুরি নগ্ন থাকে এবং দেহের কোনো অংশ আবৃত করে না, এ

প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য হলো যে অবস্থায় পৃথিবীতে এসেছি সেভাবে থাকার মাঝে কোনো লজ্জা থাকতে পারে না। আর এ কারণেই তারা দেহের বিভিন্ন অংশ উন্মুক্ত রাখার পরও লজ্জায় আরক্তিম হয় না।

এরা ষাঁড়ের পূজা করে, পেতল বা অন্য কোনো ধাতুতে গিল্ট করা ষাঁড়ের ছোট মূর্তি কপালে লাগিয়ে রাখে। ষাঁড়ের হাড় পুড়িয়ে ছাই করে, সেটা দিয়ে একধরনের মলম বানিয়ে তা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শরীরে মাখে। আর কারো সঙ্গে দেখা হবার পর আন্তরিকতার সঙ্গে তার কপালে সেই ছাই দিয়ে তিলক এঁকে দেয়।

জীবন্ত কোনো কিছুকে এরা হত্যা করে না, এমনকি মাছি, কীট বা উকুনও না, কারণ তাদের ধারণা এদের সবার মাঝেই আত্মা রয়েছে; এবং কোনো প্রাণীকে ভক্ষণ করা তাদের কাছে জঘন্যতম অপরাধ। এমনকি শাকসবজি, তৃণলতা, বা ফলমূলেরও আত্মা আছে এমন মনে করায় ভালো করে শুকাবার আগপর্যন্ত এরা সেসবও খায় না। এরা চামচ বা বাসন ব্যবহার করে না, তবে স্বর্গের আদমের আদলে এরা আপেলের শুকনো পাতার ওপর তাদের খাবার-দাবার রাখে। এরা অনেক দিন পর্যন্ত জীবনধারণ করে, খোলা মাটির উপর ঘুমাবার পরও কেউ কেউ শক্ত-সমর্থ ও সুস্থভাবে দেড় শত বছরের বেশি সময় ধরে বাঁচে। সহ্য ক্ষমতা আর কৌমার্যব্রতের কারণেই সেটা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। মৃত্যুর পর এরা তাদের মড়া পুড়িয়ে ফেলে, যাতে তা থেকে কোনো কীটের জন্ম না হয়, তেমনটা হলে, সেগুলোও একসময় মারা যাবে আর তখন এই শরীরের আত্মাও তাদের মৃত্যুর পাপ বহন করবে।

২১
কেল নগর

কেল বিশাল এক নগর, মাবার রাজার চার ভাইয়ের এক ভাই এখানকার রাজা। তিনি অঢেল ধন-রত্নের মালিক এবং তিনি দেশে গভীর সুখ-শান্তি বজায় রেখেছেন। এ কারণে বিদেশি বণিকদের বসবাসের জন্য জায়গাটা খুবই অনুকূল, রাজা তাদের খুবই সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং নানাভাবে আপ্যায়িত করে থাকেন। একইভাবে যেসব জাহাজ এখানে প্রাচ্য থেকে আসে যেমন ওরমাস, চিসটি, এডেন এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে বাণিজ্যের সুবিধার কারণে পণ্য আর ঘোড়া বোঝাই সেসব জাহাজ এখানকার বন্দরে এসে নোঙর করে। এই রাজারও তিন শত অতি সুন্দরী রক্ষিতা নারী রয়েছে।

ভারতের আর সব লোকেদের মতোই, এই শহরের বাসিন্দারা মুখে তাম্বুল পাতা নিয়ে অনবরত চিবাতে আসক্ত; খানিকটা অভ্যাস আর খানিকটা বাসনা পূরণের সামর্থ্য থেকে তারা এমনটা করে থাকে। চিবাবার ফাঁকে ফাঁকে বারবার

তারা পিক ফেলে। উচ্চপদস্থরা কর্পূরসহ আরো অনেক সুগন্ধি মসলার সঙ্গে চুন দিয়ে এই পাতা সাজায়। আমি বলতে পারি এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী। কেউ কাউকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে ঘৃণ্যভাবে অপমান করলে এর জবাবে তারা সেই লোকের মুখে এই পাতা চিবানো রসের থুতু ছিটিয়ে দেয়। এভাবে অপমানিত হবার পর, ব্যথিত ব্যক্তি রাজার কাছে ছুটে গিয়ে, তার দুঃখ-দুর্দশার কথা খুলে বলেন এবং এই বিবাদ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাধ্যমে পরিসমাপ্তির ইচ্ছে প্রকাশ করেন। রাজা তখন তাদের অস্ত্র আর বর্মে সজ্জিত করান; আর সেই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখার জন্য দর্শক হিসেবে লোকজন জড়ো হয়, যা তাদের একজন ময়দানে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগপর্যন্ত চলতে থাকে। তবে এই যুদ্ধে তরবারির মাথার সাহায্যে আঘাত করা নিষেধ।

২২
কোউলাম রাজ্য

মাবার ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচ শত মাইল অগ্রসর হলে, আপনি কোউলাম রাজ্যে পৌঁছবেন। এখানে অনেক খ্রিস্টান এবং ইহুদির বাস, এরা তাদের মূলভাষা ধরে রেখেছে। এই রাজ্যের রাজা অন্য কাউকে কর দেন না।

এখানে উন্নত মানের অনেক রঞ্জক বৃক্ষ জন্মে এবং বনাঞ্চল আর দেশের উন্মুক্ত অংশে প্রচুর মরিচ উৎপন্ন হয়; মে, জুন এবং জুলাই মাসে এই মরিচ আহরণ করা হয়; এবং যে লতানো গাছে এই মরিচ জন্মে তা এখানে উপবন সৃষ্টির মাধ্যমে আবাদ করা হয়। এখানে উন্নত মানের নীলের চাষ এবং তা থেকে এই দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। নির্দিষ্ট একধরনের ভেষজ থেকে এই নীল প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এই গাছ শেকড়সহ তুলে পানিভর্তি পাত্রে পচার আগপর্যন্ত রেখে দেয়া হয়; এরপর এর থেকে রস বের করে নেয়া হয়। তারপর রোদে শুকালে একধরনের কাদাটে মিশ্রণ পাওয়া যায়, সেটা ছোট ছোট টুকরো করে কাটা হয়, এই অবস্থাতেই আমরা নীল পেয়ে আসছি।

বছরে বেশ কয়েক মাস এখানে প্রচণ্ড দাবদাহ বিরাজ করে। তখনো অঢেল লাভের আশায় মানজি, আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বণিকেরা এখানে ছুটে আসে আর সঙ্গে আনা মালামাল বিক্রি করে কার্গোতে ফিরে যায়।

এখানে এমন অনেক প্রাণী দেখা যায় যা অন্যান্য অংশের চেয়ে আলাদা। এখানকার বাঘ পুরোপুরি কালো; আর তোতা পাখির মতো দেখতে বিভিন্ন ধরনের আরো অনেক পাখি রয়েছে, এদের কয়েকটা আবার বরফের ন্যায় ধবল, তবে পা আর চঞ্চু লাল। লাল আর গাঢ় নীলের মিশ্রণেও বেশ কিছু পাখি দেখতে পাওয়া যায় এবং এছাড়াও ছোট ছোট আরো অনেক পাখি চোখে পড়ে। এখানকার ময়ূর খুব সুন্দর আর আমাদের ওখানকারগুলোর চাইতে বড়, একইভাবে আকার-আকৃতিতেও আলাদা, এমনকি এখানকার পোষা মুরগিও আলাদা ধরনের। ফলের

ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। এখানে বৈচিত্র্যময় প্রচুর ফলের সমাহার দেখতে পাওয়া যায়, ধারণা করা হয় এখানকার অত্যধিক গরমই এর কারণ।

তাল প্রজাতির একধরনের গাছের চিনি হতে মদ প্রস্তুত করা হয়। এই মদ খুবই উৎকৃষ্ট মানের, আর আঙুরের মদের চেয়ে দ্রুততর সময়ে মাতাল করে। এখানকার লোকেরা খাবার উপযোগী অঢেল জিনিসপত্রের মালিক, তবে এরা ধান ছাড়া অন্য কোনো শস্যের আবাদ করে না, এই শস্যটিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে অনেক প্রাজ্ঞ জ্যোতিষ এবং ডাক্তার রয়েছে।

নারী-পুরুষসহ এখানকার অধিবাসীদের সবাই কালো এবং কালেভদ্রে শরীরের সামনের দিকে এক টুকরা কাপড় ব্যবহার ছাড়া এরা পুরোপুরি নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করে। আচার-আচরণে এরা খুবই বিলাসী, আর রক্তের সম্পর্কের চাচাতো-মামাতো ভাই-বোনদের এবং মৃত ভাইয়ের বউকে এরা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তবে যতটুকু জানা যায় এখানকার লোকেদের নীতিজ্ঞান ভারতের অন্যান্য অংশের মতোই।

২৩
কোমারি

কোমারি [কেপ কোমোরিন] এমন এক প্রদেশ যেখান থেকে জাভায় অদৃশ্য উত্তরের নক্ষত্রপুঞ্জের একটা অংশ দেখা যায় এবং এখানকার ত্রিশ মাইলজুড়ে দিগন্তের খানিকটা উপরেই কেবল তা দেখা সম্ভব। জায়গাটা খুব বেশি উর্বর নয়, বেশিরভাগ অংশই বন-বনানীতে ছাওয়া, যেখানে বিভিন্ন ধরনের পশুপাখির বাস, বিশেষ করে মানুষের সমান একধরনের সুগঠিত দেহের গরিলা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে লম্বা লেজওয়ালা বানরও রয়েছে, আগেরটার সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। এছাড়াও প্রচুর বাঘ, চিতা এবং রয়েছে।

২৪
ডেলি রাজ্য

কোমারি থেকে পশ্চিমে শত মাইলের মতো অগ্রসর হলে ডেলি রাজ্যে পৌঁছানো যায়, এখানে ন্যায়সঙ্গত রাজা এবং বৈচিত্র্যময় ভাষা রয়েছে। এটা অন্য কোনো রাজ্যকে কর দেয় না। লোকেরা প্রতিমার পূজা করে। কোনো পোতাশ্রয় না থাকলেও বড় বড় নদীগুলোতে নিরাপদেই জাহাজ প্রবেশ করতে পারে।

এই দেশের ক্ষমতা এখানকার অধিক জনসংখ্যা বা তাদের সাহসিকতার ওপর নির্ভর করে না, বরং শত্রুর অনুপ্রবেশ কঠিন বলেই এখানে বিদেশি শক্তির আগ্রাসন অসম্ভব।

এখানে প্রচুর পরিমাণে মরিচ ও আদাসহ অনেক ধরনের মসলা জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। নোঙর করার উদ্দেশ্য না নিয়ে ভুল করে কখনো নদীমুখ দিয়ে এখানে কোনো জাহাজ এসে পড়লে, তার সব পণ্য জব্দ এবং বাজেয়াপ্ত কারা হয়, তাদের বলা হয়, "অন্য কোথাও যাওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমাদের স্রষ্টা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, যাতে আমরা তোমাদের সম্পত্তির অধিকারী হতে পারি।" অনুকূল আবহাওয়ার আগেই মানজি থেকে এখানে জাহাজ এসে হাজির হয় এবং সপ্তাহজুড়ে অথবা সম্ভব হলে আরো কম সময়ের মধ্যেই মালবাহী কার্গো পাবার চেষ্টায় থাকে। এর কারণ, বড় বড় কাঠের নোঙর [লোহা-কাঠ] প্রবলতর ঝড় মোকাবেলা করতে সক্ষম হলেও এখানকার উপকূলের কাছাকাছি সাগরজুড়ে ভগ্ন ডুবো তটরেখা প্রায়ই এদের ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এই দেশে বাঘসহ অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব খুব বেশি।

২৫
মালাবার

মালাবার বৃহত্তর ভারতের বিশাল এক রাজ্য, এটি পশ্চিমে অবস্থিত, এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেক কিছুই আমার পক্ষে বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। এই দেশ স্বাধীন রাজা কর্তৃক শাসিত। এখানকার আলাদা ভাষা রয়েছে।

এখান থেকে দিগন্তের দুই ফ্যাদম উপরে ধ্রুবতারা দেখতে পাওয়া যায়। গুজরাট এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এই দুই রাজ্যে অসংখ্য জলদস্যুর বাস। প্রতি বছর এরা শত শত ছোট জলযানে করে সাগরে পাড়ি জমায়। সেই পথে যাতায়াত করা বাণিজ্য জাহাজে নির্বিচারে লুটতরাজ চালায়। এরা বউ-বাচ্চাসহ সব বয়সী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সাগরে যায় এবং গ্রীষ্মের বিহারের পুরোটা সময়জুড়ে তাদের সঙ্গ উপভোগ করে। কোনো জাহাজই যাতে তাদের হাত থেকে পালাতে না পারে সে জন্যে তারা প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর নোঙর করে থাকে; তাতে করে বিশটি জাহাজের সাহায্যে শত মাইল এলাকাজুড়ে পাহারা বসানো সম্ভব হয়। বণিকেরা এর কোনো একটার দৃষ্টি সীমায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা আগুন বা ধোঁয়ার সাহায্যে অন্যদের সংকেত পাঠায়; এর পরপরই সবাই কাছাকাছি হয়ে, জাহাজটার পালাবার সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। নাবিকদের কোনোরকম ক্ষতি করা হয় না, তবে এর পণ্যসামগ্রী বুঝে নেবার পর আরো একটা কার্গো নিয়ে ফেরার পরামর্শ দিয়ে, তাদের তীরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে এদের ফিরতি পথে আবারও তারা সমৃদ্ধ হতে পারে।

এই রাজ্যে অঢেল পরিমাণে মরিচ, আদা, দারুচিনি এবং নারিকেল পাওয়া যায়। এখানে সবচাইতে মিহি আর সুন্দর তুলা উৎপন্ন হয়, যা বিশ্বের অন্য কোথাও মিলবে না।

মানজি থেকে জাহাজগুলো তামা আর ব্যালাস্ট নিয়ে এখানে আসে। এছাড়াও সোনার কারুকার্য খচিত রেশমি বস্ত্র, গৌজি সিল্ক*, সোনা এবং রুপার বাঁট, সেই সঙ্গে মাবারে উৎপাদিত হয় না এমন আরো অনেক ধরনের ওষুধপত্রের মতো জরুরি পণ্যসামগ্রী তারা এদের সঙ্গে বিনিময় করে। বণিকেরা জাহাজে করে এখান থেকে এডেন হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত তাদের পণ্যসামগ্রী পরিবহন করে।

মালাবার রাজ্যের কথা বলা হলো, এবার আমরা এর সীমান্তে অবস্থিত গুজরাট রাজ্যের বর্ণনা তুলে ধরছি। আর এভাবে আমরা যদি ভারতের সব শহর-বন্দরের বর্ণনা দিতে শুরু করি তাহলে সেটা অনেক দীর্ঘতর হবে এবং পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর মনে হবে।

২৬
গুজরাট রাজ্য

গুজরাট রাজ্যের পশ্চিম পাশ ভারত মহাসাগর দিয়ে ঘেরা। নিজস্ব রাজা কর্তৃক শাসিত এই রাজ্যের আলাদা ভাষা রয়েছে। এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের ছয় ফ্যাদম ওপরে ধ্রুবতারার দেখা মিলবে। এই রাজ্য সবচাইতে দুর্ধর্ষ জলদস্যুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। অভিযানের সময় পাকড়াও হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা বণিকদের সাগরের জল খেতে বাধ্য করে। যাতে গিলে ফেলা মণি-মুক্তা বমি করে পেট থেকে বের করে দেয়।

এখানে প্রচুর পরিমাণে আদা, মরিচ এবং নীল উৎপন্ন হয়। নয় ফুট লম্বা একধরনের গাছ থেকে এখানে প্রচুর তুলা পাওয়া যায়, যা বিশ বছর পর্যন্ত ফলন দেয়। তবে এই তুলা বয়নের উপযুক্ত নয়, শুধু লেপ, তোশক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। তবে বিশ বছর বয়েসি গাছ থেকে মসলিনসহ অসাধারণ সব মিহি বস্ত্র তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়।

এখানে ছাগল, মহিষ, বুনো ষাঁড়, গণ্ডার এবং অন্যান্য পশুর চামড়া পাওয়া যায়। এসব পণ্য জাহাজ বোঝাই করে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। লাল, নীল চামড়া দিয়ে খুব নরম আর আরামদায়ক বিছানার চাদর তৈরি করা হয়, যার ওপরে সোনা-রুপার নকশা খচিত থাকে, এগুলোর ব্যাপারে মুসলমানেরা খুবই আগ্রহী। এখানে এ ধরনের কাঁচামাল দিয়ে বিভিন্ন পশু-পাখির সোনা-রুপার নকশা খচিত অতি মোলায়েম গদিও তৈরি হয়; যার কোনো কোনোটার মূল্য ছয় মার্কসের মতো চড়া। এখানে সুতোর এমনসব সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায় যা বিশ্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে এবার আমরা কানান নামের রাজ্যের কথা বলব।

২৭

কানান রাজ্য

কানান [বোম্বে] একটা সুবিশাল এবং সুবিখ্যাত রাজ্য, এটা পশ্চিমে অবস্থিত। আমরা একে পশ্চিমে বলছি এই বিচারে যে মার্কো পূর্ব দিক থেকে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন, তিনি যে অবস্থান থেকে সেগুলোকে দেখেছিলেন ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করে গেছেন।

এই রাজ্য এমন এক রাজন্যের দ্বারা শাসিত, যিনি অন্য কাউকে কর দেন না। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, নিজেদের আলাদা ভাষা রয়েছে। এখানে মরিচ বা আদা এই দুটার কোনোটাই আবাদ হয় না। তবে এখানে গাঢ় রঙের বিশেষ একধরনের ধূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

এই দ্রব্যসহ অন্যান্য জিনিসের জন্য প্রচুর জাহাজ এখান দিয়ে যাতায়াত করে। তাছাড়া এখান থেকে অসংখ্য ঘোড়া ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

২৮

কামবায়া রাজ্য

কামবায়া [কাম্বাই] পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল এক রাজ্য। নিজস্ব রাজা শাসিত, যিনি অন্য কাউকে কর দেন না। এবং এখানকার লোকেদের আলাদা ভাষা রয়েছে। লোকেরা পৌত্তলিক। সবচাইতে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থানের কারণে এখানে ধ্রুবতারা আকাশের অনেক ওপরে দেখা যায়।

এখানে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হয়, এই পণ্যসহ অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পর্যাপ্ত কেনাবেচা হয়। এখানে তুলার বস্ত্রসহ তুলার উল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের পরিপাটি চামড়া রপ্তানি হয়। এর বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, টুট্টি [দস্তা] আমদানি করা হয়। এখানে উল্লেখ করার মতো আর বিশেষ কিছু নেই বলে, এবার আমরা সারভিনাথ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি।

২৯

সারভিনাথ রাজ্য

সারভিনাথও পশ্চিমের একটা রাজ্য, এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, দেশটি স্বাধীন এক রাজার দ্বারা শাসিত, যিনি অন্য কাউকে কর দেন না। এখানকার লোকেরা আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভাষায় কথা বলে। এরা খুবই শান্তিপ্রিয়।

এরা ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে, আর এখানে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য বণিকের যাতায়াত রয়েছে। তবে আমি জানতে পেরেছি, এখানকার পৌত্তলিক মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত পুরোহিতেরা বিশ্বের নিষ্ঠুরতম ব্যক্তি। এবার আমরা কেসমাকোরান রাজ্যের কথা বলব।

৩০

কেসমাকোরান রাজ্য

অতিবিস্তৃত এক রাজ্য, যার বৈধ রাজা এবং নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্য কিছুসংখ্যক প্রতিমা পূজারি রয়েছে, তবে বেশিরভাগই মুসলমান।

এরা ব্যবসা আর শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ভাত আর গম এদের প্রধান খাদ্য, এর সঙ্গে মাছ, মাংস এবং দুধ খায়, যা তাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। নৌ এবং স্থল এই উভয় পথে এখানে অসংখ্য বণিক যাতায়াত করে।

ঠিক যেভাবে মাবার থেকে শুরু হয়েছিল, সেভাবে, এখান থেকে আপনি উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হলে, একেই বৃহত্তর ভারতের সবশেষ প্রদেশ হিসেবে ধরতে হবে। এর বর্ণনা দিতে হলে এখানকার বন্দরনগরীর কাছাকাছি অবস্থিত একমাত্র প্রদেশের চিত্র তুলে ধরতে হবে, যা আমাদের এই কাজকে আরো দীর্ঘ করে তুলবে।

এবার আমরা ভারতীয় কিছু দ্বীপ নিয়ে আলোচনা করছি। এর একটির নাম মালে এবং অন্যটি ফিমেলস।

৩১

মালে এবং ফিমেলস দ্বীপ এবং কেন তাদের এই নামে ডাকা হয়

কেসমাকোরান থেকে পাঁচ শত মাইল দক্ষিণে, পরস্পর ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত দুটা দ্বীপ রয়েছে। এর একটাতে পুরুষ মানুষ বসবাস করে, এদের সঙ্গে কোনো নারী নেই। তাই একে মেলস [পুরুষদের] দ্বীপ নামে ডাকা হয়। আর অন্যটাতে নারীরা বসবাস করে তাই একে ফিমেলস [নারীদের] দ্বীপ নামে ডাকা হয়।

এই দুই দ্বীপের অধিবাসীরা একই গোত্রের এবং খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত, তবে পুরাতন বাইবেলের নিয়ম-কানুন মেনে চলে। মার্চ, এপ্রিল এবং মে বছরের এই তিন মাস পুরুষেরা ফিমেলস দ্বীপে ঘুরতে যায় এবং প্রত্যেক পুরুষ আলাদা বাড়িতে তাদের স্ত্রীর সঙ্গে থাকে। পরে মেলস দ্বীপে ফিরে এসে পুরুষরা পরিবার-

পরিজনহীন বছরের বাকি সময় এখানে কাটায়। তাদের নারীরা বারো বছর পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে রাখে, এর পর তাদের বাবার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য পাঠানো হয়। বিবাহযোগ্য হবার আগ পর্যন্ত মেয়েরা বাড়িতেই থাকে এবং এর পর তাদের আশপাশের অন্যান্য দ্বীপের পুরুষদের সঙ্গে বিয়েথা দেয়া হয়। বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর কারণেই তারা এ ধরনের জীবনযাপনে বাধ্য হয়, যে কারণে তারা সারা বছর স্ত্রীদের সঙ্গে বসবাসের মতো ঝুঁকি নিতে পারে না। তাদের আলাদা বিশপ রয়েছেন, যিনি সমুদ্র দ্বীপ সাক্কোটেরার অধীন।

এখানকার লোকেরা তাদের স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য শস্যের আবাদ করে। এই দ্বীপসমূহে বিভিন্ন জাতের ফলফলাদি জন্মে। পুরুষরা মাছ, মাংস, দুধ এবং ভাত খায়। এরা দক্ষ জেলে। এখানকার আশপাশের সাগর থেকে প্রচুর মাছ ধরে। তাজা এবং লবণ দেয়া অবস্থায় দু'ভাবেই এরা দ্বীপের ব্যবসায়ীদের কাছে মাছ বিক্রি করে। তবে মাছ মারার বদলে গন্ধদ্রব্যে ব্যবহার উপযোগী সেখানকার সাগরে ভাসমান তিমি মাছের অন্ত্রের মোমসদৃশ উপাদান এম্বারগ্রিজ সংগ্রহই এদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৩২
সাক্কোটেরা দ্বীপ

এই দ্বীপসমূহ ছেড়ে দক্ষিণে আরো পাঁচশ' মাইল গেলে আপনি সাক্কোটেরা দ্বীপে পৌঁছবেন। এই দ্বীপ অনেক বড় আর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা তাদের উপকূল থেকে তিমি মাছের পেটের এম্বারগ্রিজ আহরণ করতে সক্ষম হন।

বণিকদের কাছে এই দ্রব্যর কদর খুব বেশি বলে, তারা এই মাছের ব্যবসা করে। লোহার শিক তিমির শরীরে এমনভাবে বিদ্ধ করা হয় যাতে সেটা আর পালাতে না পারে। লোহার এই হার্পুনের সঙ্গে লম্বা দড়ি বাঁধা হয়, যার শেষ প্রান্তে বয়া যুক্ত থাকে। তাতে করে তিমির অবস্থান চিহ্নিত করা সহজ হয়। এভাবে ভাসতে ভাসতে একসময় সেটা মারা যায়। তখন সেটাকে তারা তীরের কাছে নিয়ে এসে পেট থেকে এম্বারগ্রিজ সংগ্রহ করে। তবে এর মাথা থেকেও কয়েক পরত তেলের* পিণ্ড বের করে আনা হয়।

এখানকার নারী-পুরুষ উভয়েই প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে। ঠিক পৌত্তলিকদের মতোই সামনে-পেছনে সামান্য অংশ ঢেকে রাখে, যার বর্ণনা আগেই দেয়া হয়েছে। ধান ছাড়া এদের এখানে আর কোনো শস্যের আবাদ হয় না। এর সঙ্গে মাছ আর দুধ খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। ধর্মে এরা খ্রিস্টান, যথাযথভাবে দীক্ষিত এবং সরকারের অধীন, একইভাবে বিষয়ী এবং আধ্যাত্মিক, একজন আর্চবিশপের অনুগত, যিনি রোমের পোপের বদলে বাগদাদের পেট্রিআর্কের

অনুগত এবং তার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত। অথবা মাঝেমধ্যে তিনি তার লোকজন কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং তাদের পছন্দ অনুসারে এই বিশপ বাছাই করা হয়।

লুটের মাল সঙ্গে করে এনে অনেক জলদস্যু এখানে স্থায়ী আবাস গড়েছে। ম্লেচ্ছ আর সারাসিনদের কাছ থেকে এসব লুটে নেয়া হয়েছে ভেবে স্থানীয়েরা তাদের কাছ থেকে সেসব নিঃসঙ্কোচে কিনে নেয়। এডেনের সীমান্তের দিকে যাত্রা করা সব জাহাজই এখানে এসে থামে এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ আর এম্বারগ্রিজ ক্রয় করে, সেই সঙ্গে এই দ্বীপে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের সুতি কাপড় সংগ্রহ করে।

তাদের আর্চবিশপের শত নিষেধ সত্ত্বেও, যেকোনো জায়গার চেয়ে এখানকার লোকেরা অনেক বেশি জাদুটোনা আর ডাকিনীবিদ্যার চর্চা করে। এ ধরনের জঘন্য পাপের শাস্তি হিসেবে তিনি তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করেছেন। তবে এতে তারা খুব কমই পরোয়া করে। তাদের কোনো জাহাজ জলদস্যুদের নৌযান দ্বারা আক্রান্ত হলে, তারা সেটাকে জাদুমন্ত্র করতে পিছপা হয় না, যাতে ক্ষতি পূরণ দেবার আগপর্যন্ত সেটা নিয়ে তারা আর অভিযানে বেরুতে না পারে। এমনকি বাতাসের গতিবেগ ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতাও এদের রয়েছে। এর সাহায্যে এরা তাদের দ্বীপে ফিরে যেতে বাধ্য করে ছাড়ে।

একইভাবে তারা সমুদ্রকেও শান্ত করে তুলতে পারে। এবং এর সাহায্যে সমুদ্রে ঝড়ও তুলতে সক্ষম। এছাড়াও জাহাজডুবিসহ আরো অসাধারণ অনেক ক্ষমতা এদের রয়েছে। যা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। এবার আমরা মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা বলব।*

৩৩

বৃহত্তর দ্বীপ মাদাগাস্কার

সাক্কাটেরা দ্বীপ থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে হাজার মাইলের মতো গেলে আপনি প্রকাণ্ড এক দ্বীপ মাদাগাস্কারে এসে পৌঁছবেন, যা বিশ্বের বৃহত্তর আর উর্বরতম দ্বীপের একটি। এটা তিন হাজার মাইলজুড়ে বিস্তৃত।

---

* "এমনও দেখা গেছে যে স্পার্ম হোয়েল-এর হাইডেলবার্গ পিপা দিয়ে জাহাজের পাটাতনের পুরোটা মাথা পর্যন্ত উঁচু করে বোঝাই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে... এবার আসুন জানা যাক, যেখানে স্পার্ম হোয়েল-এর চর্বিতে হাইডেলবার্গ পিপাগুলো ভরাট করা হতো, এইসব অভিযান সত্যিকার অর্থেই ছিল খুবই বিস্ময়কর এবং পুরোপুরি প্রাণঘাতী একটা কাজ।... এই কাজে তাকে খুব সতর্কভাবে, ঠিক যেমনটা পুরাতন বাড়িতে গুপ্তধন সন্ধানের সময় দেয়াল ঠুকে ঠুকে পাথরের কোন খাঁজে স্বর্ণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা খুঁজে দেখতে হতো... সাধারণত বড় আকারের একটা তিমি থেকে এ ধরনের পাঁচশ' গ্যালন তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যেত।" মবি ডায়েট

অধিবাসীরা সারাসিন বা মুহাম্মদের নিয়মের অনুসারী। তাদের চারজন শেখ রয়েছে, আমাদের ভাষায় যাকে “জ্যেষ্ঠ” বলা যেতে পারে। এই চারজন নিজেদের মধ্যে সরকার বণ্টন করে নিয়েছেন। এখানকার লোকেরা ব্যবসা এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাতির দাঁতও বিক্রয় করে, এখানকার অসংখ্য হাতিই এর কারণ। এখানকার মতোই জানজিবারের লোকেরাও এই একই কাজ করে, সেখান থেকেও সমপরিমাণ হাতির দাঁত রপ্তানি হয়ে থাকে।

প্রধান খাবার হিসেবে বছরের সব ঋতুতে এরা উটের মাংস খায়। অন্যান্য গবাদিপশুর মাংসও খাবার হিসেবে পরিবেশিত হয়, তবে বিশ্বের এই অংশে সহজলভ্য সবচেয়ে উপাদেয় এবং স্বাদযুক্ত খাবার হিসেবে এদের কাছে আগেরটির কদর সবচেয়ে বেশি।

এখানকার বনে অসংখ্য লাল চন্দনের গাছ রয়েছে, আর আনুপাতিক হারে বেশি হওয়ায় এখানে এর দামও অনেক কম। তিমি থেকেও প্রচুর এম্বারগ্রিজ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, আর স্রোতের টানে উপকূলে উঠে আসার পর, বিক্রির জন্য এই উপাদান সংগ্রহ করা হয়।

স্থানীয়েরা বনবিড়াল, বাঘ এবং অন্যান্য আরো বিভিন্ন ধরনের পশু, যেমন মর্দা হরিণ, কৃষ্ণসার মৃগ (এন্টিলোপ) এবং পতিত হরিণ প্রচুর সংখ্যায় শিকার করে; এরা প্রচুরসংখ্যক পাখিও শিকার করে, যাদের সঙ্গে আমাদের ওদিককার পাখির পার্থক্য অনেক।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুটিদার রেশমি পোশাক এবং নানা ধরনের রেশমের পণ্য বোঝাই জাহাজ এই দ্বীপে এসে নোঙর করে। সেসব এখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে তারা অনেক বেশি লাভ করতে পারেন।

দক্ষিণের অন্যান্য আরো অসংখ্য দ্বীপে কোনো জাহাজ ভিড়ে না; কেবল এই দ্বীপ এবং জানজিবারেই জাহাজ যাতায়াত করে। এর কারণ দক্ষিণের সমুদ্র স্রোত এতই প্রবল বেগে বয় যে তাদের পক্ষে সেখান থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। মালাবার থেকে যেসব নৌযান এই দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করে, তাদের টানা বিশ বা পঁচিশ দিনের মতো সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়, তবে ফিরতি পথে তিন মাস ধরে অনবরত প্রতিকূল স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে হয়; অনবরত দক্ষিণে ধেয়ে চলা স্রোতের টানই এর মূল কারণ।

দ্বীপের লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, এখানে বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে অসাধারণ এক পাখির আগমন ঘটে, তারা একে রুখ নামে ডাকে। এরা দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসে। এই পাখি নাকি ঈগলের মতো দেখতে, তবে তুলনামূলকভাবে ঈগলের চেয়ে এরা অনেক বড়; এগুলো এতই বড় আর শক্তিশালী যে নখর দিয়ে এরা আস্ত একটা হাতি পর্যন্ত লুফে নিয়ে মেরে ফেলার

জন্য ওপর থেকে ফেলে দিতে পারে। এভাবে মারার পর এরা সেই মৃত হাতির মাংস ভক্ষণ করে।

যেসব লোক এই পাখি দেখেছে তাদের দাবি ডানা মেলার পর তা এমাথা থেকে ওমাথা ষোল কদম প্রসারিত হয়; এবং এদের পালক আট কদম লম্বা, আর সেই অনুপাতে পুরু।*

মেসীয়র মার্কো পলোর ধারণা এই জন্তুটা নিশ্চয় গ্রিফিন হবে, ঠিক যেমনটা অর্ধেক পাখি আর অর্ধেক সিংহ হিসেবে নানা ধরনের চিত্রকর্মগুলোতে দেখা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, যারা এদের দেখার কথা স্বীকার করেছেন, তারা এগুলোকে গড়নে পুরোপুরি ঈগলের মতোই বলেছেন বা ঈগল বলেই দাবি করেছেন।

গ্রেট খান এই অবাক করা অভূতপূর্ব জিনিসের কথা জানতে পেরে, তার একজন কর্মচারীর মুক্তির অজুহাতে এখানে দূত পাঠান, কিন্তু তাদের আসল কাজ ছিল এই দ্বীপের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং বিস্ময়কর সেই জিনিসের সত্যাসত্য সম্পর্কে জানা। তারা সম্রাটের কাছে ফিরে যাবার সময় সঙ্গে করে, যেমনটা আমি শুনেছি, একটা রুখ পাখির পালক নিয়ে যান, মাপার পর সেটা নব্বই বিঘত ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, আর এর মাঝের কাঁটার অংশটা ছিল দুই বিঘত পরিধির। বিস্ময়কর জিনিসটা দেখে সম্রাট অত্যন্ত খুশি হন এবং যারা তাকে সেটা এনে দিয়েছিলেন তাদের মূল্যবান সব উপহার প্রদান করেন।

এদের এখানে মহিষের সমান একধরনের বুনো শূকর দেখা যায়, যার ওজন চল্লিশ পাউন্ডের মতো। একইভাবে এই দ্বীপে জিরাফ, গাধা এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী রয়েছে, যার সবই আমাদের দেশীয় জীবজন্তুর থেকে ভিন্ন ধরনের। এখানকার প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে আলোচনা করার পর, এবার আমরা জানজিবার দ্বীপের কথা শুরু করতে যাচ্ছি।

৩৪
জানজিবার দ্বীপ

মাদাগাস্কার দ্বীপ পেরিয়ে কিছুটা দূরে জানজিবার দ্বীপ, জানা যায় এই দ্বীপের বিস্তৃতি দুই হাজার মাইল। অধিবাসীরা পৌত্তলিক, তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে এবং কোনো বিদেশি শক্তিকে কর দেয় না। এরা খুব বেশি লম্বা হলেও তা শারীরিক গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, এদের দেখতে অনেকটা দানবীয় বলে মনে হয়।

---

* যখন আমি সেখানে ছিলাম তখনো পর্যন্ত মাদাগাস্কারের সেই প্রকাণ্ড পাখি সংখ্যায় বেড়ে উঠছিল... যা বিশালাকার ডিমও পাড়ত এবং আরব্য গল্পগুলোতেও বিশেষভাবে চিত্রিত এই 'রক' পাখির কথা মোটেই অস্বাভাবিকভাবে স্মরণ করা হয়নি।" এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার "ফসিল বার্ড" অংশটুকু দেখুন। বর্তমানেও এমন বিশাল একটা ডিম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে। যার পরিমাণ দুই সমস্ত একের তিন গ্যালপ।

তারপরও এরা যথেষ্ট শক্ত সমর্থ এবং আমাদের চারজন লোক মিলে যে পরিমাণ বোঝা বইতে সক্ষম এখানকার একজনই সেটা বয়ে বেড়াতে পারবে। সেই সঙ্গে, এখানকার একজন লোক আমাদের পাঁচজনের সমান খাবার খায়। এরা দেখতে কালো, কেবল শরীরের ব্যক্তিগত জায়গাগুলো কাপড়ে ঢেকে এরা পারতপক্ষে নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করে। এদের চুল এতই কোঁকড়ানো যে পানিতে ডুবাবার পরও তা ভেজানো কঠিন। এদের মুখ অনেক বড়, নাক কপাল পর্যন্ত প্রসারিত, কান খুবই লম্বা, চোখ আয়তাকার এবং এতটাই ভয়ঙ্কর যে এদের পিশাচের মতন দেখায়। চওড়া মুখ, মোটা নাক এবং আয়তাকার চোখে, এখানকার নারীরাও দেখতে অনেকটা একই ধরনের কুদর্শনবিশিষ্ট। এদের হাত এবং মাথা শরীরের অনুপাতে অনেক বড়।

এই দ্বীপের নারীরা বিশ্বের সবচেয়ে কুৎসিত দর্শনের। তাদের বিশাল মুখ আর পুরু নাক এবং স্তন আমাদের ওখানকার মহিলাদের চাইতে চারগুণ বড়। এরা মাংস, দুধ, ভাত এবং খেজুর খায়। এদের আঙুরের বাগান নেই, তবে ভাত আর চিনি গাঁজিয়ে তার সঙ্গে বেশ কয়েক ধরনের মসলা জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে একপ্রকার চোলাই তৈরি করে, যা খুবই স্বাদযুক্ত এবং অন্যান্য যেকোনো মদের চেয়ে দ্রুততম সময়ে এটা মাতাল করতে সক্ষম।

এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে হাতি দেখতে পাওয়া যায়, আর এদের দাঁত ব্যবসার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই দেশে জিরাফও দেখতে পাওয়া যায়, পশুটা দেখতে খুবই চমৎকার। এদের শরীর সঠিক অনুপাতের, সামনের পা লম্বা এবং উঁচু, পেছনের পা কিছুটা খাটো, গলা খুবই লম্বা, মাথা ছোট এবং আচরণে এই প্রাণী খুবই ভদ্র। বৃত্তাকার লালচে ছোপ ওয়ালা গায়ের রং অনেকটা দেখতে হালকা। মাথাসহ এর গলা তিন কদম লম্বা।

এখানকার ভেড়া আমাদের থেকে আলাদা ধরনের, এদের কালো মাথা ছাড়া দেহের বাকি অংশ পুরোপুরি সাদা; আর এখানকার কুকুরগুলোও একই রঙের। সাধারণভাবেই এসব প্রাণী দেখতে আমাদের ওখানকার চাইতে অনেক বেশি ভিন্ন প্রকৃতির।

এখানে প্রচুর বাণিজ্য জাহাজের যাতায়াত, এরা হাতির দাঁত আর এম্বারগ্রিজের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিনিময় করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, আশপাশের সমুদ্রে প্রচুর তিমি থাকায় দ্বীপের উপকূলের কাছাকাছি অংশে এদের চলাফেরা অনেক বেশি।

দ্বীপের নেতৃস্থানীয়েরা প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাদের লোকেরা যুদ্ধে অনেক বেশি সাহসিকতা প্রদর্শন করে আর মৃত্যু ভয়কে খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এখানে ঘোড়া না থাকলেও, এরা হাতি আর উটের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করে। আগের মতোই হাতির পিঠের ওপর দুর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করে, যা তরবারি,

বর্শা আর ছুড়ে মারবার পাথরসহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পনের থেকে বিশজন পর্যন্ত সশস্ত্র লোক বইতে সক্ষম। লড়াইয়ের আগে তারা তাদের হাতিকে ওয়াইনে চুমুক দেওয়ায়, যাতে সেটা আঘাত হানার সময় প্রচণ্ড মনোবল আর উন্মত্ততা ধরে রাখতে পারে।

ভারতের প্রদেশসমূহ নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি কেবল সেখানকার প্রধান এবং সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গাগুলোর কথাই উল্লেখ করেছি; এবং এইসব দ্বীপের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার বেশ কয়েকটা খুবই চমৎকার। আমি নাবিক আর এখানকার বিখ্যাত জাহাজচালকদের কাছে শুনেছি এবং ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন এমন সব লোকেদের লেখাতেও পড়েছি, যে বসতি এবং বসতিহীন মিলিয়ে এদের সংখ্যা বারো হাজার সাত শত-এর থেকে একটুও কম নয়।

বৃহত্তর ভারত বলতে যে অংশটুকুকে বোঝানো হয়েছে তা মাবার থেকে কেসমাকোরান পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এতে তেরোটি বড় রাজ্য অন্তর্ভুক্ত, এর মাঝ থেকে আমরা দশটার কথা উল্লেখ করেছি। ক্ষুদ্রতর ভারতের শুরু জিম্পাতে এবং তা মুরফিলি পর্যন্ত বিস্তৃত, এতে আটটা রাজ্য রয়েছে, যার বিখ্যাতগুলোই আবার দ্বীপে অবস্থিত, যার সংখ্যা খুবই বেশি। এবার আমরা দ্বিতীয় বা মধ্য ভারত নিয়ে আলোচনা করব, যাকে এবিসিয়া নামে ডাকা হয়।

৩৫
এবাসিয়া নামের বিশাল প্রদেশ বা মধ্য ভারত

এবিসিয়া [এবিসিনিয়া] বিশাল এক প্রদেশ, একে মধ্য বা দ্বিতীয় ভারত নামেও অভিহিত করা হয়। এর প্রধান রাজা একজন খ্রিস্টান। বাকিরা সংখ্যায় ছয়জন, আর এরা সবাই প্রথম জনকে কর প্রদান করেন। এদের তিনজন খ্রিস্টান এবং তিনজন সারাসিন।

আমি জানতে পেরেছি এই অংশের খ্রিস্টানেরা, নিজেদেরকে স্বাতন্ত্রমণ্ডিত করে তুলবার জন্য, তিনটা চিহ্ন আঁকে, এর জন্য লোহা গরম করে তারা, প্রথমটা কপালে, বাকি দুটা দুই গালের ওপরে মুদ্রিত করে। একে অগ্নির দ্বারা দ্বিতীয় দীক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। সারাসিনদের কেবল একটাই চিহ্ন থাকে, যা কপাল থেকে নাকের মাঝ পর্যন্ত এসে ঠেকে। আর ইহুদিরা, অন্যদের মতোই যাদের সংখ্যা এখানে অনেক, তাদের দুটা চিহ্ন রয়েছে, আর সেগুলো তাদের গালের ওপর থাকে।

প্রধান রাজার রাজধানী দেশের ভেতরের দিকে অবস্থিত। সারাসিন রাজন্যের এলাকা এডেন প্রদেশের দিকে। মহান ঋষি সেইন্ট টমাস কর্তৃক এখানকার লোকেরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন, তিনি নুবিয়া রাজ্যে নতুন নিয়মের সুসমাচার

প্রচার করেন এবং এবিসিয়া ভ্রমণের পর সেখানকার অধিবাসীদের ধর্মান্তরিত করেন এবং তার ধর্মোপদেশ এবং অলৌকিকতার কারণে এখানেও একই ধরনের প্রভাব পড়ে। এরপর তিনি স্থায়ীভাবে মাবার প্রদেশে চলে যান, সেখানে অসংখ্য লোককে ধর্মান্তরিত করবার পর, তিনি শহীদত্বের মুকুট পরিধান করেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে এবং সেখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

এবিসিয়ার লোকেরা খুবই সাহসী এবং বীর যোদ্ধা, এডেনের সুলতানের সঙ্গে এরা অব্যাহত বিবাদে লিপ্ত, এর সঙ্গে নুবিয়াসহ অন্যান্য আরো অনেক লোকেদের দেশীয় সীমান্ত রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবিরাম অস্ত্রবাজির চর্চার কারণে, এরা বিশ্বের এই অংশের সেরা সৈনিক হিসেবে বিবেচিত।

১২৮৮ সালে, আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, এই মহান এবিসিনিয়ান রাজন্য যিশুখ্রিস্টের পবিত্র সমাধি দর্শনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এবং প্রতি বছর তার শাসনাধীন এলাকার বিশালসংখ্যক লোকের যে তীর্থযাত্রীদের দল নিয়মিত সেখানে যায়, তাদের সঙ্গে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে জেরুজালেমের যেতে রাজি হন। কিন্তু, তার সরকারের কর্মচারীরা তাকে এর থেকে বিরত করেন। তারা তাকে এর বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে জানান যে যাত্রাপথের অনেক জায়গাই তার চিরশত্রু সারাসিনদের মালিকানাধীন হওয়ায় তার তাদের কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর তিনি প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে একজন বিশপ হিসেবে এমন একজনকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন যিনি জেরুজালেম গিয়ে তার হয়ে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণসহ রাজার নির্দেশনা অনুসারে উৎসর্গ প্রদান করবেন। কিন্তু ফেরার পথে এডেনের সোলদানের [সুলতান] এলাকার ভেতর দিয়ে যাবার সময় তাকে তার সামনে হাজির করে মুসলমান হবার জন্য চাপ দেয়া হয়। খ্রিস্টান বিশ্বাস ত্যাগে অস্বীকৃতি জানাবার পর সোলদান এবিসিনিয়ান সম্রাটের মনে বিরক্তির আগুন প্রজ্বলিত করবার জন্য, তাকে খৎনা করিয়ে দেন। এবং এরপর তাকে অপমানজনক অবস্থায় বিদায় হতে বাধ্য করেন। তার পৌঁছাবার পর সেই অসম্মান এবং হিংস্র আচরণ সম্পর্কে অবহিত করার পর, রাজা তৎক্ষণাৎ এক সেনা সমাগমের আদেশ প্রদান করেন। যার প্রধান হিসেবে সোলদানকে পদানত করার উদ্দেশ্যে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। অপরদিকে সোলদান তাকে সহযোগিতা দেবার জন্য তার দুজন প্রতিবেশী মুসলমান রাজন্যকে ডেকে পাঠান, তাদের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি বিশাল এক বাহিনী সমবেত করেন। সেই যুদ্ধে আবিসিনিয়ান রাজার জয় হয়, তিনি এডেন নগর দখলে নিয়ে, তার বিশপ অবমাননার প্রতিশোধ হিসেবে, সেখানে উপর্যুপরি লুণ্ঠন চালান।

এখানকার অধিবাসীরা গম, ভাত, মাছ এবং দুধ খেয়ে জীবনধারণ করে। এরা তিল থেকে তেল উৎপাদন করে এবং এদের সব ধরনের রসদের প্রচুর যোগান রয়েছে। এই দেশে হাতি, সিংহ, জিরাফ এবং অন্যান্য আরো বিভিন্ন ধরনের জন্তু-জানোয়ার, যেমন বুনো গাধা এবং মানুষসদৃশ বানর, সেই সঙ্গে বন্য

এবং পোষা অসংখ্য পাখি রয়েছে। জায়গাটা স্বর্ণে খুবই সমৃদ্ধ এবং এখানে বণিকদের অনেক বেশি যাতায়াত, যারা অঢেল লাভ করেন। এবার আমরা এডেন প্রদেশের কথা বলব।

৩৬

এডেন প্রদেশ

এডেন প্রদেশ এক রাজা কর্তৃক শাসিত, যিনি সোলদান [সুলতান] উপাধি গ্রহণ করেছেন। এখানকার অধিবাসীদের সবাই সারাসিন এবং এরা খ্রিস্টানদের প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখে। এই প্রদেশে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে এবং এখানে চমৎকার একটা বন্দর রয়েছে, ভারত থেকে মসলা এবং ওষুধ বোঝাই জাহাজ এই বন্দরে এসে ভিড়ে। বণিকেরা আলেকজান্দ্রিয়াতে নিয়ে বিক্রি করার জন্য তাদের কাছ থেকে এসব কিনে নেয়। তারপর জাহাজ থেকে নামিয়ে ছোট ছোট মালবাহী নৌযান বা পালওয়ালা তরীতে তোলা হয়। এগুলোর সাহায্যে তারা উপসাগরের ভেতর দিয়ে বিশ দিনের পথ অগ্রসর হয়, তবে বেশিরভাগ সময়ই তা বিদ্যমান আবহাওয়ার ওপরে নির্ভর করে।

বন্দরে পৌঁছার পর তারা সেই মালামাল উটের পিঠে তুলে এবং স্থলপথে ত্রিশ দিনের পথ পাড়ি দিয়ে নীল নদের দিকে যায়। এখান থেকে আবারও তারা সেই মালামাল জেরম নামের ছোট্ট নৌযানে তুলে নদীপথে কায়রোর দিকে যাত্রা করে, তারপর সেখান থেকে কালিযান নামের কৃত্রিম খাল পেরিয়ে অবশেষে আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছে।

ভারতে উৎপন্ন পণ্য থেকে এডেন হয়ে এই শহরে আনার বণিকদের জন্য এটাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। এডেনের এই বন্দরে আরবের ঘোড়া বোঝাই অসংখ্য বাণিজ্য জাহাজও আসে, তারা এসব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়, তাদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করে বড় ধরনের লাভ করে।

এডেনের সোলদান অঢেল সম্পদের মালিক, ধার্যকৃত কর থেকে তিনি এই সম্পদ অর্জন করেছেন। ভারত থেকে আগত পণ্য এবং বিপণিকেন্দ্রসমূহ থেকে বিনিময় করা পণ্যসামগ্রীর ফিরতি মালবাহী নৌযান, সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক নৌপোত থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়।

জানা যায়, ব্যাবিলনের সোলদান প্রথমবার যখন এক্রি নগরে সেনা অভিযান পরিচালনা করে তা করায়ত্ত করেন, তখন এই এডেন শহর তাকে ত্রিশ হাজার ঘোড়া এবং চল্লিশ হাজার উট দিয়ে সহযোগিতা করে। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জন্ম নেয়া এই বিদ্বেষের পরিমাণ অনেক গভীর। এবার আমরা সিয়ার নগরের কথা বলব।

৩৭

সিয়ার [শিয়ার, আরব]

নগরের শাসক একজন মুসলমান, তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এডেন সোলদানের অধীনে থেকে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জায়গাটা এডেন থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। জন-অধ্যুষিত এই এলাকাতে অনেক শহর আর প্রাসাদ রয়েছে। এর বন্দরও খুব উন্নত, ভারত থেকে এখানে অনেক বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়ে, অসংখ্য বড় বড় চমৎকার সব ঘোড়া নিয়ে সেগুলো ফিরে যায়, সেখানে এরা চড়া দামে বিক্রি হয়।

এখানে সর্বোৎকৃষ্ট মানের সাদা ধূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, দেবদারুর মতো একধরনের ছোট আকৃতির বৃক্ষ থেকে তা সংগ্রহ করে পাতনের মাধ্যমে ফোঁটায় ফোঁটায় সংগ্রহ করা হয়। এই গাছের কাণ্ডে নল যুক্ত করে বা কখনো কখনো বাকল ছেঁটে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসা এই সুগন্ধি রজন জমাট অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। এখানকার আবহাওয়া খুব বেশি উষ্ণ বলে, ছেদনের মাধ্যমে চুইয়ে বেরিয়ে আসা তরল রস সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

এখানে প্রচুরসংখ্যক খেজুর গাছ রয়েছে, এসব থেকে উন্নত মানের অঢেল খেজুর জন্মে। ধান এবং বজরা ছাড়া এখানে আর কোনো শস্যের আবাদ হয় না। তাই বাইরে থেকে সেসব আমদানির প্রয়োজন হয়। এখানে আঙুরের মদ প্রস্তুত না হলেও এরা ভাত, চিনি এবং খেজুর থেকে একধরনের উপাদেয় পানীয় তৈরি করে। এদের এখানে ছোট আকৃতির ভেড়ার একটা জাত আছে, এদের কান অন্য প্রজাতির মতো নয়। অন্যদের যেখানটায় কান থাকে ঠিক সেই জায়গাতে এদের এক জোড়া ছোট্ট শিং রয়েছে, আর নাকের নিচে দুটা ছিদ্র রয়েছে, এগুলোই তাদের কানের কাজ করে।

এখানকার লোকেরা দক্ষ জেলে এবং প্রচুর পরিমাণে টুনা মাছ শিকার করে। এ রকম দুটা টুনা মাছের দাম আমাদের ওখানে কম করে হলেও এক ভেনিসিয়ান গ্রোট হবে। এখানে সূর্যের তাপ এতই বেশি যে সারা দেশ রোদের তাপে একেবারে তেতে থাকে, আর তাই এখানে শাকসবজি তেমন একটা দেখা যায় না। তাই এইসব মাছ রোদে শুকিয়ে, তারা নিয়মিত তাদের গবাদিপশু, গরু, ভেড়া, উট এবং ঘোড়াকে খাওয়ায়। গবাদিপশুগুলোও সেসব আগ্রহ নিয়ে খায়।

এই কাজে ছোট ছোট মাছ ব্যবহার করা হয়, বছরের মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসজুড়ে এ ধরনের প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। আর শুকাবার পর সেগুলো গবাদিপশুকে খাওয়াবার জন্য বাড়িতে বিছিয়ে রাখা হয়। এগুলো কাঁচা মাছও খায়, তবে শুকনো অবস্থায় বেশি অভ্যস্ত।

শস্যের আকালের কারণে, স্থানীয়েরা বড় মাছ থেকে বিস্কুটের মতো একধরনের খাবার জিনিস তৈরি করে। আর সেটা এভাবে প্রস্তুত করা হয় : বড় মাছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আকারে টুকরো করে, তারপর আটা মিশিয়ে চটচটে আঠালো খামি প্রস্তুত করা হয়। এটাকে রুটির মতো আকৃতি দেয়া হয়। তারপর রোদে শুকিয়ে শক্ত করে সারা বছরের খাবার হিসেবে তুলে রাখা হয়।

একটু আগে যে রজনের কথা বলা হলো তা এখানে এতই মূল্যবান যে, খোদ এখানকার গভর্নর এর এক কুইন্টাল দশ স্বর্ণ ডুকাট হারে ক্রয় করেন। তিনি আবার সেসব বণিকদের কাছে চল্লিশ বেজান্ট হারে বিক্রি করেন। এডেন সোলদানের নির্দেশ অনুসারেই তিনি এই কাজ করে থাকেন, যিনি এখানকার রাজন্যের মাধ্যমে এই পণ্যের সবটা কিনে নিয়ে পুনরায় বণিকদের কাছে বিক্রির মাধ্যমে একচেটিয়া বড় আকারের লাভ করেন। এই জায়গা নিয়ে বলার মতো আর কিছুই বাকি নেই। এবার আমরা দুলফার-এর কথা বলব।

৩৮

দুলফার নগর

দুলফার একটা সুবিশাল আর মর্যাদাসম্পন্ন নগর বা শহর। এটা সিয়ার থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এর অধিবাসীরা সবাই মুসলমান এবং এর শাসকও এডেন সোলদানের অনুগত। জায়গাটা সমুদ্রের তীরবর্তী, এখানে চমৎকার একটা বন্দর আছে, এই বন্দরে অসংখ্য জাহাজের যাতায়াত রয়েছে।

স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর ঘোড়া এখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়। বণিকেরা সেসব কিনে ভারতে রপ্তানি করে পর্যাপ্ত লাভ করতে সক্ষম হন। এখানেও সুগন্ধি রজন উৎপন্ন হয়, আর বণিকেরা এখান থেকে সেটাও কিনে। দুলফারের সীমানার ভেতরে অন্যান্য আরো অনেক শহর এবং প্রাসাদ রয়েছে। এবার আমরা কালায়াটি উপসাগর নিয়ে কথা বলব।

৩৯

কালায়াটি নগর

কালাটু উপসাগরের তীরবর্তী কালায়াটি বিশাল এক নগর। জায়গাটা দুলফার থেকে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ছয়শ' মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা মোহাম্মাদের অনুসারী এবং ওরমাস মালিকের অধীন। বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শহরটা খুবই সুরক্ষিত এবং সুবিধাজনক জায়গাতে হওয়ায় এটা কখনোই শত্রুর দ্বারা অধিকৃত হয়নি।

এখানে কোনো ধরনের শস্যের আবাদ হয় না। অন্যান্য জায়গা থেকে তা আমদানি করা হয়। এর পোতাশ্রয় খুব উন্নত ধরনের, ফলে ভারত থেকে অসংখ্য জাহাজ এখানে এসে তাদের পণ্যসামগ্রী খুব আগ্রহসহকারে বিক্রয় করে। আর তাই শহর আর উপকূল থেকে দূরের প্রাসাদসমূহের জন্য চাহিদা অনুসারে পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ পাওয়া যায়। একইভাবে সেগুলো এখান থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করে ভারতে নিয়ে সুবিধাজনক দামে বিক্রি করে।

কালাটুর উপসাগরের প্রবেশ পথে দুর্গ অবস্থিত হওয়ায়, কোনো জাহাজই অনুমতি ছাড়া প্রবেশ বা বন্দর ছেড়ে যেতে পারে না। এই শহরের মালিক, নির্দিষ্ট লিখিত অঙ্গীকার অনুসারে কেরমাইনের রাজাকে কর দিয়ে আসছিলেন, একবার পত্র মারফত রাজার কিছু অস্বাভাবিক দাবির কারণে তিনি আগেকার সেই চুক্তি থেকে সরে আসেন। চাহিদা পূরণে অস্বীকৃতি জানাবার পর তাকে বাধ্য করতে এক বাহিনী প্রেরণ করা হয়। এ সময় তিনি ওরমাস ছেড়ে কালায়াটিতে এসে অবস্থান নেন, এখানে থাকার কারণে তিনি যেকোনো জাহাজের প্রবেশ এবং নির্গমন রোধ করার ক্ষমতা লাভ করেন। বাণিজ্য বাধার কারণে কেরমাইনের রাজা শুল্ক থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব আদায়ে আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাতে করে অতি শীঘ্র তিনি মালিকের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হন।

এখানে দুর্গপ্রাকারবেষ্টিত অত্যন্ত মজবুত প্রাসাদ রয়েছে, সেখান থেকে কেবল উপসাগরের নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং সাগরের বুকে চলাচল করা জাহাজের ওপরও সব সময় নজরদারি করা সম্ভব। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণত খেজুর আর মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। এই মাছ তাজা বা লবণ দেয়া থাকে; তবে উচ্চপদস্থ আর সম্ভ্রান্তেরা, যারা খুব বেশি সক্ষম, তার খাবার জন্য ভুট্টা সংগ্রহ করে। কালায়াটি ছেড়ে দক্ষিণ-পূর্বে আরো তিনশ' মাইলের মতো এগিয়ে গেলে আপনি ওরমাস নামের এক দ্বীপে গিয়ে পৌঁছবেন।

৪০
ওরমাসের পথে

ওরমাস দ্বীপে সাগরের কোল ঘেঁষে সুবিশাল এবং অত্যন্ত চমৎকার এক শহর রয়েছে। এটা মালিক কর্তৃক শাসিত, যার উপাধি লর্ড-এর সমান। তার কর্তৃত্বাধীন আরো অনেক প্রাসাদ এবং শহর রয়েছে।

এখানকার অধিবাসীরা সারাসিন, এদের সবাই মুহাম্মদের বিশ্বাসে অনুগত। এই অঞ্চলে গরম অত্যন্ত বেশি, তবে প্রতিটা বাড়িতে এরা ঘুলঘুলি রাখে। এর সাহায্যে অতি সহজে বিভিন্ন তলা এবং কক্ষে বাতাস চলাচল সুগম হয়। এই প্রযুক্তি ছাড়া এখানে বসবাস প্রায় অসম্ভব। এই শহর নিয়ে আমরা এর বেশি কিছুই আর বলছি না। এর আগের অধ্যায়েও কিসি এবং কেরমানসহ এই শহরের স্বল্প বিস্তর বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

অবশেষে বৃহত্তর ভারতের উপকূলবর্তী প্রদেশ এবং মধ্য ভারত নামে খ্যাত ইথিয়পিয়ার বেশ কিছু রাষ্ট্রের বর্ণনা তুলে ধরার পর এই বইয়ের ইতি টানবার আগে, এবার আমি উত্তরের বেশ কিছু জায়গার কথা তুলে ধরার জন্য, সামান্য পেছনে ফিরে যাচ্ছি।

অধ্যায়-৪

তাতার রাজাদের যুদ্ধ আর দক্ষিণের কয়েকটা দেশের বিবরণ

১
বৃহত্তর তুর্কি

বৃহত্তর তুর্কির রাজার নাম কাইডু, তিনি গ্রেট খানের ভ্রাতুষ্পুত্র, কেননা তিনি গ্রেট খানের ভাই জাগাটাই-এর ছেলে। তিনি অনেক নগর আর প্রাসাদের মালিক এবং একজন ক্ষমতাধর নৃপতি। তিনি একজন তাতার এবং তার লোকেরাও তাতার, আর এদের সবাই প্রশিক্ষিত যোদ্ধা, সবাই একসঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয়; আর আমি আপনাদের এ কথাও জানিয়ে রাখছি যে এই কাইডু প্রচণ্ড এক যুদ্ধে না জড়াবার আগ পর্যন্ত গ্রেট খানের বশ্যতা স্বীকার করেননি। এবং আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে আমরা ওরমাস ছেড়ে আসার সময় বৃহত্তর তুর্কি ছিল উত্তর-পশ্চিমে, এই পথে আমরা আগেও যাতায়াত করেছি। বৃহত্তর তুর্কি আয়ন নদীর ওপারে অবস্থিত এবং গ্রেট খানের এলাকার উত্তর পর্যন্ত প্রসারিত।

এই কাইডু এরই মধ্যে গ্রেট খানের লোকেদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ লড়েছেন, আর কেমন করে সে তার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছে সে কথাই এখন আমি আপনাদের বলতে যাচ্ছি। একটা তথ্য আপনারা হয়তো আগে থেকেই জানেন, কাইডু একবার গ্রেট খানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের বিজিত অংশ থেকে তার দাবি পেশ করে, ক্যাথির এবং মানজির একটা অংশ চেয়ে বসেন। গ্রেট খান তাকে জানান যে অন্যান্য সন্তানদের ক্ষেত্রে তিনি যেমনটা করেছেন তেমনিভাবে তিনি তাকেও তার ভাগ বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছুক, তবে যদি সে, তার অন্যান্য সন্তান এবং অভিজনদের মতোই পারিষদবর্গসহকারে তার দরবারে হাজির হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে। এই শর্তে গ্রেট খান তাদের চীনের বিজিত অংশের ভাগ তাকে বুঝিয়ে দিবেন বলে জানান।

কাইডু, তার চাচা গ্রেট খানকে বিশ্বাস না করার কারণে, এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে বরং তিনি নিজেই তার দেশের প্রতি গ্রেট খানের বশ্যতা আদায় করে নিতে ইচ্ছুক এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় তার দরবারে যাবেন না। এর থেকেই কাইডু এবং গ্রেট খানের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত, যার ফলে তাদের মাঝে বড় বড় অনেক লড়াইসহ প্রচণ্ড এক যুদ্ধের অবতারণা ঘটে। এবং গ্রেট খান কাইডু

রাজ্যের সীমান্ত ঘিরে এক বাহিনী মোতায়েন করেন যাতে তার লোকেদের দ্বারা তার সাম্রাজ্যের জনগণের কোনো প্রকার ক্ষতি হতে না পারে। কিন্তু এত সব সতর্কতার পরও, কাইডু বারবার তার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, সেনাসহকারে অসংখ্যবার তার সৈন্যদের ওপর হামলা চালায়। এরপর রাজা কাইডু, তার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হিসেবে, এক লক্ষ প্রশিক্ষিত রণ কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ আর অভিজ্ঞ অশ্বারোহী সমবেত করেন। এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চেঙ্গিস খানের মতো সাম্রাজ্যের অনেক অভিজাত-অভিজনকে দলে ভেড়ান।

এবার আমরা কাইডু এবং গ্রেট খানের লোকেদের মাঝে সংঘটিত সেই যুদ্ধের কথা বলব, তবে তার আগে আমরা তাদের লড়াই করার ধরন নিয়ে খানিকটা আলোচনা করে নিব। যখন তারা যুদ্ধে যায়, তাদের সবাই সঙ্গে ষাটটা তীর বহন করতে বাধ্য, দূরে ছুড়বার জন্য এর ত্রিশটা ছোট আকারের হয়ে থাকে, কিন্তু বাকি ত্রিশটা বড় আকারের, তাতে ধারালো প্রশস্ত ফলাও থাকে। এগুলো খুব কাছ থেকে শত্রুর মুখে আর হাতে আঘাত হানা এবং ধনুকের তারকাঁটার জন্য ব্যবহার করে তাদের বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করা হয়। আর হাতের সব তীর ফুরিয়ে যাবার পর তরবারি আর গদা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করে।

২

চাচা গ্রেট খানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাইডু রাজার যুদ্ধ

১২৬৬ সালের কথা, রাজা কাইডু, তার চাচাতো ভাই জেসুডারকে সঙ্গে নিয়ে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে গ্রেট খানের দুজন অভিজন তথা ব্যারনকে আক্রমণ করে, অবশ্য এরাও রাজা কাইডুর চাচাতো ভাই, তবে তারা ছিলেন গ্রেট খানের এলাকার জমিদার। এদের একজনের নাম তাবাই এবং ওপর জন সিবান। এরা জাগাতাই-এর ছেলে। সম্রাট কুবলাইয়ের এই আপন ভাই ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত।

কাইডু তার লোকবল নিয়ে তার এই চাচাতো ভাইদের ওপর হামলা করে। তাদের নিজেদেরও বিশাল বাহিনী ছিল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের এক লক্ষ করে অশ্বারোহী সমবেত হয়। সেই অভাবনীয় যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেকেই হত্যার স্বীকার হয়, তবে অবশেষে রাজা কাইডুই জয়ী হন এবং অন্যদের ভীষণভাবে নাস্তানাবুদ করেন। তবে কাউডুর চাচাতো ভাইদের দুজন অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে পালাতে সক্ষম হন।

এই বিজয়ে কাইডুর দর্প এবং ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায় এবং নিজ দেশে ফিরে গিয়ে গ্রেট খানের বিরুদ্ধে আর কোনো শত্রুতা না করে টানা দু'বছর তিনি শান্তিতেই অবস্থান করেন। কিন্তু দু'বছর পর কাইডু আবারও বিশাল এক সেনা সমাবেশ করেন। তিনি জানতেন, কারাকোরানে গ্রেট খানের ছেলে নমোগান এবং

প্রেস্টর জনের নাতি জর্জ, এই দুজন জমিদারের অধীনে বিশাল এক অশ্বারোহী বাহিনী রয়েছে। রাজা কাইডু তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে নিজ দেশ থেকে যাত্রা করে, কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই কারাকোরানের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হন। সেখানে গ্রেট খানের ছেলে এবং প্রেস্টর জনের নাতি তাদের বাহিনীসহ অবস্থান করছিলেন।

তারা এতে একটুও ভীত না হয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুরো বাহিনী সমবেত করেন এবং অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে কাইডু রাজার শিবিরের দশ মাইল দূরে তাঁবু ফেলেন, তাদের সেই বাহিনীতে কম করে হলেও ষাট হাজার সৈন্য ছিল। এভাবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত তারা নিজেদের শিবিরে অবস্থান করে ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। কেননা উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। যা কোনোভাবেই ষাট হাজার অশ্বারোহীর বেশি নয়। এসব সৈনিকদের সবাই তীর, ধনুক এবং তলোয়ার, গদা, বর্মের মতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল।

উভয় সেনাদলই পৃথক কমান্ডারসহ ছয়টা অশ্বারোহী উপদলে বিভক্ত ছিল। এবং উভয় সেনাদলই ময়দানে নেমে এসে অপূর্ব মূর্ছনায় বাদ্যের তালে তালে গাইতে গাইতে নাকড়ার সংকেত বেজে ওঠার অপেক্ষায় ছিল। কেননা তাতাররা তাদের নেতার নাকড়ার সংকেত ধ্বনি শুনতে পাবার আগ পর্যন্ত কখনোই যুদ্ধ আরম্ভ করত না। যখনই নাকড়ার শব্দ শোনা গেল, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং তারা তাদের ধনুকে হাত রাখে আর এর তারে তীর পরায়। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের বাতাস বৃষ্টির মতো তীরে ছেয়ে গেল, আর ঘোড়ার ওপর থেকে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল, আর প্রচণ্ড চিৎকার-চেঁচামেচিতে চারপাশের বাতাস এতটাই ভারী হয়ে উঠল যে স্বয়ং ঈশ্বরের নিক্ষিপ্ত বজ্রপাত থেকেও এমন উচ্চনাদ সৃষ্টি হয় না। সত্যি করে বলতে গেলে একে ওপরের সঙ্গে এরা আমরণ প্রাণঘাতী শত্রু হিসেবেই লড়েছে। এবং তীর শেষ হবার আগপর্যন্ত তারা অনবরত ছুঁড়তেই থাকে; আর প্রচুর হতাহতের কারণে কেউই তাদের পূর্ববর্তী অবস্থানে অটল থাকতে পারে না।

সব তীর শেষ হয়ে যাবার পর তারা ধনুক খাপে রেখে তরবারি, আর গদা নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করে। এভাবে তারা প্রচণ্ড হিংস্র আর চরম ভয়ানক এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরকে হত্যায় মেতে উঠলে অতিশীঘ্র যুদ্ধের ময়দান লাশে ঢেকে যায়। নিজের ব্যক্তিগত সমর্থের কারণে কাইডু অস্ত্র পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে, আর তাতে করে বেশ কয়েকবার পরাজিত হবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবার পরও সেটা তার অনুসারীদের মনোবল অটুট রাখতে কাজে আসে। অন্যদিকে, গ্রেট খানের ছেলে এবং প্রেস্টার জনের নাতিও প্রচণ্ড সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এককথায় এটা তাতারদের মাঝে সংঘটিত সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাত নামার

আগপর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, আর শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেউ কাউকে সেখান থেকে পুরোপুরি হটিয়ে দিতে পারে না। তখনো যুদ্ধের ময়দানে অসংখ্য লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, যা দেখার পর যে কারো মনে করুণা জাগতে বাধ্য। সেদিন অসংখ্য নারী বিধবা হয়েছিল এবং অনেক শিশু চিরতরে এতিম হয়ে গিয়েছিল। এবং সূর্য ডোবার পর উভয় দলের অক্ষত খুব অল্পসংখ্যক রাতের মতো আশ্রয় নিতে গুটিকতক তাঁবুতে ফিরে যায়।

পরদিন, রাজা কাইডু জানতে পারেন গ্রেট খান তার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এক বাহিনী পাঠিয়েছেন। তাই দিনের আলো ফোঁটার আগেই তিনি লোকজনসহ অস্ত্র গুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন এবং সবাইকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হবার আদেশ দেন। আগের দিনের অসহনীয় যুদ্ধে তাদের বিরোধী পক্ষ এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা তাদের অনুসরণের কোনো চেষ্টাই আর করেনি। বরং কোনো ধরনের নিগ্রহ ছাড়াই তাদের চলে যেতে দেয়। বৃহত্তর তুর্কির সমরকান্দ এসে পৌঁছার আগপর্যন্ত পথে তারা কোথাও আর থামেনি।

৩

ভাতিজা কাইডুর করা ক্ষতি দেখে গ্রেট খান যা করলেন

এবার গ্রেট খান কাইডুর ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন, যে কি না বরাবরের মতোই তার লোকেদের এবং দেশের ক্ষতি করে আসছে। এবং যদি সে তার ভাতিজা না হতো তাহলে কোনোভাবেই ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারতেন না। কিন্তু সম্পর্কের বাঁধন তাকে এবং তার দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং কাইডু তার কবল থেকে পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হন। এবার আমরা এই বিষয় রেখে, কাইডু রাজার মেয়ের এক অভাবনীয় ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরছি।

৪

কাইডু রাজকন্যা কেমন করে শক্তিশালী এবং বীরাঙ্গনা হয়ে উঠলেন

আপনাদের হয়তো জানা আছে কাইডু রাজার এক মেয়ে আছে, তাতার ভাষায় যার নাম এইগিআরাম, যার মানে আলোকিত চাঁদ। এই কুমারী এতটাই শক্তিশালী ছিল যে সারা রাজ্যে এমন কোনো যুবক ছিল না যে তাকে লড়াইতে পরাস্ত করতে পারে। সে একে একে তাদের সবাইকেই পরাজিত করে।

তার বাবা রাজা কাইডু তার বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু এ কথা বলে সে বিয়ে করতে অস্বীকার করে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এমন কোনো পুরুষের সাক্ষাৎ পাচ্ছে যে তাকে নিজ ক্ষমতাবলে পরাজিত করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য

কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে না। তাতে করে রাজা, তার বাবা, তাকে এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে সে অবশ্যই নিজের ইচ্ছে অনুসারেই বিয়ে করবে। তাতে করে সেই রাজকন্যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এই ঘোষণা প্রচার করে দেন, যে যদি কোনো যুবক এসে আপন শক্তিবলে তাকে পরাজিত করে জিতে নিতে পারে তাহলে সে তাকে তার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে।

এই ঘোষণা প্রচারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, চারদিক থেকে অনেকেই তাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ছুটে আসতে থাকে। ভীষণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিচার চলতে থাকে। প্রাসাদের মূল সভাকক্ষে অসংখ্য নারী-পুরুষসহকারে রাজা উপস্থিত হন; তারপর কারুকার্য মণ্ডিত বিলাসবহুল সেন্ডালের পোশাক পরে রাজকন্যা এসে হাজির হন এবং তার পেছন পেছন সেন্ডালের পোশাক পরিহিত সেই যুবকও এসে উপস্থিত হন। বোঝাপড়াটা এ রকম, যদি সেই তরুণ তাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে তাহলে সে তাকে স্ত্রী হিসেবে পাবে; কিন্তু যদি সে রাজকন্যার কাছে হেরে যায় তাহলে তাকে এর খেসারত হিসেবে এক শত ঘোড়া দিতে হবে। এভাবে এই তরুণী দশ হাজারের বেশি ঘোড়া জিতে নেয়, কেননা এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে সে লড়েছে তাদের কেউই তাকে হারাতে পারেনি। আর এতে অবাক হবার মতো তেমন কিছুই নেই, কারণ তার প্রতিটা বাহু এতটাই সুগঠিত এবং দেহের আকার এত দীর্ঘাকার আর শক্ত-সমর্থ যে সে পুরোদমে একজন পুরুষেরই মতো।

অবশেষে, ১২৮০ সালে, সেখানে এক ধনাঢ্য রাজার অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক রাজপুত্রের আগমন ঘটে। তার সহচর হিসেবে আসেন উচ্চপদস্থ অনেক রাজকর্মচারী এবং তিনি সঙ্গে করে এক হাজার চমৎকার ঘোড়াও আনেন। সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন এই মহিলার সঙ্গে তার শক্তি পরীক্ষার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। রাজা কাইডু খুব সাদরেই তাকে অভ্যর্থনা জানান, কারণ সে পামার রাজার ছেলে এ কথা জানার পর তিনি এই রাজপুত্রকে মেয়ে জামাই হিসেবে পেতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। আলাদাভাবে মেয়েকে ডেকে তিনি এ কথাও বলেন যাতে সে এবার আপনা থেকেই পরাস্ত হয়। কিন্তু জবাবে তার মেয়ে জানায়, পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েই সে এ ধরনের কোনো কাজ করবে না। অতঃপর রাজা-রানি দুজনেই সভাকক্ষে গিয়ে তাদের আসন গ্রহণ করে, তাদের দুজনের দিকেই একমনে লক্ষ রাখতে থাকেন এবং রাজকন্যা আগের মতোই আচরণ করতে থাকে, রাজপুত্রও কম যায় না, সুদর্শন হলেও সে তার অসম্ভব শক্তি আর বীরত্বের জন্য সবার কাছে আরো বেশি পরিচিত।

তারা মিলনায়তনে এসে উপস্থিত হবার পর, উচ্চপদস্থ দাবি উত্থাপনকারী এসে চুক্তির ব্যাপারে তাদের উভয়ের সম্মতি আদায় করে যে যদি যুবক রাজপুত্র হেরে যান তাহলে তিনি সঙ্গে আনা হাজার ঘোড়া ক্ষতি পূরণ বাবদ প্রদান করবেন। চুক্তি সম্পন্ন হবার পর, হুইসেল বেজে ওঠে; আর উপস্থিত আরো সবার

সঙ্গে রাজা-রানি নিজেরাও মনে-প্রাণে সেই যুবকের বিজয় কামনা করতে থাকে, সে রাজকন্যার স্বামী হোক সেই আশা করতে থাকে। কিন্তু তাদের সবার আশায় গুড়ে বালি দিয়ে রাজকন্যা তাকে আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, বিজয় ছিনিয়ে নেয়। এবং তরুণ সেই যুবরাজকে প্রাসাদের চত্বরে নিক্ষেপ করা হয়, আর সে তার হাজার ঘোড়াও হারায়। সমস্ত কক্ষে এমন কেউ ছিল না যে তার পরাজয়ে ভড়কে যায়নি।

এরপর রাজা তার সেই মেয়েকে অসংখ্যবার যুদ্ধে নিয়ে যান এবং সে সময় মিত্র পক্ষের কোনো বীরব্রত অশ্বারোহী যোদ্ধা তার মতো এমন অসীম বীরত্ব দেখাতে সক্ষম হয়নি; এবং অবশেষে এই কুমারী দ্রুত ধেয়ে গিয়ে শত্রুর একেবারে মাঝামাঝি অবস্থানে পৌঁছে যান এবং এক অশ্বারোহী সৈনিককে বন্দি করে তার লোকের সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন। এবার আমরা এই দৃশ্য রেখে এক মহাযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হবো, কাইডু এবং পুবের অধীশ্বর আবাগার পুত্র আর্গনের মাঝে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

৫
আবাগা ছেলে আর্গনকে যুদ্ধে পাঠান

আবাগা এখন প্রাচ্যের অধীশ্বর, তার অধীনে অসংখ্য প্রদেশ এবং সুবিশাল এক ভূখণ্ড, যার সীমান্ত তিন দিক দিয়ে কাইডু রাজের এলাকা ঘিরে রয়েছে, এই বইয়ের আলেকজেন্ডার তথা আরবোর স্যাকো অংশে সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং কাইডু আবাগা রাজের এলাকার ক্ষতিসাধন করায় তিনি তার দেশের অসংখ্য অশ্বারোহী সৈনিকসহ তার পুত্র আর্গনকে আয়ন নদীর ওপারে আরবোর স্যাকো দেশে পাঠান এবং কাইডু রাজের লোকেদের হাত থেকে দেশকে নিরাপদ করতে তারা সেখানে অবস্থান নেন।

আর্গন এবং তার লোকেরা আরবোর স্যাকোর সমতলজুড়ে অসংখ্য শহর আর প্রাসাদে তাদের সেনা চৌকি স্থাপন করে। কাইডু রাজাও সেখানে বিশাল এক বাহিনী সমবেত করেন এবং তার চৌকস এবং সাহসী ভাই বারাককে এই বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ করে, আর্গনের সঙ্গে লড়ার নির্দেশ দেন। বারাক তার এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আর্গন এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে লড়ার সংকল্প করেন। এবং আয়ন নদীর তীরে পৌঁছার আগপর্যন্ত কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়েই অনেক দিনের পথ অগ্রসর হন। সেখান থেকে আর্গন সেনারা মাত্র দশ মাইল দূরে ছিল। উভয় পক্ষ দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে এবং একপর্যায়ে তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। টানা তিন দিন সেই যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, এরপর বারাক বাহিনী আর্গনের প্রবল

শক্তির কাছে পরাজিত হয় এবং ধাওয়া খেয়ে নদী তীরে গিয়ে ভয়ানক হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হয়।

৬

আর্গন যেভাবে তার বাবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন

বিজয়ের কিছু সময় পর, গুপ্তচর মারফত আর্গন তার বাবা আবাগার মৃত্যুর খবর পান, তাতে করে তিনি ঘোর বিষাদে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সিংহাসন বুঝে নেবার উদ্দেশ্যে তিনি চল্লিশ দিন দূর হতে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে বাবার প্রাসাদের দিকে রওনা হন।

আবাগার এক ভাই ছিল, তার নাম একোম্যাট সোলদান, ধর্মান্তরিত হয়ে সে সারাসিন হয়েছে এবং ভাই আবাগার মৃত্যু সংবাদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে সিংহাসন দখল করার পরিকল্পনা আঁটে, ভাবে বহু দূরে অবস্থানের কারণে আর্গন তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই সে একদল শক্তিশালী সৈন্য সংগ্রহ করে ভাই আবাগার প্রসাদে ঢুকে সিংহাসনের দখল নেন।

আবাগার ধনভাণ্ডারে তিনি এত অঢেল সম্পদের সন্ধান পাবেন তা মোটেই কল্পনা করেননি, তাই সেসব আবাগার ব্যারন আর নাইটদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে অতিশীঘ্র তাদের মন জয় করে নেন, ফলে আবাগার অমাত্যেরা তাকে তাদের একমাত্র রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাছাড়া একোম্যাট সোলদান নিজেকে খুব ভালো একজন নৃপতি হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং সবার ভালোবাসার পাত্র বনে যান। কিন্তু আর্গন তার বিশাল বাহিনীর ধেয়ে আসার খবর শুনতে পাবার পর থেকে, তিনি আর এই অন্যায়ভাবে দখল করা ক্ষমতা খুব বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। কোনোরূপ বিপদ সংকেত না দিয়েই, খুব সাহসিকতার সঙ্গে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যারনদের বিশালসংখ্যক অশ্বারোহী সেনাদল জড়ো করার নির্দেশ দেন এবং তাদের সবাই ঘোষণা করেন যে তারা আর্গনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, আর এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে তারা তাকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেন।

৭

আর্গনের বিরুদ্ধে একোম্যাটের সুবিশাল বাহিনীর যুদ্ধ

একোম্যাট সোলদান পুরো ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করার পর, আর্গনকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন এবং টানা এক দিন অগ্রসর হবার পর জানতে পারেন তার সমসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শত্রু মাত্র পাঁচ দিনের দূরত্বে

রয়েছে, এমন খবর পেয়ে তিনি যাত্রা বিরতি করেন। তারপর বিশাল এক সমতল প্রান্তরে তাঁবু ফেলে, যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান হিসেবে সেখানে শত্রুকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানান দেন।

ছাউনি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, তিনি সেনাদের জড়ো করে তাদের নৃপতির সহকর্মী হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "আপনারা খুব ভালো করেই জানেন কীভাবে আমি আমার ভাই আবাগার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছি, কারণ তিনি আমার বাবার সন্তান এবং আমি এখন আমাদের সমস্ত ভূমি আর রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপনে সহায়তা করছি। এর বেশি আর কিছুই আমি বলতে চাইছি না, কেননা আমি জানি আপনাদের সবাই অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং সবাই ন্যায়বিচার পছন্দ করেন, আর তাই আপনারা সবাই আমাদের সম্মান এবং মঙ্গল নিশ্চিত হয় এমন কাজ করবেন।" তার বক্তৃতা শেষ হবার পর, ব্যারন এবং নাইটসহ উপস্থিত সবাই সমস্বরে জানান যে দেহে প্রাণ অব্যাহত থাকার আগপর্যন্ত তাদের কেউ তাকে ছেড়ে যাবেন না। এরপর একোম্যাট এবং তার বাহিনী শত্রুর জন্য শিবিরে অপেক্ষা করতে থাকেন।

৮
তার ব্যারনদের সঙ্গে আর্গনের মন্ত্রণা

এবার আর্গনের কথা বলা যাক : গুপ্তচর মারফত অনেক আগেই তিনি একোম্যাটের রওনা হবার খবর শুনতে পান এবং এ কথাও জানতে পারেন এত বিশাল বড় বাহিনীসহ সে শিবির স্থাপন করেছে যে এর দ্বারা তার প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সাহসিকতা এবং উৎসাহের সঙ্গে নিজের লোকেদের মাঝে অবস্থান করাকে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই তিনি নিজেও খুব সুবিধাজনক স্থানে শিবির স্থাপন করে, সকল ব্যারন এবং বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের নিজ তাঁবুতে ডেকে এভাবে সম্বোধন করেন, "প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ", তিনি বলেন, "আপনারা জানেন আমার বাবা কতটা স্নেহ ভরে আপনাদের ভালোবাসতেন; জীবিত থাকাকালীন আপনারা তার ভাই এবং সন্তানতুল্য ছিলেন এবং এও জানেন একসঙ্গে আপনরা কতগুলো যুদ্ধে লড়েছেন এবং তার অধিকারে থাকা সমস্ত ভূমি জয়ে কীভাবে আপনারা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। আপনারা এও জানেন যে তার সন্তান হিসেবে আমি আপনাদের কতটা ভালোবাসি এবং আমি নিজেও আপনাদের এত বেশি ভালোবাসি যে আপনারা আমার দেহেরই অংশ। এবং সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সত্যিকার বিজয় সম্ভব, এর মাধ্যমেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারে এবং

আমাদের শত্রুরা ভুলের মাঝে রয়েছে। এর বেশি এখন আর আমি কিছুই বলব না, তবে আবারও সবাইকে প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।”

৯

আর্গনকে দেয়া ব্যারনদের জবাব

আর্গনের এই ভাষণের সময় যেসকল ব্যারন এবং নাইট সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই যুদ্ধে পরাজয়ের বদলে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করতে থাকেন; এবং যখন তারা নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার কথার জবাবে, এক উচ্চপদস্থ ব্যারন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন : “সম্ভাবনাময় জনাব আর্গন, সন্তোষজনক জনাব আর্গন”, তিনি বলেন, “আমরা খুব ভালো করেই জানি আপনি যা বলেছেন তার সবই সত্য এবং এ কারণেই আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধে লড়ার জন্য এখানে উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে সরাসরি বলছি, আমাদের শরীরে জীবন থাকা পর্যন্ত, সবাই বিজয় ছিনিয়ে আনার আগমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাব।”

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, সবাই সমস্বরে চিৎকার করে তার মতের সাথে একমত পোষণ করে এবং সমস্ত সেনাবাহিনী কালক্ষেপণ না করে অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প মনে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং একোম্যাট যেখানে ছাউনি ফেলেছেন সেই বিস্তৃত সমতলে পৌঁছার পর, তার থেকে দশ মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করে। শিবির স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, আর্গন তার কাকার কাছে আস্থাভাজন দুজন দূত প্রেরণ করেন।

১০

আর্গন যেভাবে তার কাকার কাছে দূত পাঠান

অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্বস্ত এই দূতেরা শত্রু শিবিরে পৌঁছাবার পর, তাদের একোম্যাটের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি তার অসংখ্য ব্যারনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেখানে ঢুকবার পরপরই, তারা বিনয়ের সঙ্গে তাকে অভিবাদন জানান। অবশিষ্ট সংকীর্ণ স্থানে বসতে দেবার কিছুক্ষণ বাদে, তাদের একজন দাঁড়িয়ে এই বার্তা পাঠ করতে শুরু করেন : “প্রাচুর্যময় জনাব একোম্যাট”, সে বলে, “আপনার ভাতিজা আর্গন তার সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয়ায় আপনার এ ধরনের আচরণে প্রচণ্ডভাবে বিস্মিত হয়েছেন এবং এখন আবারও মারাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন; সত্যিকার অর্থে এটা মোটেই কল্যাণকর নয়, আপনিও ভাতিজার প্রতি একজন দায়িত্ববান চাচার মতো আচরণ করছেন না। তাই তিনি আমাদের মাধ্যমে আপনাকে এ কথা জানিয়ে দিতে চাইছেন যে তিনি বিনয়ের সাথে আপনার কাছে

আবেদন করছেন, যেন দায়িত্ববান চাচা এবং পিতার মতোই আপনি তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেন, যাতে আপনার এবং তার মাঝে কোনোরূপ যুদ্ধ সংঘটিত না হয় এবং সে যেন আপনাকে উপযুক্তভাবে সব ধরনের সম্মানে সম্মানিত করতে পারে এবং আপনাকে যাতে তার অধীনস্ত সমস্ত ভূমির নৃপতি করতে পারে। এই বার্তা আমাদের মাধ্যমে আপনার ভাতিজা আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

১১

আর্গনের বার্তায় একোম্যাটের জবাব

একোম্যাট সোলদান ভাতিজা আর্গনের এই বার্তা শুনবার পর এভাবে তার জবাব দেন : "জনাব দূতগণ", তিনি বলেন, "আমার ভাতিজা যা বলেছে তা প্রকৃতপক্ষে অসার, কেননা এই ভূমি আমার এবং কোনোরূপেই আর তার নয়। আমি তার বাবার মতোই এটা জয় করে নিয়েছি; এবং তাই আমার ভাতিজাকে বলবেন যে সে চাইলে, আমি তাকে মহান এক নৃপতি বানিয়ে দিব এবং আমি তাকে যথেষ্ট জমিও দিব এবং সে আমার ছেলের মতোই থাকবে এবং আমার পর সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হবে। এবং সে যদি তা না চায় তাহলে তাকে হত্যা করতে আমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করব। এখন আমি আমার ভাতিজার জন্যে সেটাই করতে যাচ্ছি এবং কোনো কিছুই, অথবা কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমেই আপনারা তাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না।"

একোম্যাট কথা শেষ করার পর দূতেরা তাকে আবারও জিজ্ঞেস করেন, "এটাই কি আপনার শেষ কথা?" "হ্যাঁ", তিনি বলেন, "আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত এর কোনো নড়চড় হবে না।"

দূতেরা তৎক্ষণাৎ চলে আসেন এবং যতটা দ্রুত সম্ভব তারা আর্গনের তাঁবুতে এসে হাজির হন, সেখানে প্রবেশ করে তারা তাকে সব কিছু খুলে বলেন। আর্গন চাচার সব কথা শুনবার পর, প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে তার কাছের সবাই শুনতে পান তিনি বলেন, "চাচার দ্বারা এভাবে অপমান, অপদস্থ আর ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর, বিশ্বের সবার মুখে মুখে ফিরবে এর এমন কোনো প্রতিশোধ নেবার আগপর্যন্ত আমি এই ভূমি বা জীবন কোনোটাই চাই না!"

এ কথা বলার পর, তার ব্যারন এবং নাইটদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন : "এই অভাগা বিশ্বাসঘাতককে যত দ্রুত সম্ভব হত্যা করা ছাড়া এখন আর আমাদের সামনে কোনো পথ খোলা নেই, আর আমার সিদ্ধান্ত হলো, কাল সকালের মধ্যেই আমরা ওদের আক্রমণ করব এবং সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে সমূলে ধ্বংস করব।" নাইটেরা সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে; এবং একোম্যাট সোলদানও তার গুপ্তচর মারফত আর্গনের পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব ভালো করেই

জানতে পারেন, তিনিও যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকেন এবং নিজের লোকেদের সবকিছু সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য সতর্ক করতে থাকেন।

১২
আর্গন এবং একোম্যাটের যুদ্ধ

পরদিন সকালে, আর্গন তার লোকেদের ডেকে যুদ্ধের রীতি অনুসারে দক্ষভাবে সশস্ত্র সাজে সজ্জিত হতে বলেন, উৎসাহব্যঞ্জক স্বরে ডেকে ওঠেন, এরপর তারা সবাই শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। একোম্যাটও এই একই কাজ করে এবং পথে দুই বাহিনী সামনাসামনি হবার পর কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই একে ওপরের ওপর প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ শুরু করে। অঝোর ধারায় তীর নিক্ষেপের মধ্যদিয়ে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তা এতই নিবিড় যেন আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরছে, আর একের পর এক সৈন্য চিৎকার করতে করতে গোঙাতে গোঙাতে প্রাণঘাতী ক্ষত নিয়ে ঘোড়া ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। উভয় পক্ষের প্রচুরসংখ্যক সেনা কাটা পড়ে, কিন্তু অবশেষে, তার বাহিনীর সবার থেকেও অধিক এবং অসাধারণ সাহসিকতার স্বাক্ষর রাখলেও, ভাগ্য সদয় না হওয়ায়, আর্গনের সব প্রচেষ্টাই বিফলে যায়, তার বাহিনী পালাতে বাধ্য হয় এবং একোম্যাট তার লোকবল নিয়ে নিজে খুব কাছে থেকে ধাওয়া করে তাদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে।

পালাবার সময় আর্গন নিজেও ধরা পড়েন, এরপর তার বাহিনীর পেছনে ধাওয়া থামানো হয় এবং বিজয়ীরা অপরিমেয় আনন্দ-ফুর্তি করতে করতে নিজেদের ছাউনি এবং তাঁবুতে ফিরে আসে। একোম্যাট তার ভাতিজা আর্গনকে বন্দি করে সেনা প্রধানকে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার আদেশ দিয়ে, নারীদের সঙ্গ উপভোগ করতে এমনভাবে প্রাসাদে ফিরে যান যেন তার বাহিনীর লোকেদের কিছুই হয়নি।

১৩
আর্গন কীভাবে মুক্ত হন

এবার প্রবীণতম এবং উর্ধ্বতন এক ব্যারনের মনে, আর্গনের এমন অবস্থা দেখে, করুণার উদ্রেক হলে তিনি বলতে শুরু করেন, আমাদের রাজাকে একজন কয়েদির মতো বন্দি করে রাখা আমাদের ঘোরতর অন্যায় এবং অবিশ্বস্ততার নজির, আর তাই তিনি তাকে মুক্ত করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকেন।

এই একই ধরনের আবেগ জাগাবার জন্য তিনি অন্যান্য আরো অনেক ব্যারনের সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্যান্যদের থেকে তার বয়স অনেক বেশি হবার

কারণে, সবাই তার প্রজ্ঞা এবং মেধা সম্পর্কে অবহিত থাকায়, ব্যক্তিগত প্রভাবে, খুব সহজেই তিনি সবাইকে তার এই সাহসী উদ্যোগের প্রতি রাজি করাতে সক্ষম হন এবং সবাই তার কথামতো কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সাহসী উদ্যোগের নেতার নাম বোগা এবং তার সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত অন্য নেতাদের নাম এলসিডাই, টোগান, টেজানা, টাগা, টাইয়ার ওউলাটাই এবং সামাগার।

তাদের সঙ্গে নিয়ে বোগা আর্গন যেখানে বন্দি ছিলেন সেই তাঁবুতে যান এবং তাকে বলেন যে তার বিরুদ্ধে যা যা করা হয়েছে এর সব কিছুর জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তাদের এই ভুলের অনুশোচনা থেকেই তারা তাকে মুক্ত করে তাদের রাজা হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছে।

১৪
আর্গন কীভাবে তার সার্বভৌমত্ব ফিরে পান

আর্গন ব্যারনদের মুখে এ ধরনের কথা শোনার পর, প্রথমে সে ভাবে তারা হয়তো তাকে নিয়ে তামাশা করতে এসেছে, এতে তিনি খুব খেপে গিয়ে সবাইকে গালাগাল দিতে শুরু করেন। "জনাব আপনারা", তিনি বলতে শুরু করেন, "কয়েকজন আমাকে চূড়ান্ত উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছেন এবং নিজেদের সেই ভুলে সন্তুষ্ট হয়ে আপনাদের সত্যিকার রাজাকে কারাবন্দি করে রেখেছেন। আপনারা জানেন যে আপনারা ভুল আচরণ করেছেন, আর তাই আমি আপনাদের এখান থেকে চলে যাবার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করছি, দয়া করে আমাকে নিয়ে এর বেশি ব্যঙ্গ করবেন না।"

"জনাব আর্গন", বোগা বলেন, "আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমরা আপনাকে নিয়ে মোটেই মজা করছি না, বরং আমরা যা বলছি তা একেবারে সত্য এবং আমরা যা বলছি তা আমাদের বিশ্বাসের কসম নিয়েই বলছি।" তারপর উপস্থিত ব্যারনদের সবাই তার নৃপতি পদ ধরে রাখার জন্য তার সামনে এক শপথবাক্য পাঠ করেন।

আর্গনও অতীতে তারা তার বিরুদ্ধে যা যা করেছেন তার জন্য সামনের দিনে কোনোরূপ ব্যবস্থা না নেবার এবং এর বদলে তিনি তার প্রিয় পিতা আবাগা তাদের প্রতি যে আচরণ করতেন তিনিও তাদের সবাইকে সেই চোখেই দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এবং পারস্পরিক এই শপথ সম্পন্ন হবার পর, তারা আর্গনকে সেই কারাগার থেকে মুক্ত করে, তাকে তাদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করে। এরপর আর্গন তাদের সেনাপতির তাঁবুতে তীর ছুড়তে আদেশ করেন, তারাও সেমতোই কাজ করে, আর এভাবে সেনা প্রধান মারা পড়ে। সেই সেনাপতির নাম সোলদান, যিনি একোম্যাটের অব্যবহিত পর সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। এভাবে আর্গন তার সার্বভৌমত্ব ফিরে পান।

১৫
আর্গন যেভাবে তার চাচার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন

এবং তার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হয়েছে এটা বুঝতে পারার পর, তিনি তার সেনাবাহিনীকে প্রাসাদের দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এদিকে এক দিন একোম্যাট তার মূল প্রাসাদের দরবারে বসে অসম্ভব ধরনের আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকার সময় একজন দূত এসে হাজির হন এবং বলেন : "জনাব, আমি এবার আপনার কাছে আগের মতো স্বাভাবিক কোনো সংবাদ আনতে পারিনি, বরং ভয়ানক এক অশুভ সংবাদ এনেছি। ব্যারনরা সবাই মিলে আর্গনকে মুক্ত করে তাকে সার্বভৌম রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছে, আর তারা আপনার প্রাণপ্রিয় বন্ধু সেনাপ্রধান সোলদানকে হত্যা করেছে; আর আমি আপনাকে এখন নিশ্চিত জানাচ্ছি তারা এখন আপনাকে পাকড়াও করে হত্যা করার জন্য এদিকেই ছুটে আসছে। অনতিবিলম্বে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ করণীয় সম্পর্কে মন্ত্রণা গ্রহণ করুন।"

একোম্যাট এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে প্রচণ্ড বিস্মিত হন এবং ভয়ে ভীত হয়ে কী করা উচিত তা একেবারেই ভুলে যান; কিন্তু অবশেষে, সাহসী আর প্রাজ্ঞ জনের মতোই, দূতকে তিনি এই খবর অন্য আর কাউকে জানাতে নিষেধ করেন এবং অতিশীঘ্র তার সবচাইতে বিশ্বস্ত লোকেদের অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসতে আদেশ দেন। কোথায় যাচ্ছেন তা কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি ব্যাবিলনিয়ার সুলতানের কাছে যাত্রা করেন, ভাবেন এতে হয়তো তার জীবন রক্ষা পাবে।

ছয় দিন পর তিনি এক তল্লাশি চৌকির কাছে উপস্থিত হন, কিছুতেই তার পক্ষে সেটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি, এর তত্ত্বাবধায়ক জানতেন ইনিই একোম্যাট এবং বুঝতে পারেন তিনি পালিয়ে নিরাপদে কোথাও সরে পড়ার চেষ্টা করছেন। এই লোক তাকে পাকড়াও করার জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন এবং এভাবে সেধে এসে ধরা দেয়ায় খুব সহজেই কাজটা তিনি করতে পারেন। একোম্যাটকে কঠোর পাহারাসহকারে সঙ্গে নিয়ে তিনি দরবারের দিকে রওনা হয়ে, আর্গনের পৌঁছা এবং দখল পাকাপোক্ত করবার তিন দিন পর সে সেখানে হাজির হতে সক্ষম হয়।

১৬
ভাতিজার আদেশে যেভাবে একোম্যাটকে হত্যা করা হয়

যখন, কয়েদি হিসেবে তাকে আর্গনের হাতে তুলে দেয়া হয়, তিনি কল্পনাতীত আনন্দে ফেটে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেনা সমাবেশের ডাক দেন, কারো সঙ্গে কোনো প্রকার পরামর্শ না করেই তার লোকেদের একজনকে তিনি আদেশ প্রদান

করেন যাতে তার চাচাকে হত্যা করে এমন জায়গায় তার মরদেহ নিক্ষেপ করা হয় যেখান থেকে তাকে দ্বিতীয়বার দেখা সম্ভব না হয়। এই আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্যকর করা হয়। এভাবে আর্গন এবং তার চাচা একোম্যাটের মধ্যকার বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭
আর্গনের মৃত্যু

এসব কিছু সম্পন্ন হলে এবং মূল স্থানসমূহের দখল পাকাপোক্ত করবার পর, তার বাবার সময়কার সকল ব্যারনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাকে তাদের বৈধ রাজা হিসেবে মেনে নেন।

এরপর আর্গন তার ভূমি এবং লোকেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য পুত্র ক্যাসানকে ত্রিশ হাজার সৈন্যসহকারে আরবোর স্যাকোতে পাঠান। ১২৮৬ সালে প্রভু যিশুর নামে আর্গন তার সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করেন এবং এর আগের দু'বছর একোম্যাট তার সার্বভৌমত্ব অন্যায়ভাবে দখল করেছিলেন। এভাবে আর্গন টানা ছয় বছর রাজত্ব করেন, এই সময় অতিবাহিত হবার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তবে জনশ্রুতি হিসেবে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় বলে প্রচলিত রয়েছে।

১৮
আর্গনের মৃত্যুর পর কোয়াইয়াকাটু যেভাবে করে সিংহাসন দখল করে

আর্গন মারা যাবার পর কোয়াইয়াকাটু নামের তার এক চাচা সিংহাসনের দখল নেন, ক্যাসান আরবোর স্যাকোতে থাকায় তার জন্য কাজটা আরো বেশি সহজ হয়।

বাবার মৃত্যু এবং চাচার কাজকারবারের কথা শুনে ক্যাসান প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু সে সময় শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকির কারণে তিনি চৌকি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবু, তার বাবা একোম্যাটের যে পরিণতি করেছিলেন, সেরকম প্রতিশোধমূলক কিছু একটা করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ খুঁজছিলেন। কোয়াইয়াকাটু সার্বভৌমত্ব কুক্ষিগত করেন এবং ক্যাসানের সঙ্গী ছাড়া বাকি সবাই তার প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি ভাতিজা আর্গনের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আরো অনেক নারীদের নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে ওঠেন। এভাবে টানা দু'বছর কোয়াইয়াকাটু সিংহাসন উপভোগ করেন, এর পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯

কোয়াইয়াকাটুর মৃত্যুর পর কীভাবে বাইডু সিংহাসনের দখল নেন

কোয়াইয়াকাটুর মৃত্যুর পর বাইডু নামে তার এক খ্রিস্টান চাচা, সিংহাসন দখল করেন এবং ক্যাসান আর তার বাহিনী ছাড়া বাকি সবাই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ১২৯৪ সালে এই ঘটনা ঘটে।

কী ঘটেছে তা জানতে পারার পর ক্যাসান আগেকার কোয়াইয়াকাটুর চেয়েও বাইডুর ওপর আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যেভাবে বলা হয়েছিল তেমনি সবার ওপর প্রতিশোধ নেবার হুমকি দেন এবং কালক্ষেপণ না করে তিনি তার বাহিনী নিয়ে সেদিকে রওনা হন।

ক্যাসান তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধেয়ে আসছে, এ কথা জানার পর, তিনি বিশাল এক সৈন্য সমাবেশ করেন এবং দশ দিনের পথ অগ্রসর হয়ে ছাউনি ফেলে লড়বার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

দু'দিন পেরিয়ে যাবার পর ক্যাসানের দেখা মেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ বেঁধে যায়, বাইডুর পুরোপুরি পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যার অবসান হয় এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। এবার ক্যাসান সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২৯৪ সালে তিনি দেশ শাসন শুরু করেন। এভাবে প্রাচ্যের তাতার সাম্রাজ্য আবাগা থেকে ক্যাসানের অধিকারে আসে, যিনি এখন এর রাজত্ব করছেন।

২০

দূর উত্তরের তাতার রাজদের কথা

জানা যায়, যে বিশ্বের উত্তর অংশেও কাইডু নামের এক প্রধানের অধীনে অসংখ্য তাতারের বাস, তাদের এই রাজা চেঙ্গিস খানের বংশধর এবং কুবলাই খানের নিকটাত্মীয়। তিনি অন্য কোনো রাজার অধীন নন। তার লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে আসছে এবং তাই তাদেরকে বিশুদ্ধ তাতার হিসেবে গণ্য করা হয়।

এইসব তাতারেরা পৌত্তলিক এবং নাগাই নামের এক দেবতার পূজা করে, যার মানে ধরণীর দেবতা, কেননা তাদের চিন্তা-চেতনা এবং বিশ্বাস হলো তাদের এই ঈশ্বরের পৃথিবীর এবং এতে জন্মানো সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে। তারা তাদের কল্পনা অনুসারে এই মেকি ঈশ্বরের প্রতিমা গড়েছে, যার বর্ণনা আগের অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

তাদের রাজা এবং সেনাবাহিনী প্রাসাদ বা দুর্গের মতো আবদ্ধ স্থানে বসবাস করে না, বরং সব সময় আশপাশের উন্মুক্ত উপত্যকা, সমভূমিতে বা বনে অবস্থান

করে। এরা কোনো প্রকার শস্যের আবাদ করে না, কেবল দুধ আর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে এবং পরস্পর শান্তি ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে বসবাস করে; এরা সবাই তাদের রাজার প্রতি অবিতর্কিতভাবে অনুগত, রাজ্যের শান্তি এবং একতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তার কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে না, যা সার্বভৌমত্বের অন্যতম শর্ত। এদের বিশাল বিশাল ঘোড়ার পাল এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু রয়েছে। উত্তরের এইসব জেলাতে বিশাল আকৃতির শ্বেত ভালুকের সন্ধান মিলে, যার এক একটি বিশ কদম দৈর্ঘ্যের। এখানে শেয়ালও রয়েছে, যার পশম পুরোপুরি কালো, অসংখ্য বুনো গাধাও রয়েছে, সেই সঙ্গে রন্ডস নামের একধরনের প্রাণীও পাওয়া যায়, যার লোম অত্যন্ত পেলব, আর আমাদের লোকেদের কাছে তা জিবেলাইন বা স্যাবল নামে পরিচিত। এর পাশাপাশি সেখানে নেউলে বা বেজি জাতীয় ছোট ছোট আরো অনেক জন্তু-জানোয়ার রয়েছে আর সেগুলো ফারোহ ইঁদুর নামে পরিচিত। এগুলো ঝাঁক বেঁধে চলাচল করে, তবে তাতাররা এদের এমন কৌশল অবলম্বন করে ধরে যে তাদের হাত থেকে এদের একটাও পালিয়ে বাঁচতে পারে না।

অধিবাসী অধ্যুষিত এই দেশে যেতে হলে সমতলের ওপর দিয়ে চৌদ্দ দিনের পথ পাড়ি দিতে হবে, যা একেবারেই জনমানবহীন এবং মরুপ্রান্তরের সেই জনমানবহীন প্রান্তরে একটু পরপর এত বেশি পানির উৎস আর ঝরনা দেখতে পাওয়া যায় যে সেটাকে একটা জলভূমি বলেই মনে হবে। অতি দীর্ঘ সময় ধরে শীতল আবহাওয়া বিরাজ করার কারণে কেবল বছরের কয়েক মাস ছাড়া এসব জমাট বেঁধে থাকে, সে সময় সূর্যের তাপে বরফ গলে যায় এবং মাটি কাদায় পরিণত হয়, যার ওপর দিয়ে ভ্রমণ করা এর পুরোটা জমাট বাঁধা থাকার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টসাধ্য।

আর এই কারণেই বণিকেরা সেখানে যেতে পারেন এবং লোম সংগ্রহ করতে পারেন, যার ওপর সেখানকার সম্পূর্ণ বাণিজ্য নির্ভরশীল। এখানকার লোকেরা এই জলাময় মরু পর্যটকদের চলাচল সুগম রাখতে, পথের এক দিন অন্তর অন্তর দূরত্বে কাঠের বাড়ি তৈরি করে রেখেছেন, বাড়িগুলো মাটি থেকে সামান্য উঁচু। আগে থেকেই এখানে লোক থাকে, তাদের কাজ হলো বণিকদের থাকার ব্যবস্থা এবং পরদিন এর পরের স্টেশনে যেতে সহায়তা করা। এভাবে সম্পূর্ণ মরু পেরোবার আগপর্যন্ত তারা ধাপে ধাপে এগোতে সক্ষম হন।

ভূমির জমাটবাঁধা তলের ওপর দিয়ে ভ্রমণের জন্য, তারা একধরনের ছোট আকৃতির যান তৈরি করেছে, এগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের সেই যানগুলোর খুব একটা পার্থক্য নেই, যেগুলোতে চড়ে স্থানীয়েরা ঢাল আর দুর্গম পাহাড়ি এলাকাতে যাতায়াত করে থাকে। তাদের এই বিশেষ ধরনের যানের নাম ট্রাগুলা বা শ্লেজ। চাকার বদলে এগুলোর তলা একেবারে সমান, তবে সামনের দিকে সামান্য

বাঁকানো থাকে, এর সাহায্যে খুব সহজেই তা বরফের ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারে, কুকুরসদৃশ একপ্রকার ছোট ছোট প্রাণী এইসব গাড়িগুলো টেনে নিয়ে চলে, এরা অনেকটা গাধার সমান। এই প্রাণীগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী। এগুলোর ছয়টা মিলে এ ধরনের একটা বাহন অনায়াসে টেনে নিয়ে যেতে পারে। আর একজন ড্রাইভার এই প্রাণীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এবং মালামালসহ একজন বণিক সেগুলোতে যাতায়াত করেন। দিনের ভ্রমণ শেষ হলে কুকুরের দলসহ সেই লোক ফিরে যান। বণিকও লোমওয়ালা চামড়াসহ আপন গন্তব্যে ফিরেন এবং আমাদের ওখানে গিয়ে এসব জিনিস ভালো দামে বিক্রি করেন।

২১
যেসব দেশ অন্ধকার অঞ্চল হিসেবে পরিচিত

সেই সব তাতারেরা যেখান থেকে লোমশ চামড়া সংগ্রহ করে বলে একটু আগে যে কথা বলা হলো, তা থেকেও বহু দূরে উত্তরের একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত সুবিস্তৃত এক অঞ্চল রয়েছে, আর এই এলাকাটি অন্ধকার অঞ্চল নামে খ্যাত। সেখানে শীতের বেশিরভাগ সময়জুড়ে সূর্য অদৃশ্য থাকে এবং একইভাবে আবহাওয়াও এমনই ঘোলাটে থাকে যে কেবল দিনের শুরুটুকুই আঁচ করা সম্ভব হয়, যখন আপনাকে কোনো দিকে তাকাতে বললে পারতপক্ষে কিছুই দেখতে পাবেন না।

এই দেশের লোকেরা সুঠাম দেহের অধিকারী এবং যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু এদের দেহের বর্ণ খুবই ফ্যাকাসে। এরা কোনো রাষ্ট্র বা রাজার অধীনে সংঘটিত নয়, তাই তাদের ওখানে প্রতিষ্ঠিত কোনো আইন বা রীতি-নীতি বলতে কিছুই আসলে নেই, এরা তাই হিংস্র পশুর মতোই জীবনযাপন করে। এদের বুদ্ধিমত্তাও স্থূল এবং এরা অনেকটা মূঢ়তায় আক্রান্ত। তাতাররা প্রায়ই তাদের গবাদিপশু এবং মালামাল ছিনিয়ে নেবার জন্য এইসব লোকেদের বিরুদ্ধে লুটের অভিযান পরিচালনা করে। আর তাই এরা অন্ধকার বিরাজ করা মাসগুলোর সুযোগ কাজে লাগায়, যাতে তাদের কেউ দেখতে না পারে। লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে আগেকার পথে বাড়ি ফিরতে যাতে কোনোক্রমেই ব্যর্থ না হয় সে জন্য এই লুটেরা তাতাররা অশ্বশাবক ফেলে রেখে তাদের ঘোটকী নিয়ে রওনা হয়। তারপর তাদের এই অন্ধকারের কাজ সুসম্পন্ন হলে, আবারও তারা আলোকিত এলাকাতে ফিরে যেতে মরিয়া হয়ে, ঘোটকীগুলোর গলার লাগাম খুলে নিয়ে তাদের মুক্তভাবে পথ চলতে দেয়। তখন সেগুলো তাদের মাতৃত্বের টানে যেখানে শাবক ফেলে রেখে এসেছে আগেকার সেই জায়গাতে ফিরে আসে। আর এভাবে এদের আরোহীরা নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।

এখানকার অধিবাসীরা গ্রীষ্মের সুযোগটুকু খুব ভালোভাবেই কাজে লাগায়, তখন এরা অবিরাম দিনের আলো উপভোগ করতে পারে, এ সময় এরা অসংখ্য আর্মিন—এই প্রাণী গ্রীষ্মে বাদামি এবং শীতে সাদা বর্ণ ধারণ করে, নেউলে, শেয়াল এবং এ ধরনের আরো অনেক পশু শিকার করে, যাদের চামড়া অনেক বেশি তুলতুলে, নরম আর দামের দিক থেকেও চড়া। তাতারদের জেলাগুলোতে এগুলো খুব ভালো দামে বিকায়। গ্রীষ্মে, এইসব লোকেরা তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে এই সব চামড়া নিয়ে যায় এবং সুযোগ বুঝে অনেক বেশি দামে বিক্রি করে। এদের কোনো কোনোটা রাশিয়া থেকেও অনেক দূরের দেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা নিয়ে আমরা এই বইয়ের একেবারে শেষের অংশে আলোচনা করব।

২২
রাশিয়া প্রদেশ এবং এর অধিবাসীদের কথা

রাশিয়া প্রকাণ্ড এক প্রদেশ, এটা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং এর সীমান্ত একটু আগে আলোচনা করা সেই উত্তরের অন্ধকার অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। অধিবাসীরা খ্রিস্টান এবং তাদের চার্চে গ্রিক আচার-অনুষ্ঠান অনুসরণ করা হয়।

পুরুষেরা দেখতে খুবই সুশ্রী, লম্বা এবং গাত্রবর্ণ ফর্সা। মহিলারাও দেখতে সুন্দরী এবং আকার-আকৃতিতে ভালো, চুলের রং হালকা, আর এরা বড় চুল রাখতে অভ্যস্ত। এই দেশ পশ্চিমা তাতার রাজকে কর দেয়, যার অঞ্চলের পূর্ব সীমান্ত এই দেশের সঙ্গে এসে মিলেছে। এখানে অঢেল পরিমাণে আর্মিন, আকোর্লিনি, স্যাবল, নেউলে, শেয়াল এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রাণী রয়েছে, সেই সঙ্গে এখান থেকে প্রচুর মোমও আহরিত হয়। এখানে বেশ কয়েকটা খনি রয়েছে, যার থেকে প্রচুর পরিমাণে রুপা উত্তোলিত হয়।

রাশিয়া প্রচণ্ড শৈত্যবহুল এলাকা, আর আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এটা উত্তর সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, এখান থেকে, এই বইয়ের আগের অংশে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রচুর সংখ্যায় বাজ ধরা ও সংগ্রহ করা হয়, আর এখান থেকে সেগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।

২৩
কনস্টান্টিনোপল প্রণালি

পশ্চিমের সুবিশাল সাগর থেকে যেখান দিয়ে একটা প্রণালি মহাসাগরের দিকে গেছে, সেখানে ফেরো নামের এক পাহাড় রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে বলার আগে আমি আমার মত বদলেছি, কারণ অনেকেই এর সম্পর্কে জানেন, তাই এখানে

আমি এর কোনো বর্ণনা তুলে না ধরে, অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক। আর তাই এখন আমি আপনাদের তাতার পোনেন্ট-এর কথা বলব, এই রাজা এখানকার লোকেদের ওপর রাজত্ব করছেন।

২৪
পশ্চিমের তাতার রাজ

পশ্চিমের প্রথম তাতার রাজা হলেন সেইন, তিনি ছিলেন খুব মহান এবং ক্ষমতাধর একজন রাজা। তিনি রাশিয়া, কোমানিয়া, এলানিয়া, ল্যাক, মেনজিয়ার, জিক, গুসিয়া এবং গাজারি জয় করেন। রাজা সেইন এই সমস্ত প্রদেশ দখল করে নেন। এই বিজয় অভিযানের আগে, এর সবগুলো প্রদেশ (রোমানিয়ান, এই প্রদেশের কোনোটাই একক সরকারের অধীনে ছিল না, আর এই ঐক্যহীনতার কারণেই তারা তাদের ভূমির অধিকার হারায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে যারা তাদের মাতৃভূমিতেই থেকে যান তাদের রাজা সেইন-এর অধীনে ভূমি দাসবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে হয়।)

রাজা সেইনের পর রাজা পট্যু সিংহাসনে আরোহণ করেন, তারপরে ক্ষমতায় আসেন বেরকা, তার পরের রাজার নাম মুংলেটেমুর, এর পরের জন রাজা টোটামাংগু এবং সব শেষে বর্তমানে সেখানে রাজত্ব করছেন টোকটাই।

পশ্চিমা তাতার রাজাদের তালিকা উপস্থাপনের পর, এবার আমরা প্রাচ্য রাজ আলাউ এবং পশ্চিমা রাজা বেরকার মধ্যে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের বর্ণনা এবং এর কারণ আর ফলাফল তুলে ধরছি।

২৫
আলাউ এবং বেরকা-এর মধ্যকার যুদ্ধ

১২৬১ সালে, পূর্বের তাতার রাজা আলাউ এবং পশ্চিমা তাতার রাজা বেরকা-এর মাঝে ভয়াবহ এক বিবাদের সূত্রপাত হয়। দুই দেশের সীমান্তবর্তী একটা প্রদেশ উভয় পক্ষ তাদের নিজেদের বলে দাবি করা থেকেই এই বিবাদের শুরু। তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে প্রতিরোধ করার ঘোষণা দিয়ে তা দখলের দিন-ক্ষণ প্রচার করতে থাকে এবং তাদের এই কাজে যে বাধা দিতে আসবে তাকেই আক্রমণের শিকার হতে হবে বলে জানায়।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই তাদের লোকবল জড়ো করতে থাকে এবং পরস্পরের প্রতি তারা এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, মাত্র ছয় মাসের মাথায় উভয় পক্ষ তিন লক্ষ প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈনিকসহ যুদ্ধের জন্য দরকারি সব কিছু জড়ো করে।

আলাউ, প্রাচ্যের নৃপতি, এবার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং উল্লেখ করা যেতে পারে এমন কোনো কিছুর মোকাবেলা না করে তাদের আরো অনেক দিনের পথ পাড়ি দিতে হয়। অবশেষে তারা আয়রন গেইট এবং সারাইন সাগরের মধ্যবর্তী অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক সমতলে এসে পৌঁছে। এখানে এসে তারা খুব মজবুত করে শিবির প্রস্তুত করে এবং সেই শিবিরের ভেতর অসংখ্য ভবন আর তাঁবু নির্মাণ করে। জায়গাটা দুই দেশের সীমান্তের মাঝামাঝি হওয়ায় বেরকাকে সেদিকেই আসতে হবে এই ভেবে আলাউ সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

২৬
যেভাবে করে বেরকা এবং তার মিত্ররা আলাউ-এর মোকাবেলা করেন

এরই মধ্যে বেরকা রাজেরও সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি জানতে পারেন আলাউও রওনা হয়ে গেছেন, তাই সে এখন অবশ্যই পথে কোথাও থাকবে এবং এই সময়ের মধ্যে তিনিও সেই একই সমতলে গিয়ে হাজির হন, যেখানে তার শত্রু তাদের জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছে এবং তিনি সেই শত্রু শিবির থেকে দশ মাইল দূরে তাঁবু খাটান।

আলাউ-এর মতো বেরকার শিবিরও খুবই সমৃদ্ধ এবং তার সৈন্য সংখ্যা আরো বেশি, তার ছাউনিতে পুরো তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত রয়েছে।

২৭
তার সৈনিকদের প্রতি আলাউ-এর ভাষণ

আলাউ যখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে বেরকাও বিশাল এক বাহিনীসমেত সমতলের অন্য প্রান্তে এসে হাজির হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাহিনীর প্রধানদের ডাকেন এবং এই ভাষণ দেন—"প্রিয় ভাই, বন্ধু এবং পুত্রগণ", তিনি বলেন, "আপনারা জানেন যে সমস্ত জীবন ধরেই আমি আপনাদের নানাভাবে পুরস্কৃত এবং সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছি এবং আপনারাও আমাকে অসংখ্য যুদ্ধ জয়ে সহযোগিতা করেছেন, আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমি কোনো যুদ্ধেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হইনি এবং এ কারণেই আমরা এখানে এই ক্ষমতাধর লোক বেরকার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছি। আমি খুব ভালো করেই জানি যে তার সঙ্গে আমাদের চেয়ে বেশি লোক রয়েছে, কিন্তু ওরা অতটা দক্ষ নয় এবং এ বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই আমরা ওদের সবার সঙ্গে লড়ব এবং পরাজিত করব। আমি কেবল আপনাদের অভিভূত করার মতো এখন একটা কথাই বলছি,

আর তা হলো যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়ের চাইতে সম্মান রক্ষার খাতিরে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়, তাই প্রত্যেকে নিজেদের সম্মান রক্ষার খাতিরে লড়বেন এবং আমাদের শত্রুকে পরাজিত করে হত্যা করবেন।"

এভাবে উভয় রাজা তাদের সৈনিকদের অনুপ্রেরণা দিয়ে, যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং সবাই সর্বোচ্চভাবে এর জন্য প্রস্তুত থাকে।

২৮
আলাউ এবং বেরকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

যুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট দিনে, আলাউ খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন এবং তার লোকেদের অস্ত্র-সজ্জাসহকারে হাজির হতে নির্দেশ দেন এবং সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে বাহিনী সুবিন্যস্ত করেন। তিনি একে ত্রিশটা স্কোয়াড্রনে ভাগ করেন, যার প্রতিটা স্কোয়াড্রন হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের মাধ্যমে গঠিত, এর প্রতিটার জন্য একজন করে দক্ষ নেতা এবং প্রশিক্ষিত ক্যাপ্টেন ঠিক করেন। আর সব কিছু ঠিকঠাকমতো সাজাবার পর, তিনি সৈন্যদের সামনে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন, দুই শিবিরের মাঝামাঝি অবস্থানে পৌঁছাবার আগপর্যন্ত তারা ধীর লয়ে পথ চলতে থাকে, সেখানে এসে তারা থামে এবং শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

অন্যদিকে, রাজা বেরকাও তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসেন, আলাউ-এর মতোই এই বাহিনী পঁয়ত্রিশটা স্কোয়াড্রনে বিভক্ত এবং তিনিও তার লোকেদের সামানে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন, এভাবে দুই বাহিনী একে অপরের আধ মাইলের মধ্যে এসে থামে। এই অবস্থায় তারা ক্ষণিকের জন্য থামে, এরপর আবারও তারা আরো সামনে এগোতে শুরু করে এবং এগিয়ে এসে উভয় পক্ষ দুটা আর্বালেস্ট ছুড়বার মতো দূরত্বে এসে থামে।

দুই বাহিনী এভাবে একে অপরের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার পর, ন্যাকড়া বেজে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা একে অপরের দিকে এমনভাবে ঝরনাধারার মতো তীর ছুড়তে শুরু করে যে তাতে আকাশ একেবারেই ঢেকে যায়, এতে প্রচুর ঘোড়া আর সৈন্য মারা পড়ে।

সন্ধ্যা নাগাদ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, তখন বেরকা পিছু হটে পালাতে শুরু করে এবং আলাউ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততার সঙ্গে তাদের পিছু নিয়ে, নির্মমভাবে একের পর এক হত্যা করতে থাকে। এভাবে কিছু দূর পর্যন্ত তাদের তাড়া করবার পর, আলাউ তার সৈন্যদের ডাকে এবং তাঁবুতে ফিরে গিয়ে অস্ত্র রেখে ক্ষত সারাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে আলাউ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মৃতদেহ কবর দেবার নির্দেশ দেন। এই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই ভীষণ ক্ষতি হয়, যার বর্ণনা দেয়া প্রায়

অসম্ভব। এরপর যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া লোকেদের নিয়ে আলাউ তার দেশে ফিরে যান।

২৯
টোটামাঙ্গু যেভাবে পশ্চিমের তাতার রাজ হন

এ কথা আপনাদের নিশ্চয় জানা যে পশ্চিমে মোনগ্লিতেমুর নামে তাতারদের একজন রাজা আছেন এবং তিনি রাজা টলোবুগার কাছ থেকে এই সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, এই রাজা ছিলেন একজন অবিবাহিত যুবক। প্রচণ্ড ক্ষমতাধর টোটামাঙ্গু নামের এক লোক নোগাই নামের আরেক তাতার রাজার সহায়তায় তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। এভাবে ক্ষমতা দখলের বেশ কিছু দিন পর তিনি মারা যান এবং এরপর টোকটাই নামের একজন শক্তিশালী ও প্রচণ্ড বুদ্ধিমান লোককে রাজা হিসেবে বাছাই করা হয়।

এ সময় টলোবুগার দুই ছেলেও বড় হয়ে অস্ত্র চালনা শিখে এবং বিচার-বুদ্ধিতেও তারা অনেক বেশি পারঙ্গম হয়ে ওঠে। এই দুই ভাই বিশ্বস্ত কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে টোকটাই-এর দরবারে রওনা হন এবং সেখানে গিয়ে অত্যন্ত ভদ্র আর মার্জিতভাবে নিজেদের রাজার সামনে উপস্থাপন করে এবং বিনম্রভাবে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে। টোকটাই তাদের অভিবাদন জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলেন।

এরপর বড় জন রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করেন, "সুপ্রিয় জনাব টোকটাই, আমি আপনাকে আমার সর্বোত্তম উপায়ে জানাতে চাই ঠিক কেন আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। আপনি জানেন যে আমরা টলোবুগার সন্তান, যিনি টোটামাঙ্গু এবং নোগাই কর্তৃক নিহত হয়েছেন। তবে টোটামাঙ্গুর ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলার নেই, কেননা ইতোমধ্যে তিনি নিহত হয়েছেন; কিন্তু পিতার হত্যাকারী হিসেবে আমরা আপনার কাছে নোগাই-এর বিচার চাই এবং ন্যায়সঙ্গত একজন রাজা হিসেবে আমরা আপনার কাছে এই আবেদন পেশ করছি। এটাই আমাদের আপনার দরবারে আগমনের প্রকৃত কারণ।"

৩০
টোকটাই যেভাবে নোগাইকে তার দরবারে হাজির করেন

এই দুই যুবকের কথা শোনার সময় তিনি জানতেন তারা যা বলছে তার সবই সত্য এবং জবাবে তিনি বলেন, "সুপ্রিয় বন্ধুগণ, আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের আবেদন অনুসারে নোগাই-এর বিচার নিশ্চিত করব, আর এই উদ্দেশ্যে অতি শীঘ্র তার কাছে আদালতের পরোয়ানা প্রেরণ করা হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে

আর যা যা করা প্রয়োজন তার সবই করা হবে।" এরপর টোকটাই নোগাই-এর কাছে দুজন দূত পাঠান এবং অনতিবিলম্বে টলোবুগার দুই ছেলের পিতৃহত্যার নালিশের জবাবসহকারে হাজির হবার আদেশ দেন; কিন্তু এই বার্তা শুনে নোগাই হেসে ওঠেন এবং দূতেদের জানিয়ে দেন যে তিনি কোনোভাবেই সেখানে উপস্থিত হবেন না।

টোকটাই রাজা নোগাই-এর কাছ থেকে এ ধরনের জবাব পাবার পর, প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন এবং উপস্থিত সবাইকে শুনিয়ে বলেন, "ঈশ্বর সহায়, হয় নোগাই আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে টলোবুগার ছেলেদের নালিশের জবাব দিয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন, নতুবা আমি আমার সমস্ত লোকবল নিয়ে তাকে ধ্বংস করতে ছুটে যাব।"

টোকটাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মিত্রদের নিয়ে বিশাল এক বাহিনীসহকারে প্রস্তুত হচ্ছেন এটা নিশ্চিত হবার পর নোগাইও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তবে তার এই প্রস্তুতি টোকটাই এই মতো বিশাল ছিল না, কেননা তিনি ক্ষমতাধর হলেও আশপাশের অন্যান্য রাজাদের মতো ক্ষমতাধর বা শক্তিশালী ছিলেন না।

৩১
টোকটাই যেভাবে নোগাই এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন

টোকটাই-এর বাহিনী তৈরি হবার পর, তিনি তার দু'লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের প্রধানকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেন এবং কাঙ্ক্ষিত সময়ে তারা নেরঘির সুদৃশ্য বিস্তৃত প্রান্তরে এসে পৌঁছান, সেখানে ছাউনি প্রস্তুত করে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তার সঙ্গে টলোবুগার দুই ছেলেও আসে। তারা অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্যসমেত পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের অপেক্ষায় থাকে।

৩২
নিজ নিজ বাহিনীর প্রতি টোকটাই এবং নোগাই-এর দেয়া ভাষণ

নোগাইও দেড় লাখ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেদিকেই অগ্রসর হতে থাকে, এদের সবাই অসীম সাহসী যুবক এবং টোকটাই-এর সৈনিকদের চাইতে এরা অনেক বেশি প্রশিক্ষিত এবং সুদক্ষ। টোকটাই যেখানে তাঁবু ফেলেছেন তার দু'দিনের পথের দূরত্বে এসে তাদের দশ মাইলের মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলেন।

এরপর টোকটাই তার বাহিনীর প্রধানদের সমবেত করান এবং তাদের বলেন: "জনাব, আমরা নোগাই এবং তার লোকেদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি এবং আমাদের এই কাজ করার পেছনে বড় ধরনের

উপযুক্ত কারণ রয়েছে, কেননা আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা রয়েছে যে নোগাই টলোবুগার ছেলেদের অভিযোগের সুবিচার নিশ্চিত করবার অভিপ্রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর থেকেই এই ঘৃণা এবং দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততার সূত্রপাত; এবং যেহেতু আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি, তাই সর্বতোভাবেই আমরা বিজয়ের প্রত্যাশা করতে পারি। তাই অবশ্যই বিজয়েরই প্রত্যাশা করবেন; তবে সব সময়ই আমি জেনে এসেছি যে আপনাদের সবাই বীর যোদ্ধা এবং আমাদের শত্রুদের ধ্বংস করতে আপনারা সবাই সাধ্যমতো চেষ্টা চালাবেন।"

নোগাইও এভাবে তার লোকেদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন : "প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ", তিনি বলেন, "আপনারা জানেন ইতোমধ্যে আমরা অসংখ্য বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লড়েছি এবং সেইসব যুদ্ধে আমরা এর থেকেও অনেক ভালোভাবে বিজয়ী হয়েছি। তাই অবশ্যই উদ্দামের সঙ্গে লড়বেন। আমাদের দিক থেকে আমরা ন্যায়ের পক্ষে আছি; কেননা আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে অন্যের ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য টোকটাই আমাকে পরোয়ানা পাঠাবার মতো উর্ধ্বতন কেউ নন। আমি কেবল আপনাদের কাছে আবারও এই আবেদন রাখছি, যেভাবে আমরা আর সব যুদ্ধে লড়েছি এখানেও সেভাবেই যুদ্ধ করবেন এবং এভাবেই আমরা নিজেদের এবং আমাদের বংশধরদের অনেক বেশি সম্মানিত করতে পারব।"

৩৩
নোগাই রাজার বিজয়

পরদিন তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। টোকটাই বিশ স্কোয়াড্রন সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে আসে, যার প্রতিটির রয়েছে বিজ্ঞ নেতা এবং সুদক্ষ ক্যাপ্টেন আর অন্যদিকে পনের স্কোয়াড্রন সৈনিক নিয়ে নোগাই-এর বাহিনী গঠিত হয়।

তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ এক লড়াই চলতে থাকে, টলোবুগার দুই ছেলেও অপরিণামদর্শী পরাক্রমে লড়াই করতে থাকে, একপর্যায়ে টোকটাই সমূলে পরাস্ত হন এবং পালাবার সময় নোগাই-এর লোকেদের তরবারির আঘাতে তার অসংখ্য লোক কাটা পড়ে, সংখ্যায় কম হলেও বিরোধী পক্ষের থেকে তারা ছিলেন অনেক বেশি দক্ষ। এই যুদ্ধে মোট ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়, তবে টোকটাই রাজ আর টলোবুগার দুই ছেলে পালিয়ে বাঁচে।

৩৪
উপসংহার

এবং এখন তাতার আর সারাসিন আর তাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে আমার যা বলার ছিল একে একে তার সবই শুনলেন এবং সেই সঙ্গে আমার ভ্রমণ আর জ্ঞান

বৃদ্ধিতে কাজে এসেছে বিশ্বের এমন অন্যান্য আরো অনেক দেশের কথাও জানলেন। আমরা কেবল মহাসাগর আর একে ঘিরে থাকা প্রদেশগুলো নিয়ে কিছুই বলিনি, যদিও আমরা তাদের সম্পর্কে খুব বিস্তারিতভাবেই জানি। তবে প্রতিদিন যেসব জায়গাতে লোকের যাতায়াত সেসব নিয়ে নতুন করে কথা বলা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। কারণ অসংখ্য লোক অনবরত সাগরের সেই পথে পাল তুলে যাতায়াত করছেন।

এই বইয়ে প্রথমেই আপনারা শুনেছেন কীভাবে আমরা গ্রেট কুবলাই খানের দরবার থেকে ফিরে আসি, সেই অনুচ্ছেদে আমরা মেসার মাফিও, মেসার নিকোলো এবং মেসার মার্কোর গ্রেট খানের কাছ থেকে বিদায় নেবার দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছি; এবং সেই একই অনুচ্ছেদে আমাদের প্রস্থানের অভাবনীয় সুযোগের কথা বলেছি। এবং আপনারাও নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে সেই সুযোগের পরও, আমরা সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি এবং পুনরায় আমরা আমাদের দেশেও ফিরে আসতে পারিনি।

আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই এমনটা ঘটেছে, আমাদের আবারও সেখানেই ফিরে যেতে হয়েছে, যাতে পৃথিবীতে বিরাজ করছে এমন অনেক জিনিস সম্পর্কে লোকেরা জানতে পারেন।

সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ! আমেন! আমেন!